সাহিত্য-সংগমে

শ্রীবিনায়ক সান্যাল, এম. এ.
সেণ্ট্রাল্ ক্যাল্‌কাটা কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক

শৈলশ্রী
১-১-১এ, বংকিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট্
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৫৮
প্রকাশক—প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়
১-১-১এ, বংকিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১২
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা—শ্রীজয়দেব রায়
মুদ্রাকর—শ্রীসন্তোষকুমার নাথ, বি. কম্
৬৭, হিদারাম ব্যানার্জি লেন,
সাধনা প্রেস
কলিকাতা—১২

পাঁচ টাকা

উৎসর্গ

যাঁহার জীবনে
প্রজ্ঞা ও প্রেমের, ত্যাগ ও তিতিক্ষার, মনীষা ও মনুষ্যত্বের
অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছিল,—
সেই আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব
৺নলিনীমোহন সান্যাল, এম্‌-এ., পি-এইচ. ডি.
মহাশয়ের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে
এই অনর্ঘ অর্ঘ
গভীর ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ নিবেদিত হইল।

প্রকাশকের নিবেদন

রুচিমান্ মানুষ যেদিন আপনার অন্তঃপ্রেরণার তাগিদে সাহিত্যের সৃষ্টি ক'রেছে, প্রায় সেদিন থেকেই সেই সাহিত্যকে বোঝাবার জন্য সমালোচনা-সাহিত্য জন্ম গ্রহণ ক'রেছে। কাব্যের নিগূঢ়তম সত্য—সূক্ষ্মতম ইংগিত কেবল-মাত্র মনস্বী সমালোচকই উপলব্ধি ক'রে পাঁচজনকে তার অংশপ্রদান ক'রতে পারেন। এই সমালোচনা একটা স্বতন্ত্র শিল্প—উচ্চস্তরের প্রতিভা না থাকলে শ্রেষ্ঠ সমালোচক হওয়া যায় না। জগতে অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় সার্থক সমালোচনা নিতান্তই অল্প।

পশ্চিমে সাহিত্যের এই শাখাটি আজ চরমোৎকর্ষ লাভ ক'রেছে। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও সমালোচনা গৌরবের সমুচ্চ শিখরে আরোহণ ক'রেছিল। কিন্তু যোগ্য লেখকের অভাবেই হোক্ বা প্রকাশকদের সরস্বতীকে প্রসন্ন ক'রতে গিয়ে লক্ষ্মীর বিরাগভাজন হবার অনিচ্ছার দরুণই হোক্, আমাদের দেশে এ বিষয়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ খুব কমই প্রকাশিত হ'য়েছে। ব্যবসায়ীর দৃষ্টি-কোণ থেকে তাই আমাদের বর্তমান গ্রন্থ-প্রকাশ এক দুর্গম পথে দুঃসাহসিক পদক্ষেপ ব'লেই গণ্য হবে।

এই গ্রন্থের প্রবীণ লেখক যে শুধু সুদীর্ঘকাল সাহিত্যের অধ্যাপনার দ্বারা বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছেন তাই নয়, শ্রেষ্ঠ সমালোচকের যা প্রধান গুণ—মননশীলতা, সূক্ষ্ম রসবোধ ও সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগী—তা তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণী শক্তির সংগে ভাষার লাবণ্য যুক্ত হ'য়ে তাঁর প্রবন্ধগুলিকে ক'রেছে যথার্থই সাহিত্যপদবাচ্য।

আলোচ্য গ্রন্থের আর একটি প্রধান আকর্ষণ এর বিষয়-বৈচিত্র্য: এর প্রথম দিকে নন্দনতত্ত্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সূক্ষ্ম আলোচনা করা

হ'য়েছে। তারপর রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান প্রধান কয়েকটি দিকের উপর আলোক সম্পাত ক'রে জিজ্ঞাসুকে লেখক দিয়েছেন নতুন পথের সন্ধান। শেষের দিকে বাঙ্‌লা সাহিত্যের কয়েকজন বিশিষ্ট কবির কীর্তি এবং পুরাণ-প্রসংগ আলোচিত হ'য়েছে। আশাকরি আমাদের এই অর্ঘ্য বাণীমন্দিরের সকল শ্রেণীর পূজারীর মনকে সমভাবে পরিতৃপ্ত ক'রবে।

দু'টি কথা

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে এই সংকলন-গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম। বিচিত্রা, প্রবাসী, বংগশ্রী প্রভৃতি মাসিকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত আমার সাহিত্য-ও-শিল্প-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর সমষ্টি এই গ্রন্থ। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই বহু বৎসর পূর্বের রচনা; কাজেই ইহাদের মধ্যে যে সব মতামত স্থান পাইয়াছে সেগুলি সকল ক্ষেত্রে বর্তমানে আমার অনুমোদিত নহে এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর অসংগতিও লক্ষিত হইতে পারে। তবুও প্রবন্ধগুলি অপরিবর্তিত আকারেই প্রকাশিত হইল। রচনাগুলি মাসিক-পত্রের অংক হইতে ক্রমশ বিলুপ্তির পংকে ডুব দিতেছিল, তাই তাহাদের উদ্ধারের এই বিলম্বিত প্রয়াস। লেখাগুলি লোপ পাইলে জগতের বিরাট্ কোন ক্ষতি হইত এরূপ বিশ্বাস করিবার মত দুর্বুদ্ধি আমার নাই। নিজের রচনা সম্বন্ধে প্রত্যেক লেখকেরই যে একটি স্বাভাবিক মমতা ও দুর্বলতা আছে, বলা বাহুল্য আমিও তাহা হইতে মুক্ত নহি। লেখকের বর্তমান রুচি ও বিচারের মান দিয়া মাপিয়া পরিবর্তিত আকারে বাহির করিতে গেলে কোন দিনই ইহাদের প্রকাশ ঘটিয়া উঠিত না, কারণ তাহা হইলে প্রত্যেকটি প্রবন্ধ আবার সম্পূর্ণ নূতন করিয়া লিখিতে হইত। আমার কয়েকজন ছাত্র পুরাতন প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া একটি সংকলন-প্রকাশে নিরতিশয় নির্বন্ধ প্রকাশ করাতেই শেষ পর্যন্ত প্রবন্ধগুলি 'দিনের আলোক দেখিল'।

কয়েকটি নূতন প্রবন্ধও ইহাতে আছে; যেমন 'রহস্য-বাদ ও রবীন্দ্রনাথ,' 'রবীন্দ্র-কাব্যচ্ছন্দের ভূমিকা,' 'রবীন্দ্র-কাব্যে রূপক', 'রবীন্দ্র-কাব্যে প্রকৃতি,' 'কবি মোহিতলাল'।

এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'রবীন্দ্র-কাব্যে প্রতীচ্য প্রভাব' শীর্ষক প্রবন্ধটি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছে। প্রথম কথা, প্রভাবের অর্থ এখানে

স্বীকরণ, অনুকরণ নহে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—'অনুকরণই চুরি, স্বীকরণ চুরি নয়। মানুষের সমস্ত বড় বড় সভ্যতা এই স্বীকরণ-শক্তির প্রভাবেই পূর্ণ মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে।' দ্বিতীয় কথা, ইহা মৌলিক রচনা নহে। Calcutta Review-এ (সেপ্টেম্বর, ১৯৩২) প্রকাশিত আমার 'Foreign Influence on Radindranath' নিবন্ধটির ভাবানুবাদ। আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র, শ্রীমান্ সুখময় মুখোপাধ্যায়, এই অনুবাদটি করিয়া দিয়া আমার শ্রম লাঘব করিয়াছেন। কিন্তু অনুবাদটিকে ঠিক সেই আকারেই রাখা সম্ভব হয় নাই। ইহার কতক অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে, কোন কোন অংশ পুনর্লিখিত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন সমগ্র রচনাটিকে ঘটনা-সংগতির দিক দিয়া নূতন করিয়া সাজাইতে হইয়াছে। ফলে ইহা একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সজ্জীকরণের কাজেও শ্রীমান্ সুখময় আমাকে প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন; তাঁহাকে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানাইতেছি। সহৃদয় সুহৃৎ সংগীতাচার্য ডাঃ শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল সংগীতের ছন্দ সম্বন্ধে আমাকে বহু মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন; তাঁহাকে আমার অন্তরের ঐকান্তিক প্রীতি জানাইতেছি। আর আমার গুরুকল্প, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কেও এই উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি।

এই পুস্তকের বানান সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। কিছুদিন যাবৎ আমি বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত নূতন বানান-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। আমার পূর্বেকার লেখাগুলিতে কিন্তু প্রাচীন বানান-পদ্ধতিই অনুসৃত হইয়াছে। উপযুক্ত সতর্কতার অভাবে কোন কোন লেখায় আবার উভয় পদ্ধতির মিশ্রণও ঘটিয়া গিয়াছে। এই অসংগতির জন্য আমি সহৃদয় সুধীসমাজের প্রশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

বিশেষ চেষ্টাসত্ত্বেও গ্রন্থমধ্যে কয়েকটি মারাত্মক মুদ্রাকর-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে; যেমন ২০৯ পৃষ্ঠার ৯ পংক্তিতে 'gestalt' স্থলে 'getsalt' এবং ২১২ পৃষ্ঠার ৯ পংক্তিতে 'তান-প্রধান' স্থলে 'তাল-প্রধান ছাপা হইয়াছে।

যাহা হউক, গ্রন্থশেষে একটি শুদ্ধি-পত্র সংযোজিত করিয়া এই ত্রুটি-সংশোধনের চেষ্টা করা গেল।

আমি স্বভাবতই প্রকাশ-কুণ্ঠ; ছাত্র ও বন্ধুগণের স্বতঃপ্রণোদিত উৎসাহ না পাইলে এই উদ্যমে হস্তক্ষেপ করা কোনদিনই আমার পক্ষে সম্ভব হইত না। ভালো হউক মন্দ হউক, পুস্তক তো প্রকাশিত হইল—এখন পুরস্কার অথবা তিরস্কার ভাগ্যে কি জুটিবে কেবল ভাগ্য-দেবতাই তাহা বলিতে পারেন। 'স্বান্তঃসুখের' স্পৃহা কিছুটা থাকিলেও যশোলিপ্সা যে ইহার মূলে নাই সে কথা অকপটে বলিতে পারি। যদি ভাষা ও ভাবের দিক দিয়া গ্রন্থ-খানি সুধীসমাজের বিন্দুমাত্রও প্রীতির কারণ হয় তাহা হইলে সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীবিনায়ক সান্যাল

সূচী-পত্র

শিল্পের স্বরূপ

একথা স্বতঃই মনে হতে পারে যে যে-বিষয় নিয়ে বড় বড় পণ্ডিত এবং মনীষী ইতিপূর্ব্বে বহু আলোচনা করেছেন, সেই বিষয় নিয়ে নূতন কিছু বল্‌বার মত আমার কি থাক্‌তে পারে। সত্য কথা বল্‌তে কি, এটা এমন একটা বিষয় যা বাস্তবিকই কঠিন এবং যার সম্বন্ধে বাদানুবাদের অন্ত নেই, অথচ আমার মত অল্পবিদ্য লোকও এ বিষয় নিয়ে দু'কথা বল্‌তে পিছ্‌পা নয়। 'আর্ট্‌ হিসাবে ছবিখানা ভাল হয়নি', কিংবা 'অমুক লোকের কলাজ্ঞান বলে কোন জিনিসই নেই' এই ধরণের উক্তি যার তার মুখে যখন তখনই শোনা যায়। কিন্তু বিষয়টা তলিয়ে খুব বেশী লোক বোঝেন কি না সে-বিষয়ে আমার সংশয় আছে। আমার এই লেখার মধ্যে আমি যে খুব নূতন নূতন কথা শোনাতে পারব, অথবা আমার ব্যাখ্যার আলোকপাতে আর্টের অন্ধকার কক্ষ যে সহসা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌বে, এমন ভরসা আমার নেই; যদি আমার কোন কথা, কোন ইঙ্গিত জিজ্ঞাসু মনে চিন্তার রসদ কিছু জোগাতে পারে, তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

আর্ট্‌ বা ললিতকলা-সমূহকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়:—

(১) স্থিতিশীল (static),—যেমন চিত্রকলা, স্থাপত্য এবং ভাস্করশিল্প;

(২) গতিশীল (dynamic),—যেমন কাব্য, সঙ্গীত ও তাদের শাখা —নাট্য ও নৃত্যকলা।

মানুষের জীবন অনন্ত-গতিশীল, তার প্রবাহের বিরাম নেই, 'তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে, নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে'। কত জন্মমৃত্যুপরম্পরার মধ্য দিয়ে জীবজীবন ভূমার পানে ছুটে চ'লেছে কে তার সংখ্যা করে? এই সুখদুঃখসমাকুল, চিরচঞ্চল জীবনের দুরূহ জয়চেষ্টায়, বন্ধুর দুর্গম পথে আত্মার অশান্ত অভিযানের চলচ্চিত্র যে-শিল্পের মধ্যে

প্রদর্শিত হয়, তারই আখ্যা দেওয়া হয় গতিশীল। স্থিতিশীল শিল্প একই স্থানে স্থির হয়ে থাকে ;

"সমাধিমন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির ;
ধরার ধূলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি !"

কীট্‌স্‌ বলেছেন—

"Bold lover, never, never canst thou kiss,
Though winning near the goal—yet, do not grieve ;
She cannot fade, though thou hast not thy bliss,
For ever wilt thou love, and she be fair !"

অর্থাৎ চিত্রলিপিতে যেখানে যেটিকে যেমন অবস্থায় দেখান হ'য়েছে তার বেশি তার একপাও অগ্রসর হবার উপায় নেই—তাই ঐ যে সুন্দরী মিলনাকাঙ্ক্ষায় আকুল আগ্রহভরে প্রেমাস্পদের পানে চেয়ে র'য়েছে, বল্লভের প্রেমচুম্বন ওর পক্ষে দুর্লভ, কিন্তু জীবন্ত মানুষের উপর এক হিসাবে ওরা জিতে আছে। জীবনে প্রেমের পরিপূরণ তেমন দুর্লভ নয় বটে কিন্তু তার স্থায়িত্ব বড় অল্প, কারণ জীবদেহ জরামরণের অধীন। ঐ যে শিল্পমূর্ত্তি, ওদের তো ক্ষয় নেই, ওদের লাবণ্যের হ্রাসবৃদ্ধি নেই—তাই ওদের প্রেম শাশ্বত ও চিরসুন্দর। স্থিতিশীল শিল্প গতির সৌন্দর্য্য-প্রদর্শনে অক্ষম। এইখানে কাব্য-সঙ্গীত-নাটক এদের চেয়ে মহত্তর।

মামুলী শ্রেণীবিভাগ ছেড়ে দিয়ে এখন আমরা বুঝ্‌তে চেষ্টা করি শিল্প বল্‌তে বাস্তবিক কি বোঝায়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তিনটি মানুষ বাস করে। একজন দৈহিক ক্ষুধার তাড়নায় খাদ্য-সংগ্রহে সতত ব্যস্ত। জগতে কেবলমাত্র টিকে থাক্‌বার জন্য তার কি প্রাণপণ প্রয়াস! প্রকৃতির বিচিত্র ভাণ্ডার থেকে ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, পরিধেয় বসন আহরণ করাই তার কাজ। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ একান্তই প্রয়োজনের।

আমাদের ভিতরকার দ্বিতীয় মানুষটি দেহের চিন্তায় ততটা বিব্রত নয়। দেহের ক্ষুধা যখন মিটেছে, স্বভাবতঃই মনের খোরাক জোগাবার জন্যে সে হয় চেষ্টিত। জগতের অসংখ্য ঘটনাপুঞ্জ তার মনের সামনে এসে জড় হয়, দৃশ্যমান প্রকৃতি তার বৈচিত্র্যের ডালি নিয়ে তার মনের দুয়ারে এসে আঘাত করে, আর সে মনে মনে তাদের ভিতরকার প্রচ্ছন্ন ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করবার জন্যে তার ধীশক্তিকে যথাসম্ভব কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। মানুষের মনটাই এমনভাবে গঠিত যে কেবল তথ্যের সন্ধান ক'রেই সে ক্ষান্ত হয় না, সেই বস্তুপুঞ্জের মধ্য দিয়ে যে-সর্ব্বজনীন নিয়মগুলি কাজ ক'রে চ'লেছে তাদেরও সে খুঁজে পেতে চায়। এখানেও বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কতকটা প্রয়োজনের দ্বারাই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু মানবমনের তৃতীয় মানুষটি একটু অন্যধরণের ; সে না চায় ক্ষুধার খাদ্য, তৃষ্ণার জল ; না চায় আবিষ্কার করতে প্রাকৃতিক নিয়ম। তার উদ্দেশ্য, প্রকৃতির নিগূঢ় অন্তরে যে অনন্ত সৌন্দর্য্য তরঙ্গিত র'য়েছে তার মধ্যে অবগাহন করে আনন্দের মাণিক্য সংগ্রহ করা। নিখিল বিশ্বকে এই যে হৃদয় দিয়ে দেখা, এই সত্যকার দেখা। মানুষ হৃদয়ের আনন্দরসে অনুষিক্ত ক'রে বিশ্বের সঙ্গে প্রেমের যে নিগূঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, দেহের ও মনের প্রয়োজনের বাহিরে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে আত্মীয়তার নিবিড় নীড় নির্ম্মিত হয়, তাইতো তাদের সত্যকার সম্বন্ধ !

মানুষের দেহের জগৎ—যেখানে চাষা চাষ করছে, তাঁতী তাঁত বুনছে মানুষের খাদ্য এবং পরিধেয় জোগাবার জন্যে, কিংবা তার মনের জগৎ—যেখানে বিজ্ঞান তার নিত্য নূতন আবিষ্কারের দ্বারা বিশ্বরহস্যের মূলে পৌঁছবার জন্যে চেষ্টিত, এরা সত্যজগৎ নয় ; কারণ বস্তুপুঞ্জের মধ্যে তো সত্য নেই ! তথ্য ও সত্য এক জিনিস নয়। আজ যে-বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হ'য়ে চূড়ান্ত ব'লে প্রতিপন্ন হ'চ্ছে, দশ বৎসর পরে যে সেই তথ্য মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে না তা কে ব'লতে পারে ? আগে মানুষ বিশ্বাস করত সূর্য্যই পৃথিবীর চারিদিকে

ঘোরে, কিন্তু গ্যালিলিও মানুষের সে-বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছেন। অতএব সত্য তাই যা কেবল এককালে এবং এক দেশেই সত্য নয়—যা দেশকালপাত্র-নির্বিশেষে সত্য। বাস্তবিক "যা সত্য তার জিয়োগ্রাফী নেই।"

এই সত্যজগতের পথ দেখিয়ে দিতে পারে শুধু মানুষের হৃদয়। মানুষের দেহ এখানে অক্ষম, চিত্ত এখানে পঙ্গু। বুদ্ধি দিয়ে, বিচার দিয়ে একে পাওয়া যায় না—একে পেতে হয় অনুভূতি দিয়ে। অর্থাৎ যা দেখ্‌ছি, যা শুনছি, এক কথায় ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু গ্রহণ করছি তাকেই হৃদয়ের সঙ্গে একান্ত ক'রে যে-নেওয়া তাই হয় সত্য, তাই হয় সার্থক। মানুষের বুদ্ধির রাজ্যে বাস করে বিজ্ঞান, হৃদয়ের শাশ্বত স্বর্গেই শিল্পের সিংহাসন!

দৈনন্দিন অভাবের দৈন্যের দ্বারা যেখানে আমাদের আত্মা সঙ্কুচিত, প্রকৃতিকে নিজের কাজে লাগাবার জন্যে যেখানে মানুষের চিত্ত নিয়ত নিয়োজিত, সেখানে মানুষের হৃদয়ও শৃঙ্খলিত। প্রকৃতির সঙ্গে যেখানে আমাদের হৃদয়ের যোগ অবাধ ও প্রচুর, সেইখানেই শিল্প বিনা-প্রয়োজনে এসে হৃদয়ের কোমল তারে একটি অপরূপ ঝঙ্কার তোলে। যেখানে আমাদের অন্তরের মানুষটি ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে পূর্ণ, শিল্পের প্রকাশ সেইখানেই। আবশ্যক যা, তা অভাবপূরণেই ব্যয়িত হ'য়ে যায়—অনাবশ্যক অফুরান ব'লেই তা ভাষা খোঁজে।

তা হ'লে পাওয়া গেল, অপ্রয়োজনের মাঝেই আর্টের জন্ম। কিন্তু সে পেতে চায় কি? না, সৌন্দর্য। "সুন্দর কি?"—এই প্রশ্নের উত্তরে মনীষী অস্কার্ ওয়াইল্ড্ ব'লেছেন, "The only beautiful things are the things that do not concern us" অর্থাৎ আমরা এতক্ষণ যা ব'লেছি সেই একই কথা;—যার সঙ্গে আমাদের প্রয়োজনগত কোন যোগ নেই, তাই সুন্দর। তিনি আরও ব'লেছেন, যখনই কোন জিনিস, হয় আমাদের বিশেষ কোন উপকারে আসে, না হয় আমাদের মনের মধ্যে আনন্দ বা বিষাদের ভাব জাগিয়ে দেয়, কিংবা গভীর ভাবে আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক করে, তখনই তা শিল্পসীমার

বহির্ভূত হ'য়ে পড়ে। শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে আমরা বস্তুর অন্বেষণ করি না—অন্বেষণ করি বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য্য, অপরূপতা, কল্পনার বিস্তার। বস্তুসর্ব্বস্ব সাধনা শিল্পের নয়—বিজ্ঞানের। সত্য; কিন্তু তাই ব'লে এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা চ'ল্‌বে না যে সহানুভূতিই শিল্পের প্রাণ। মানবহৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি এই সমবেদনা; এবং আমরা পূর্ব্বেই ব'লেছি যে শিল্প একান্তভাবে হৃদয়েরই জিনিস। কূটবুদ্ধির সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ-পথে একে পাওয়া যায় না, একে পেতে হয় সরল সত্যের ঋজু রাজপথে। জড়বুদ্ধির কাছে শিল্পের পরিকল্পনা সময়ে সময়ে স্ফীত ও অবাস্তব ব'লেই মনে হয়, কিন্তু বুদ্ধির নিকট যা অসত্য, হৃদয়ের দিক দিয়ে তাই পরম সত্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "What is Art" শীর্ষক প্রবন্ধে ব'লেছেন, সাধারণ বুদ্ধির কাছে যা অত্যুক্তি, বুকের মাঝে তাই মূর্ত্ত সত্য। বিদ্যাপতি ব'লেছেন,

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল!"

বস্তুতান্ত্রিক সমালোচক তর্জ্জন ক'রে ব'লে উঠ্‌বেন—এটা একটা কথার ফানুষ, আলেয়ার আলো, অবাস্তব ও অসত্য। লক্ষ লক্ষ যুগ হৃদয়ে ধ'রেও প্রাণের বেদনা গেল না—এ আবার কেমন কথা? রুগ্‌ণহৃদয়ের প্রলাপ একেই বলে! কিন্তু তথ্যের দিক দিয়ে যা মিথ্যা, রসের দিক দিয়ে তাই সত্য—তাই পরমসুন্দর। এইজন্যেই সাহিত্যদর্পণকার কাব্যের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ ক'রতে গিয়ে ব'লেছেন, "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" অর্থাৎ রসই কাব্যের একমাত্র উপজীব্য। যাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, ইচ্ছা হয় যুগে যুগে জীবনে-মরণে তার সঙ্গে প্রেম-ডোরে বাঁধা থাকি। থাকা সম্ভব কিনা সে বিচার কাব্যের নয়—মানব-হৃদয়ের চিরন্তন আবেগের অভিব্যক্তিই কাব্য। শিল্পলিপিতে আমরা পাই বস্তুজগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণার চিত্র—বস্তুজগতের চিত্র নয়। রবীন্দ্রনাথ

তাঁর "ভাষা ও ছন্দ" কবিতাটির শেষ কয়েক চরণে শিল্পের স্বরূপটি বেশ সুন্দর-ভাবে উদ্‌ঘাটিত ক'রে ধ'রেছেন :—

"জানি আমি জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্ত্তিকথা,"
কহিলা বাল্মীকি, "তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তাঁর, ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে ?
পা'ছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।"
নারদ কহিলা হাসি,' "সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

চোখ দিয়ে দেখা যায় মানুষের বাহিরের রূপ, মনের মানুষকে দেখ্‌তে হয় অন্তর দিয়ে। আমাদের বাহিরের প্রকাশ কি সব সময়ে আমাদের অনুভূতির অনুরূপ ? মা সন্তানকে ভৎ‍র্সনা করেন, বিরক্ত হ'য়ে কটূক্তি করেন ; কিন্তু সন্তানের জন্য জননীর হৃদয়-ভাণ্ডে যে অজস্র অমৃত সঞ্চিত আছে, এই ভৎ‍র্সনা ও কটূক্তি কি সেই স্নেহরসেরই উচ্ছ্বাস নয় ? বাহিরের কাঠিন্য দেখে যদি মায়ের অন্তরের স্নেহকোমলতার পরিমাপ করা হয়, তবে মাতৃহৃদয়কে পদে পদে ভুল বোঝাই হবে। তবেই দেখা গেল, যা ঘটে তা সব সময়ে সত্য নয়—চোখে-দেখার মধ্যে ভুল দেখার সম্ভাবনাই ষোল-আনা। "দেবতার গ্রাস" কবিতায় সাগরসঙ্গমে যাত্রার সময়ে মোক্ষদা তাঁর পুত্র রাখালকে তার মাসীর কাছে রেখে যেতে চেয়েছিলেন। ছেলে জোর ক'রে যাওয়ায় তিনি বিরক্ত হ'য়ে বলেছিলেন, "চল্, তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে।" তাই ফির্‌বার পথে যখন হঠাৎ মোহানার মুখে প্রবল ঝড় উঠে তাঁদের তরণীখানিকে গ্রাস কর্‌তে উদ্যত হ'ল তখন দেবতার রোষশান্তির জন্য মাঝির কথামত যাত্রীরা জলের মধ্যে যাব যা ছিল সভয়ে ফেলে দিতে লাগ্‌ল। তবু দেবতার রোষ "শান্তি নাহি মানে" ; তখন যাত্রিদলের নায়ক মৈত্রমহাশয় ব'লে উঠ্‌লেন,

" * * * এই সে রমণী

দেবতারে স'পি দিয়া আপনার ছেলে
চুরি ক'রে নিয়ে যায়।"

এই শুনে "তরাসে নিষ্ঠুর" যাত্রিদল জোর ক'রে মায়ের দুলালকে তাঁর বুক থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌ল—এই নিদারুণ-সঙ্কট-সময়ে মোক্ষদা ভগবান্‌কে ডেকে ব'ল্‌লেন, " * * * অতি মূর্খ নারী আমি

কী ব'লেছি রোষবশে—ওগো অন্তর্য্যামী,
সেই সত্য হ'ল ? সে যে মিথ্যা কতদূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝনি, ঠাকুর ?
শুধু কি মুখের কথা শুনেছ দেবতা ?
শোননি কি জননীর অন্তরের কথা ?"

অতএব দেখা যায় আর্টের অভিব্যক্তির জগৎ বস্তুজগতের সঙ্গে একান্তভাবে মেলে না। আমাদের রসের মানুষটি বস্তুর অন্তস্তলে অনুপ্রবেশ ক'রে তার অনন্ত ও সত্য স্বরূপটিকে উপলব্ধি করে। সে তার সীমাহীনতার আবেগে চঞ্চল এবং সঞ্চয়ের প্রাচুর্য্যে অবিরাম সৃষ্টি ক'রে চলে। সুতরাং শিল্পের বিচার হয় অসীমের মানদণ্ডে ; শিল্পীর চোখে বস্তুপুঞ্জ, ঘটনাপুঞ্জ মায়ামাত্র, সত্য-সুন্দরের প্রকাশরূপেই তার শিল্পমূল্য নিরূপিত হয়। Middleton Murry তাঁর "Studies in Keats" নামক গ্রন্থে ব'লেছেন, "কোন বস্তুকে যখন আমরা ভালবাসি তখনই তা সত্য হ'য়ে দাঁড়ায়। আমাদের আবেগগুলি যখন সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুক্ত হয় এবং তার ফলে আমাদের পক্ষে সমস্ত বস্তুকেই ভালবাসা সম্ভব হয়, তখনই আমরা শান্তির সুধাসদনে গিয়ে পৌছাই।" মোপাস'া তাঁর "Piere et Jean" এর ভূমিকায় ব'লেছেন, "বস্তুকে বাইরের জিনিস ব'লে বিশ্বাস করা নিতান্ত ছেলেমানুষী, কারণ আমরা নিজেদের চিন্তা ও ইন্দ্রিয়ের মাঝেই তাকে নিয়ে ঘুরছি। আমাদের চক্ষু, আমাদের ঘ্রাণশক্তি, আমাদের শুন্‌বার ক্ষমতা, আমাদের আস্বাদ, এ সবের প্রত্যেকটিই প্রত্যেকের পৃথক্—একজনের যে রকম অন্যের তা নয় এবং সেই কারণে পৃথিবীতে যত

লোক আছে তত রকমের সত্যপ্রতীতি জন্মাচ্ছে। আমাদের প্রত্যেকের মন ইন্দ্রিয় হ'তে এসব গ্রহণ ক'রে বিশ্লেষ ও বিচার করে। সেই সত্যপ্রতীতির অভিব্যক্তিই আর্ট।"

প্রকৃতির মধ্যে আর্টের উপাদান আছে সত্য, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা মানুষের অন্তর্লীন পূর্ণতার আদর্শের দ্বারা উদ্ভাসিত না হয় ততক্ষণ তার শিল্প-মূল্য বিশেষ কিছুই নেই। পরিপূর্ণতা বাহিরে নেই, আছে মানুষের অন্তরে। পূর্ণতার অর্থ পূর্ণ সৌন্দর্য্য। প্রকৃতির মধ্যে যে-সৌন্দর্য্য তার অনেকখানিই মনের আরোপিত। ফুল সুন্দর, পর্ব্বত মহান্, নৃত্যপরা কলভাষিণী তটিনী সুন্দরী ; কিন্তু এদের রমণীয়তার অনেকটাই কি কল্পনার রঙেই বিচিত্র নয়? উদ্ভিদ্‌বিদ্ ফুলের যে-রূপটি দেখ্‌তে পান, তার দলগুলি, তার পরাগকেশরাদি বিশ্লেষণ ক'রে, তার জন্ম-পত্রিকা রচনা ক'রে যে আনন্দলাভ করেন—কলাবিদ্ তার সে বাস্তব রূপটির প্রতি মোটেই সচেতন নন, তিনি তাকে দেখেন সুন্দরের দূতরূপে—সে তাঁর অন্তরে ব'য়ে আনে অসীমের রভসস্পর্শ—জীবনের চরিতার্থতা।

সৌন্দর্য্য যদি বস্তুপুঞ্জেই একান্ত নিহিত থাকৃত তবে তার মূর্ত্তিটি সকলের কাছে একই রূপে প্রতিভাত হ'ত। কিন্তু তা তো হয় না। যে-লোকের রূপ দেখে সকলেই প্রশংসায় মুখর, তাকেই দেখে আমার চিত্তে বিরাগ পুঞ্জীভূত হ'য়ে ওঠে কেন? জগতের চোখে যে কুৎসিত সেই আবার আমার হৃদয়বীণার তন্ত্রীতে আনন্দের অনুরণন তোলে কেন? সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বাহ্ণে ঝড়ের যে ভীষণ-মধুরতা তা বারান্দায় আরাম-কেদারায় শুয়ে বেশ উপভোগ করা যায়, কিন্তু যে পথিক ক্লান্ত ও বিক্ষতচরণে পথ বেয়ে চলেছে তার মনে ঐ দৃশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবেরই সৃষ্টি করে। সৌন্দর্য্যবোধ মানুষের আছে ব'লে—পরিপূর্ণতার একটি আদর্শ আমাদের অন্তরে বিরাজ ক'রছে ব'লেই আমরা প্রকৃতিকে সুন্দর বা অসুন্দর ক'রে দেখি। অনেক সময়ে তুলনায় বলি, একটি অপরটির চেয়ে বেশি সুন্দর। আদর্শ একটি না থাকলে এরূপ বিচার সম্ভব হ'ত্ না।

গ্রীক্ ঋষি প্লাতো ব'লেছেন, প্রাত্যহিক জীবনে বস্তুপুঞ্জের মধ্যে যে সত্যের আভাস আমরা পাই তা' বস্তুদেহের ভিতরে নিহিত নেই—সার সত্যের শুদ্ধ নিকেতন মানুষের অন্তর; বহিঃপ্রকৃতি মানুষের সেই অন্তঃ-প্রকৃতির প্রতিচ্ছবিমাত্র। রস নয় রসাভাস, রূপ নয় রূপাভাস। প্লাতোর দৃষ্টিতে ললিতকলা ছায়ার ছায়া, অসত্য প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণ। ইন্দ্রিয়াতীত সত্য-স্বরূপের প্রকাশ যে শিল্পে যত অল্প, তাঁর মতে সে শিল্প তত নিকৃষ্ট। খুব খাঁটি কথা; তবে বলা বাহুল্য যে উচ্চাঙ্গের শিল্পকলা অনুকরণ ক'রেই ক্ষান্ত হয় না, নব নব সৃজনীশক্তির প্রেরণাই শিল্পের প্রাণ। নিখিল বিশ্বের মধ্যেও এই শক্তিই কাজ ক'রছে—কলাবিদ্‌ও চান নিজের ভাবের আলোকে পুরাতন প্রকৃতিকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তু'লতে; তাই বাহিরের জগতের চেয়ে শিল্পের জগৎ অধিক সত্য। তারপর প্লাতো চেয়েছেন আবশ্যকতার নিকষে শিল্পের মূল্য নিরূপণ ক'রতে। কিন্তু জৈবিক প্রয়োজনীয়তার অনেক উর্দ্ধে শিল্পের কল্পলোক—যেখানে মানুষ খায় না, কেবল গান গায়; প্রয়োজনের তাড়নায় ছুটাছুটি ক'রে বেড়ায় না, বিশ্বতানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে করে অভিরাম ভঙ্গিতে আনন্দনৃত্য। বিখ্যাত জার্ম্মান্ কবি ও দার্শনিক শেলিং বলেন, অজেয় প্রাকৃতিক শক্তির রাজ্য এবং অতীন্দ্রিয় আদর্শের পবিত্রলোকের মধ্যস্থলে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির আবেগ অলক্ষ্যে তৃতীয় একটি লীলা-রাজ্য (gladsome Kingdom of play) সৃজন করে— যেখানে প্রেমের চিরবৃন্দাবন অধিষ্ঠিত এবং যেখানে লীলার আবেগে মানুষের দৈহিক ও নৈতিক সকল বন্ধন নিমেষেই মুক্ত হ'য়ে যায়। সেখানে পাখী গান গায়, ফুল ফুটে ওঠে, জ্যোৎস্নার অভ্রহ্রদে স্নান ক'রে ধরণী শুচি হয়, সন্ধ্যাবেলায় রজনীগন্ধা তার গন্ধের অর্ঘ পাঠিয়ে দেয়, আর তারই সঙ্গে যেন ভেসে আসে "দূরের বঁধুর" উত্তরীয়ের হাওয়ার একটুখানি পরশ! সুন্দরের অঙ্গনে জীবাত্মার লীলাভিসারই তার আনন্দ-রূপকে প্রকাশিত করে। বৈষ্ণবের লীলাবিলাসও এই উক্তিরই সমর্থন করে।

বৈষ্ণবের ধর্ম্ম রসের ধর্ম্ম—নীরস তত্ত্বের ধর্ম্ম নয়, বৈষ্ণব কাব্য-দর্শনে লীলার স্থান তাই এত উচ্চে। ললিতকলাকে প্রয়োজনের গণ্ডীর মধ্যে টেনে এনে বিচার করা সমীচীন মনে হয় না। প্রয়োজনের তাড়নায় জন্মলাভ করে বিজ্ঞান, আনন্দের প্রেরণায় জন্মে শিল্প। বিজ্ঞান চেষ্টা করে বুদ্ধিবলে প্রকৃতিকে একান্তভাবে কাজে লাগাতে, প্রকৃতির পদার্থপয়োধি মন্থন ক'রে উত্থিত হয় বস্তুসমূহের নিয়ামক কতকগুলি সামান্য সূত্র। সকলের কাছেই যা একইরূপে প্রতিভাত হয়—কার্য্যকারণ সম্বন্ধের দ্বারা যা একান্ত বিধৃত এবং মানবের জ্ঞানের বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যা কালে কালে বিবর্ত্তিত—বিজ্ঞানের কারবার তাই নিয়ে। বিজ্ঞান আবিষ্কার করে নিয়ম, শিল্প চায় আনন্দ। তাই শিল্পী যখন বলেন 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে," আনন্দ হ'তেই এই বিশ্ব সমুদ্ভূত, আর কোন প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন, তখন তত্ত্বের দিক দিয়ে দর্শন এবং ব্যাবহারিক দিক থেকে বিজ্ঞান বিজ্ঞতার হাসি হেসে এর অন্তর্নিহিত কার্য্যকারণসূত্রটির আবিষ্কারে উঠে প'ড়ে লেগে যায়। বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকের শুষ্ক জিজ্ঞাসা এবং তত্ত্ব-মীমাংসায় আমাদের অন্তর ভরে না, অথচ আসল বস্তুটি চিরদিনের মত রহস্যের অন্ধকারেই র'য়ে যায়। আজ যা সত্য ব'লে স্বীকৃত হয়, দুদিন বাদেই তা মিথ্যা ব'লে প্রমাণিত হ'য়ে যায়। যখনই কোন প্রাকৃতিক সমস্যার সমাধানে সেই সম্বন্ধে আবিষ্কৃত কোন নিয়ম কার্য্যকরী না হয় তখনই তার মূল সূত্রটির সংশোধন আবশ্যক হয়। পরন্তু শিল্পকথিত সত্য নিত্য ও অবিনাশী

পূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে যে পরিপূর্ণতার চিত্র আছে কেবল মানুষের মনে, সেই হেতু আর্ট্ প্রকৃতির অনুকরণ হ'তে পারে না। নকল ক'রলেই যদি শিল্প-সৃষ্টি হ'ত তাহ'লে "ক্যামেরা" দিয়েই কাজ চ'লে যেত, শিল্পীর প্রয়োজন থাকৃত না। গ্যেটে বলেছেন, "In fact, Art is called Art because it is not Nature" অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতিচ্ছায়া নয় ব'লেই আর্ট্‌কে

আর্ট্ বলা হয়। যে কোন জীবিত মানুষের সঙ্গে আর্টের মানুষের তুলনা ক'রলে দেখা যাবে জীবিত মানুষটি অপেক্ষাকৃত হীনশ্রী, কারণ শিল্প প্রকৃতির চেয়ে পূর্ণতর। প্রকৃতির মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা বা অসামঞ্জস্য আছে শিল্পী তাঁর হৃদয়ের পূর্ণতা দিয়ে তার পূরণ করেন। ভিনস্-দ্য-মিলোকে প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য্যের সুন্দরতম উদাহরণ ব'লে স্বীকার করা হয়। ঐ বিখ্যাত মূর্ত্তিটির সঙ্গে অনেক প্রসিদ্ধ বরাঙ্গনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপের তুলনা করা হয়—মূর্ত্তির সঙ্গে কারও সমুদয় মাপ মেলেনি। নিসর্গ-চিত্র (Landscape-painting) বাস্তব নয় ব'লে অনেকে আপত্তি করেন। কিন্তু এ আপত্তি নিরর্থক। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য বা অপূর্ণতা আছে আর্ট্ কখনই তার প্রশ্রয় দিতে পারে না—প্রাকৃতিক চিত্র সুন্দর ও সার্থক হয় তখনই, যখন কলাবিৎ রূপের তূলিকা দিয়ে রসের মূর্ত্তি অঙ্কিত করেন। অর্থাৎ শিল্পী তাঁর চিত্ররূপায়ণে কেবল যা চোখে দেখেছেন তাই আঁকেন না, সেই দৃশ্য দেখে তাঁর মনে যে অনুভূতির উদয় হ'য়েছে তাকেও রূপ দেবার চেষ্টা করেন। আমরা প্রত্যহ যে ভাষায় কথা বলি তার অর্থ বড়ই স্পষ্ট। যখন বলি ফুলটি লাল, তখন 'লাল' এই শব্দটি দিয়ে বোঝাতে চাই ফুলটি সাদা, কাল, পীত বা অন্য কিছু নয়, সেটি লালই—অর্থাৎ তার সম্বন্ধে আমাদের যে চেতনা বা অনুবোধ (Sensation) আমরা তার নাম দিয়েছি "লাল"। কিন্তু লালফুল দেখে আমাদের মনে যে ভাবাত্মিকা রসানুভূতি জন্মে বর্ণসম্বন্ধে চেতনা তার একটি সামান্য অংশমাত্র; বস্তুবুদ্ধির দ্যোতক—শব্দ, রসানুভূতির ভাষা—শব্দরাশির অশরীরী নৃত্য, রেখা ও রংএর কুহকময় আলিম্পন। ছন্দ ও সুরের অনির্ব্বচনীয় সুষমায় কবি রসলোকের রুদ্ধ দুয়ার অনায়াসেই মুক্ত ক'রে দেন। টার্ণারের সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের ছবিগুলির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে তিনি যা প্রত্যক্ষ ক'রেছিলেন তার চিত্র সেগুলি কিছুতেই নয়। গাছের ছায়া কখনই সূর্য্যের অভিমুখে প'ড়তে পারে না; এ কথা শিল্পী নিজেও জানতেন, তবুও তাই

পাওয়া যায় তাঁর কারুরচনায়, কারণ, আর যাই করুন, প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণ তিনি করেন নি; দৃশ্যমান রূপক প্রতীকের সাহায্যে তিনি প্রকাশ ক'রতে চেয়েছেন সেই সেই বস্তু সম্বন্ধে এক অখণ্ড অনুভূতির চিত্র। আতপচিত্রে মানুষের বহিরঙ্গের প্রকাশ হয় নিখুঁত, কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য, তার প্রতিভা অর্থাৎ এক কথায় আসল মানুষটি ফুটে ওঠে ভাবুক শিল্পীর তুলির টানে। নেপোলিয়ন্ একজন দিগ্‌বিজয়ী বীর ও অলৌকিক প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। আতপচিত্রের কৃপায় আমরা তাঁর অশ্বারূঢ় মূর্ত্তিটি দেখবার সুযোগ অনেকবার পেয়েছি, কিন্তু তাতে আমাদের মন ভরেনি; তার কারণ নেপোলিয়নের রূপসম্বন্ধে আমাদের 'ধারণা' প্রকৃত নেপোলিয়ন থেকে স্বতন্ত্র। মনস্বী কার্লাইল্ যথার্থই ব'লেছেন, "অনেক সময়ে কোন লোকের একখানি প্রতিকৃতি তাঁর সম্বন্ধে লেখা বিস্তৃত ইতিহাসের চেয়েও শিক্ষাপ্রদ; প্রতিকৃতি একটি জলন্ত দীপশিখার মত যার আলোকে মানুষের জীবনেতিহাস অন্ধকারের মধ্যেও পরিষ্কার পড়া যেতে পারে।" মানুষের বহিরঙ্গেরই ছবি আতপচিত্র, তার সত্যস্বরূপটিকে ব্যক্ত ক'রতে পারে কেবলমাত্র শিল্প।

প্রকৃতির বাহিরের রূপটিকে হুবহু ধ'রে দেওয়ার মধ্যে আর্টের বাহাদুরী কিছুই নেই। অন্তরের উপলব্ধ সত্যের আলোকে তার ব্যাখ্যার নামই শিল্প। শিল্পী যেখানে অন্ধ অনুকরণ ছেড়ে বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরে কল্পসৃষ্টির ছন্দঃসুষমা সঞ্চার করেন সেখানেই হয় আর্টের জন্ম। প্রকৃতি কবির অন্তরে প্রেরণার অগ্নি উদ্দীপিত করে, কবি প্রকৃতির নশ্বরপ্রতিমায় অবিনাশী প্রাণ-শক্তির স্পন্দন এনে দেন। "Storm at sea" যদি ঝটিকাক্ষুব্ধ সাগরলহরীর ভয়াবহ গর্জ্জনের অনুকৃতিমাত্র হ'ত, তবে তাকে আর্টের কোঠায় ফেলা কিছুতেই চ'লত না। অনৈসর্গিক নিসর্গশোভার রুদ্রভাবটি ফোটাতে পারে ব'লেই কলাহিসাবে তার সার্থকতা। রুদ্রের যে তাণ্ডবচ্ছন্দে শিল্পীর হৃদয় আন্দোলিত তারই আভাস আছে বলেই তা আমাদের কাছে সত্য হয়ে ওঠে।

অনেক সময়েই কিন্তু দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে যখনই আমরা কোন

চিত্রের দোষগুণের বিচার কর'তে বসি, আমাদের চোখে-দেখা কোন বাস্তব-দৃশ্যের কষ্টিতেই তার দাম কষা হ'য়ে যায়। অথচ সঙ্গীতের বেলায় আমরা সেরূপ করি না। তার কারণ বোধ হয় এই যে শব্দসম্বন্ধে আমাদের কান যে-পরিমাণে শিক্ষিত, রূপসম্বন্ধে চক্ষু তেমন নয়। আসলে কিন্তু রূপ ও রংএর সাহায্যে চিত্রকর যা গ'ড়তে চান—তান, লয় ও সম দিয়ে সেই সত্য-সুন্দরেরই ইঙ্গিত করেন সঙ্গীতকার। সাদৃশ্যের (verisimilitude) মাপ-কাঠিতে শিল্পের বিচার হয় না। এই কারণেই আতপচিত্র আর্টের অন্তর্ভুক্ত নয়। আতপযন্ত্র যদি একপ্রকারের হয় এবং আলোকরশ্মি ও রাসায়নিক উপাদানের যদি সমতা থাকে তবে দশখানি ছবি ঠিক একই রকমের হবে। কিন্তু দশজন শিল্পীর আঁকা একই লোকের ছবি দশ রকমের না হ'য়েই পারে না। কারণ ফ্রেডরিক্ ওয়াট্সের ভাষায় ব'ল্‌তে গেলে, চিত্রকর ভাবের চিত্র আঁকেন, বস্তুর নয়—"paints ideas, not objects"। একজন ধনী গিদো রেনির অঙ্কিত নারীচিত্রগুলি দেখে জান্‌তে চেয়েছিলেন তাদের আদর্শ কোথায়। গিদো একজন কুৎসিত ব্যক্তিকে তাঁর সম্মুখে রেখে একটি সুন্দর ম্যাগ্‌ডালেন মূর্ত্তি অঙ্কিত করেন। 'মডেল' যাই হ'ক কিছুই আসে যায় না; কারণ ভাব শিল্পীর হৃদয়ে। অবনীন্দ্রনাথ ব'লেছেন, "জগতে আমরা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, তাহার কোনটাই হুবহু নকল করা সম্ভব নয়, যদি সম্ভবও হইত তবে সেই অনুকরণকে শিল্পীর নৈপুণ্যের আদর্শ বলা চলিত না। বস্তুর আকার ও বর্ণ অনুকরণ করা কতকটা সহজ, কিন্তু কেবল আকার ও বর্ণের একটা অসম্পূর্ণ প্রতিরূপকে তো শিল্পলিপি বলা চলে না। প্রত্যেক রূপ একটি ভাবের সহিত মিশ্রিত থাকেই। সেই ভাবের আভাস বা প্রত্যক্ষ প্রকাশ শিল্পের প্রধান অঙ্গ। ফুলটি আঁকা তখনই সার্থক, যখন শিল্পী তাঁর চিত্রিত ফুলের মধ্যে স্বাভাবিক ফুলের ভাব-মাধুর্য্যের ইঙ্গিত করিতে পারেন।"

M. Zola প্রমুখ কতকগুলি সাহিত্যশিল্পী আর্টে Realism বা বাস্তবতার পক্ষপাতী। তাঁরা বলেন যেমনটি দেখা যায় তেমনটি আঁকাতেই শিল্পের

সার্থকতা—তাঁদের মতে শিল্প সমাজের দর্পণ। সাহিত্যের মধ্যে সমাজের চিত্রই হুবহু প্রতিফলিত হওয়া চাই। কিন্তু এ মত যে টিক্‌তে পারে না একথা পূর্ব্বেই ব'লেছি। এক সময়ে য়ুরোপে এই বাস্তবতার হাওয়া এমন উতল হ'য়ে উঠেছিল যে সাহিত্যিকমাত্রেই মানুষের নানাবিধ দুর্ব্বলতা ও অসংযমের চিত্রকেই উচ্চ সাহিত্যের অঙ্গ ব'লে মনে ক'রতে সুরু ক'রেছিলেন। এখনও যে সে-হাওয়ার গতি ফিরেছে এমন মনে হয় না। জোলার 'নানা', বাল্‌জাকের "Droll Stories", মোপাসাঁর কতকগুলি ছোট গল্প এবং "বেলামি" প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে বাস্তবতার নামে অনেক উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্রই উঁচুদরের কথা-সাহিত্য ব'লে করতালি পেয়ে ধন্য হ'য়েছে। অস্কার্ ওয়াইল্ডের কথায় ব'লতে গেলে এই সব লেখক 'had mistaken the common livery of the age for the vesture of the Muses" অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে পোষাকটাকেই এঁরা কলা-লক্ষ্মীর স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশের পবিত্র পরিচ্ছদ ব'লে মনে ক'রেছিলেন।

শিল্প ও নীতির সম্বন্ধে বিচার ক'রবার পূর্ব্বে উপরি-উক্ত 'Natural' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি হ'তে পারে তার একটু আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "স্বাভাবিক" অর্থে যদি শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবর্ত্তে প্রকৃতিলব্ধ সংস্কারমাত্র বোঝায় তবে তার দ্বারা অনুপ্রাণিত যে-সৃষ্টি তা কখনই চিরন্তন ও চিরনূতন হ'তে পারে না। যে বই একবার পড়ার পর আর পড়তে ইচ্ছা হয় না, যে গান একবার শুন্‌লে আর শোনা যায় না, তা কখনই উচ্চাঙ্গের শিল্প হতে পারে না। অপরপক্ষে "স্বাভাবিক" ব'লতে যদি মানুষের বাহিরে অবস্থিত বস্তুনিচয়কে বোঝায় তাহ'লে অবশ্যই বলতে হয় যে এই বস্তুসমষ্টির আলেখ্য কখনই শিল্প আখ্যা পেতে পারে না। প্রকৃতির দুয়ারে যে-কল্পনা ও রসের অর্ঘ নিয়ে যাই আমরা, প্রকৃতি তাই আমাদের ফিরিয়ে দেয় মাত্র। সেক্সপীয়র্ যে বনতরুর অন্তরে, প্রবাহময় তটিনীহৃদয়ে, স্থিতিশীল প্রস্তরখণ্ডের অন্তরালে অনন্ত উপদেশের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন সে তাঁর

নিজের গুণে—প্রকৃতি তাঁর কর্ণকুহরে কোন মন্ত্রই গুঞ্জন করে নি; অতএব যাকে স্বাভাবিক বলি তাও ব্যক্তিবিশেষের আবেগ ও কল্পনার রঙে রঞ্জিত।

অনেক সময়ে যা আমাদের বড় কাছাকাছি—যেমন যে-সময়ে আমরা বাস কর্‌ছি সেই সময়কার সমাজ,—তাই নিয়ে সাহিত্য গড়্‌তে গেলে তার ভিতরে কল্পনার লীলাবিস্তারের অবসর তেমন থাকে না। যা সুদূর, তাই মধুর। কাছের কত বড় জিনিসকেও আমরা ছোট ক'রে দেখি, আর অতীতের কত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বস্তুও কল্পনার রথে এসে বৃহদ্‌-রূপে প্রতিভাত হয়। কানে শুন্‌ছি যে বাঁশীর ধ্বনি, তা যত মধুর ও মোহনই হোক্ না,—যমুনাপুলিনে যে বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে রাধিকারমণ গোপিকার মনোহরণ ক'রেছিলেন তার মত সুধাস্রাবী কখনই নয়। এইজন্যই কীট্‌স্ গেয়েছেন, "Heard melodies are sweet but those unheard are sweeter." একেই কোন বিখ্যাত লেখক ব'লেছেন "বর্ত্তমানের ভিতরে অতীতের দ্রাক্ষামদিরা সঞ্চার করা।" "রোমান্স্‌" গ'ড়ে ওঠে কল্পনা ও কাহিনীর সম্মেলনে; আর্টে বাস্তবতা এই 'রোমান্সে'র মৃত্যুদূত। তাই 'Restoration' যুগের কৃত্রিমতার পরে 'Romanticism'এর, ভিক্টোরীয় যুগের পরে "প্রাগ্‌র‍্যাফেল্‌"-আন্দোলনের সৃষ্টি। যা অত্যন্ত অভ্যস্ত, চল্‌তে ফির্‌তে পথের দুধারেই যা দেখ্‌ছি, জীবনের প্রতিকাজেই অহরহ যেসব অভিজ্ঞতা আমরা পাচ্ছি, অতি-পরিচয়ের অভ্যাসের ফলে তা' আমাদের মনকে মাতিয়ে তুলতে পারে না। তাই ঠিক বর্ত্তমানকে নিয়ে প্রায়ই কোন বড় সাহিত্য বা শিল্প গ'ড়ে ওঠে না।

মনস্বী কার্লাইল্ বলেন, "সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুই প্রতীক, যে জিনিসকে আমরা যেখানে দেখ্‌তে পাই সে জিনিস সেখানে নিজের প্রয়োজনে আসে নি। কতকগুলি অতীন্দ্রিয়ভাবের দ্যোতনার জন্যই তারা সেখানে নিরপেক্ষভাবে বর্ত্তমান। প্রত্যেক দৃশ্যই এক একটি বাতায়নের মত, যার মধ্য দিয়ে প্রকৃত চক্ষুষ্মান অন্তরের সন্ধান পান;—আমরা সকলে জ্যোতি-ষ্কণিকার মত, চিন্ময় সত্তার দ্বারা ওতপ্রোত ঈথরপ্রবাহের উপর ভাসমান।"

বেনোডিটো ক্রোচি বলেন, যা দৃশ্যমান তাই অবাস্তব, কারণ কোন জিনিসের সত্তা সে জিনিসের মধ্যে নেই, আছে যে দেখে তার মনে। সত্যই কবির কল্পনা, "gives to airy nothing a local habitation and a name"। "যে-গান কানে যায় না শোনা", যে-ছবি চোখে দেখা যায় না, আছে শুধু রূপদক্ষের নিভৃত চিত্ততলে রূপানুরাগের মধ্যে, তারই অভিব্যক্তি পাই কাব্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে, ললিতকলার নানা বিভাগে। প্রকৃতির বস্তুপুঞ্জ হল তার স্থূল উপাদান, 'পরিকল্পনা' আছে রূপকারের হৃদয়ে। পাথর দিয়ে তাজমহল তৈরী হ'য়েছিল ব'লে পাথরগুলো যদি কোনদিন ভেবে বসে যে তারাই "আর্ট্" তবে আশঙ্কার কারণ যথেষ্ট আছে। বাস্তবিক শুধু ভাব বা কল্পনাও শিল্প নয়, উপাদানও শিল্প নয়—উপাদানের সাহায্যে ভাবাদর্শের অভিব্যক্তিই প্রকৃত শিল্প-নামের যোগ্য। শিল্পকে অ-শিল্প থেকে পৃথক করে এই অভিব্যক্তি বা প্রকাশভঙ্গি, ইংরাজিতে যাকে বলা হয় style। অস্কার্ ওয়াইল্ড্ বলেন, সুষ্ঠু প্রকাশই শিল্পের প্রাণ,—"The very condition of any art is style"। বাস্তবিক, শুধু কল্পনা এবং অনুভূতি, শুধু উপাদান এবং আদর্শের একত্র সন্নিবেশেই শিল্প সৃষ্ট হয় না, আমাদের অন্তঃস্থিত সেই কল্পস্বপ্ন যখন ভাষার মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয় তখনই হয় শিল্পের উদ্ভব। ভাবপ্রকাশের এই অপরূপ ভঙ্গির নামই 'style' অথবা 'technique'—একেই পেটর্ ব'লেছেন—ভাষার সঙ্গে অন্তঃস্থিত ভাবস্বপ্নের হর-গৌরী-মিলন—"The finer accommodation of speech to that vision within."

প্রত্যেক মানসিক অভিজ্ঞতার দুটি দিক আছে, একটি তার বিষয় বা উপাদানের দিক, অর্থাৎ যা-কিছু এই অভিজ্ঞতার প্রণোদক তাই ভাব-সংযোগ (association), আবেগ (emotion), পরাবর্ত্ত (reflexes), বিমর্শ (reflection), কল্পনা (image), অনুচিন্তন (recollection), ব্যতিরেক (contrast), প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের মধ্যে একটি বিশেষ মানস-অবস্থার সৃষ্টি করে। কিন্তু এই বিভিন্ন মনোভাবগুলি যদি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে

তবে সামঞ্জস্য ও সংহতির ব্যাঘাত ঘটে এবং এইরূপ পরিচ্ছিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াকে 'অনুভূতি' (experience) কিছুতেই বলা চলে না। অনুভূতির পূর্ণতার জন্য ঐগুলির সমীকরণ বিশেষ আবশ্যক। Technique ব'লতে আমরা **কোন্ বিষয়টি** শিল্পীর চিত্তকে অভিভূত ও অনুরঞ্জিত ক'রেছে শুধু তাই বুঝি না, প্রতীয়মান অনৈক্যের মধ্যেও **কেমন ক'রে** 'বিবাদী' ভাবগুলি সমীকৃত হ'য়ে একটি অখণ্ড একতা লাভ ক'রেছে তাও আমাদের উপলক্ষিত। আর্টের উদ্দেশ্য হ'ল ভাবের সংক্রমণ; কবির মনের নিগূঢ় ভাবটি কেমন ক'রে অপরের মনে সংক্রমিত করা যায়? শুধু শব্দের সাহায্যে কিছুতেই নয়। শব্দের অর্থ আছে, সে যা বলে তাই বলে, তার বেশি কিছু বলার সাধ্য তার নেই। শব্দাতীত ভাবকে প্রকাশ করে ছন্দ এবং গান। ছন্দের নর্ত্তনে, সঙ্গীতের ইঙ্গিতে আমরা কেবল স্থায়ী ভাবটিকেই হৃদয়ঙ্গম করি না, সেই ভাবটিকে কেন্দ্র ক'রে কবির চিত্তে যে বিভিন্ন ও বিচিত্র রসের সমন্বয় হ'য়েছিল তারও অনেকটা আমরা উপলব্ধি করি। অর্থ ও ধ্বনির এই যে একীকরণ যার সাহায্যে আমরা ভাষা দ্বারা ভাষাতীতের আভাস দিতে সমর্থ, কাব্যজগতে এরই বিশেষ নাম বাক্সরণি (diction)। কল্পনা ও সৌন্দর্য্যবোধ তো অনেকেরই থাকে কিন্তু তাঁদের আমরা কলাবিদ্ বলি না, কেননা তাঁরা তাঁদের উপলব্ধ সত্যের অমৃত নিখিলের মনের দুয়ারে পৌঁছে দিতে পারেন না। অতএব যে-পরিমাণে যে-শিল্পী জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, বস্তুজগৎ সম্বন্ধে তাঁর সংবেদনাকে অপরের মনের সামনে ধ'রে দিতে পারেন সেই পরিমাণে তাঁর শিল্পলিপি সার্থক হ'য়েছে ব'লতে হবে। শিল্পের জগতে অনিয়ম, অসঙ্গতি অথবা বিচ্ছিন্নতার স্থান নেই—সেখানে প্রত্যেকটি ঘটনা একটি অখণ্ড তাৎপর্যের দ্বারা বিধৃত। এই সম্পূর্ণ জগতের অস্তিত্ব আছে কেবল শিল্পের কল্পলোকে এবং মানবমনের নিভৃত কামনায়। সেই জন্যেই শিল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ ক'রতে গিয়ে বেকন্ ব'লেছেন, "Shows of things submitted to the desire of the mind" অর্থাৎ কাব্যে আমরা পাই হৃদয়ের বাসনা দিয়ে

রঞ্জিত এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন-জগৎ। যদি কোন লোককে আমরা চোখের সামনে হৃত হ'তে দেখি তা হ'লে আমাদের অন্তরাত্মা নিশ্চয়ই আতঙ্কে শিউরে ওঠে, তার কারণ হত্যা ব্যাপারটা নিতান্ত খাপছাড়াভাবে আমাদের দৃষ্টিপথে এসে পড়ে।

প্রত্যুত, কলালিপিতে যে-কোন ব্যাপারের পূর্ব্বাপর সম্পূর্ণ ইতিহাসটি আমাদের জানা থাকে ব'লে এবং সেখানে দৈবের প্রভাবে কোন কিছুই ঘটে না ব'লে সেখানকার কঠোরতম দৃশ্যও আমাদের বিচলিত ক'র্‌তে পারে না —সংগতির সুষমায় অংশের নিষ্করুণতা আনন্দেরই নিবন্ধন হ'য়ে দাঁড়ায়; তাই মিলনাত্মক নাটকের চেয়ে বিষাদমূলক নাটক আমাদের কম উপভোগ্য হয় না। সেই জন্য রূপসৃষ্টিকে বাহিরের জিনিসের দর্পণ না ব'লে বলা যেতে পারে তার আচ্ছাদন, কারণ শিল্পের পরিচ্ছদ প'রেই প্রকৃতির নগ্নতা দূর হয়—তার রমণীয়তা এবং মাধুর্য্য বহুগুণে বেড়ে যায়। তাই শিল্পীর উদ্যানে যে-ফুল ফোটে, কবিকুঞ্জে যে-বিহঙ্গ গান গায় তাদের যে পূর্ণতা, যে অনির্ব্বচনীয়তা, তা প্রকৃতির ভাণ্ডারে দুর্লভ।

সাহিত্যের সংজ্ঞানির্দ্দেশ কর্‌তে গিয়ে বিখ্যাত কলাসমালোচক ও কবি ম্যাথ্‌ আর্ণল্ড্‌ ব'লেছেন, "সাহিত্য মানবজীবনের সমালোচনা।" অর্থাৎ জীবনকে বিশ্লেষণ ক'রে তার অসঙ্গতি ও অপূর্ণতাকে পূর্ণ কর্‌বার জন্যে মনের আদর্শটিকে বাস্তবের উপর প্রতিফলিত করাই তার কাজ। এই সংজ্ঞার মধ্যে ত্রুটি আছে,—সাহিত্যকে বিশ্লেষ ক'রলে তার রসরূপের পূর্ণতার ব্যাঘাত ঘটে—সাহিত্য মনস্তত্ত্বের কোঠায় গিয়ে পড়ে, শিল্প বিজ্ঞান হ'য়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞানেও কল্পনা আছে, নাই সেখানে রস। বিজ্ঞান ব্যথিতের আর্ত্তিতে কাতর হয় না, প্রিয়ের বিরহে বিধুর হ'য়ে ওঠে না, অবিচার ও অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েও তার ধমনীতে শোণিতস্রোত দুর্ব্বারবেগে প্রবাহিত হয় না। শিল্পসৃষ্টির মধ্যে কল্পনা ও বিচার থাকাই যথেষ্ট নয় 'দরদ'ই হ'ল সাহিত্যের প্রাণ। সুতরাং সহস্রগুণসত্ত্বেও একমাত্র দরদের অভাবেই অনেক সময়ে শিল্পসৃষ্টি সার্থক হতে পারে না।

মানুষের মনের মধ্যে যে একটি রসের মানুষ আছে অনির্ব্বচনীয়ের সঙ্গে তার নিত্য নব নব লীলার সম্বন্ধ। যিনি আমাদের হৃদয়শায়ী হ'য়েও আমাদের মনের বাহিরে—অসীম হ'য়েও যিনি আমাদের প্রেমের ডোরে চিরদিন বাঁধা, সেই সীমাহীনের মণিনূপুরের ধ্বনিতরঙ্গ যখন আমাদের চিত্তবীণায় লেগে অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে, তখন আমাদের প্রাণে সঙ্গীতের যে পূর্ণতা, আনন্দের যে অসীমতা, ভাবের যে অনির্ব্বচনীয়তা, সৌন্দর্য্যের অজস্র উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বিত হ'য়ে ওঠে তাকে ভাষা দেওয়াতেই শিল্পের চরম স্ফূর্ত্তি। আর্ট পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি—যে-সৌন্দর্য্য আছে কেবল ভাবুকের হৃদয়পদ্মে। এই পরিপূর্ণতার আদর্শ কিন্তু সকলের সমান নয়। বৈচিত্র্যই বিশ্বের প্রাণ; জনে জনে মনে মনে দৃষ্টির বিভিন্নতা, অনুভূতির নূতনতা আছে ব'লেই সংসার সুসহ হয়েছে। রাত্রির 'পর দিন এবং দিনের পর রাত্রি, এরা যদি নিত্যকাল একই কথা ব'লত, রূপ ও রসের একই দৌত্য নিয়ে অনুদিন আমাদের অনুসরণ ক'রত, তবে জীবন আমাদের নিতান্তই দুর্ব্বহ হয়ে উঠ্‌ত সন্দেহ নেই। অসীম আকাশে ঐ যে তারা, ঐ যে চাঁদ জ্যোৎস্নার তরণী বেয়ে আমার মনের কূলে এসে নিত্য আমায় ডাক দেয়, ফুলের সৌরভে ভরপুর ঐ যে পেলবপবন অপূর্ব্ব হিল্লোলে আমার অঙ্গে অঙ্গে পুলকের শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে যায়, ওদের যদি নূতন কিছু ব'ল্‌বার না থাক্‌ত, কিংবা সকলের কানেই যদি ওরা একই কথা পুনঃপুনঃ গুঞ্জন করে ফির্‌ত তবে নিশ্চয়ই এই বিশ্বসৃষ্টির অন্তরে আনন্দের যে অমেয়তা এবং ধ্যানের যে বিচিত্রতা আছে তা পদে পদে ক্ষুণ্ণ হ'ত। শিল্প এই ব্যক্তিগত রসানুভূতির অভিব্যক্তি, শিল্পীর নিজস্ব আনন্দের শোভনতম প্রকাশ। তাই শেলীর "স্কাইলার্ক" এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "স্কাইলার্ক" এক জিনিস নয়; তাই প্রত্যেক কবিই বাস করেন নিজের কল্‌পনা ও রসানুরঞ্জিত একটি স্বতন্ত্র জগতে। চোখ দিয়ে দেখা জিনিসকে মন দিয়ে দেখ্‌লে কেমন দেখায়—রূপ-তূলিকায় রসের মূর্ত্তিখানি কেমন অপূর্ব্ব-রূপে ফুটে ওঠে, তাই পাই আমরা রূপদক্ষের শিল্প-রচনায়। অথচ শিল্প বিশ্বজনীন।

শিল্প সত্যসুন্দরের প্রকাশ, মানবমনের প্রাথমিক বৃত্তিনিচয়ের দ্যোতনা এবং দেশকালনির্ব্বিশেষে রসরুচির বিচারে তার মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি নেই। এই বিশ্বজনীনতা দেখা যায় পৃথিবীর বড় বড় রূপ-দক্ষের রচনায়—শেক্সপীয়রের 'ওথেলো', কালিদাসের "শকুন্তলা", গ্যটের "ফাউস্ট", রবীন্দ্রনাথের কাব্য, র‍্যাফেল ও মাইকেল এঞ্জিলোর চিত্রাবলী, সাজাহানের 'তাজমহল' এই কারণেই সর্ব্বজনস্বীকৃত। কিন্তু যা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত তা সর্ব্বজনীন হয় কেমন ক'রে? এই যে তোমার দেখা এবং আমার দেখা, এরা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত এবং সেই কারণে অনেক পরিমাণে বিভিন্ন হ'লেও এদের একটি কেন্দ্রগত ঐক্য আছে। তা যদি না থাকৃত তবে একজনের রচনা আর একজন পড়ে তৃপ্তি পেত না—একজনের গাওয়া গান আর একজনের কানে সুধাবর্ষণ ক'রৃত না। বৈষম্যের মধ্যে মিলনের গানই শিল্প—বৈচিত্র্যের অভ্যন্তরে এই কেন্দ্রগত ঐক্যের বাণীই কাব্যে, সঙ্গীতে, স্থাপত্যে, চিত্রে যুগে যুগে অভিব্যক্ত হয়ে এসেছে। ব্যক্তিগত রুচি যদি বিশ্বরুচির অন্তর্লীন না হ'ত, আমাদের প্রাথমিক চিত্তবৃত্তির দ্যোতনা শিল্পলিপিতে একমাত্র স্বাতন্ত্র্যের রূপেই যদি প্রতিভাত হ'ত তবে আর্টের মধ্যে বিশ্বজনীনতার প্রসঙ্গ অবান্তর হ'ত নিশ্চয়ই।

মনীষী বার্গস ব'লেছেন, আমাদের এবং প্রকৃতির মাঝখানে অর্থাৎ আমাদের ও আমাদের চৈতন্যের মধ্যে একখানি রহস্যের যবনিকা দোদুল্যমান র'য়েছে—তার ভিতর দিয়ে স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না, তবে শিল্পীর দৃষ্টিতে কিছু কিছু প্রতিভাত হয়। এই পর্দ্দা প্রয়োজনের পর্দ্দা—সংসারে এসে মানুষকে বাঁচ্‌বার কথাই ভাব্‌তে হয় আগে, তাই বস্তুজগতের মধ্যে যেটুকু আমাদের কাজে লাগে সেইটুকুর জন্যই আমরা ব্যস্ত হ'য়ে ছুটাছুটি করি। সাধারণ মানুষের কাছে তাই রসলোকের দ্বার এমন ক'রে রুদ্ধ;—শিল্পী প্রয়োজনকে কেবল প্রয়োজন ব'লেই জানে—তাকেই সর্ব্বস্ব ব'লে স্বীকার করে না। তরুর মত ধরণীর স্তন্যরসে সে ধন্য হয় বটে কিন্তু তার শীর্ষে বর্ষিত হয় ঊর্দ্ধলোকের অজস্র মুক্তকিরণ। সেইখানে সে অমর; জীবলোকে মানুষ সান্ত, রসলোকে সে অনন্ত। এই অনন্ত

সৌন্দর্য্যের অনুভূতিকে ব্যক্তিস্বরূপে আস্বাদ করাই আর্টের ধর্ম্ম। চিত্র বল', স্থাপত্য বল', সঙ্গীত বল' প্রত্যেকেরই একমাত্র উদ্দেশ্য এই ব্যাবহারিক প্রতীক—সামাজিক সুবিধা-শৃঙ্খলার জন্য কল্পিত কৃত্রিম মূল্যমানগুলিকে পরিহার ক'রে সত্যের সম্মুখীন হওয়া, অর্থাৎ বস্তু-প্রতিমার জীর্ণপঞ্জরে ভাবাদর্শের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এই আদর্শ শিল্পীর সম্পূর্ণ নিজস্ব। চিত্রকরের শিল্পপটে যে-ছবি মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে তা কোন একটি বিশেষ সময়ের, বিশেষ স্থানের ও বিশেষ কল্পনার দ্বারা অনুরঞ্জিত। কবিবীণায় যে-বাণী ঝঙ্কৃত হয়, তা তাঁর মনের বিশেষ একটি সত্যপ্রতীতির দ্বারা অনুবিদ্ধ—যা কবি নিজেও হয়ত আর ফিরে পান না। তবে আর্ট বিশ্বের মহামহোৎসবে আনন্দের অমৃত বিলায় কেমন করে? কোন একটি ভাবকে আমরা সকলে সত্য ব'লে স্বীকার করি না ব'লেই যে সেটা বিশ্বজনীন হবে না তার কোন মানে নেই। হ্যামলেটের চরিত্রের চেয়ে অদ্ভুত এবং অসাধারণ আর কি হ'তে পারে? তবুও সাধারণে তাকে হৃদয় দিয়েই গ্রহণ করে;—এই হিসাবেই শিল্প সর্ব্বজনীন। কিন্তু যা একান্ত ব্যক্তিগত (individualised) তা সকলের হয় কি উপায়ে? কারণ তা অকৃত্রিম আবেগ-সমুত্থ। অকৃত্রিমতা জিনিষটি সংক্রামক—এক হৃদয় থেকে অপর হৃদয়ে সহজেই সঞ্চারিত হয়। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলাবিৎ ঋষি টলষ্টয় বলেন, শিল্পের উদ্দেশ্য অপরকে আমাদের আবেগের এবং আনন্দের অংশ দেওয়া। যে-সংবেদনা আমি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি ক'রেছি, বস্তুসিন্ধু মন্থন ক'রে যে পীযূষ-প্রসাদ আমি পেয়েছি, জনে জনে মনে মনে সেই প্রসাদ পরিবেষণ ক'রে দেওয়াই হ'ল আর্টের কাজ। আমার ভাব যদি ঠিকমত ভাষা না পেয়ে থাকে, আমার ভাবের মধ্যে সত্যকার দরদের যদি অভাব থাকে, তবে তা কখনই অপর হৃদয়কে স্পর্শ ক'রতে পারে না। বার্গস'র মত টলষ্টয়েরও অভিমত, শিল্পের সর্ব্বপ্রধান গুণ হ'ল তার অকৃত্রিমতা বা দরদ্—এই দরদ্ আছে বলেই একজনের আবেগ অন্যের হৃদয়ে সংক্রমিত হয়, একজনের

আনন্দ বিশ্ব-বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে স্পন্দিত হয়ে ওঠে। এই সংক্রমণ (infection) সম্ভব হয় তখনই যখন আমরা ঠিক প্রকৃতির বুকেই মানুষ হই—যখন সভ্যতার কৃত্রিমতা বা আবেষ্টনীর প্রভাব আমাদের উপর কাজ না করে। তখন আমরা কবির সঙ্গে হাসি কাঁদি, তিনি আমাদের মনকে যে পথে হাত ধরে নিয়ে যান আমরা দ্বিধাহীনচিত্তে সেই পথেই এগিয়ে চলি। তবে যারা বর্ণান্ধ বা শব্দবধির তাদের কথা অন্যরূপ। টলষ্টয়ের মতে আবেগের অকৃত্রিমতাই হ'ল শিল্পের সার কথা—আবেগটি ভাল কিংবা মন্দ, সুন্দর অথবা অসুন্দর সে বিচার শিল্পের নয়। তাঁর মতে সত্যকার 'দরদ্' এবং সুষ্ঠু প্রকাশের উপরই আর্টের মহত্ত্ব নির্ভর করে।

শিল্পের আর দুটি প্রধান লক্ষণ তার অবিনশ্বরতা ও ব্যঞ্জনা। মানব-জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু সেই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ-বিরাগ, প্রেম-ভক্তি প্রভৃতির উপাদানে যে শিল্প নির্ম্মিত হয়, তা শাশ্বত ও সনাতন। সাজাহান আজ জীবিত নেই—কিন্তু প্রিয়াবিয়োগবিরহে তাঁর বিমথিত চিত্তের যে দীর্ঘনিঃশ্বাস তিনি মর্ম্মরনির্ম্মিত তাজের মধ্যে রেখে গেছেন তার মৃত্যু নেই। যখনই তাজের কাছে যাই তখনই কেবল যে তার সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকৃষ্ট হই তা নয়,—সে আমার মনের কানে কোন্ দূরকালের প্রিয়াবিরহিত প্রেমিক সম্রাটের মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দনধ্বনি বহন ক'রে আনে—সেই সম্রাট যিনি রাজৈশ্বর্য্যের চেয়ে তাঁর প্রেমকে বড় ক'রে দেখেছিলেন, মর জীবনে প্রেমের অমর মহিমাকে যিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রেছিলেন, তাঁরই কথা বারংবার মনে পড়ে,—আর বর্ত্তমানের মধ্যে অতীতের দ্রাক্ষারসমদিরা পান ক'রে আমরা বিহ্বল হ'য়ে যাই। এই জন্যেই ধ্বনিকার ব'লেছেন—কাব্যস্য আত্মা ধ্বনিঃ। রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন তাজমহল স্থির হ'য়েও চঞ্চল, সে যেন পরলোকগত প্রিয়তমার সহিত রাজাধিরাজ সাজাহানের বাণীবিনিময়ের দূত—সে যেন মর্ম্মর দিয়ে রচিত একখানি আর্ত্ত সঙ্গীত। তাজমহলের উদ্দেশে শিল্পী হ্যাভেল ব'লেছেন, "তাজমহল নারী-সৌন্দর্য্যের চরণমূলে ভারতের শিল্প-সাধনার মহনীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি

—ইহা প্রাচ্যের ভিনস্-দ্য-মিলো।" পেটর এক জায়গায় ব'লেছেন "আর্টের আদর্শ সঙ্গীত; যে পরিমাণে যে-আর্ট সঙ্গীতকে লক্ষ্য ক'রে অগ্রসর হ'য়েছে অর্থাৎ বস্তুসীমাকে অতিক্রম ক'রে সঙ্গীতধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হ'তে পেরেছে সেই পরিমাণে তা সফল হ'য়েছে।" পেটরের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও সঙ্গীতকে শিল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে "অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি। অসীম যেখানে সীমাহীনতায়সে খানে গান। রূপরাজ্যের কলা ছবি, অপরূপরাজ্যের কলা গান। কবিতা উভচর, ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও ওড়ে। কেন না কবিতার উপকরণ হ'চ্ছে ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ, একটা দিকে সুর। এই অর্থের যোগে ছবি গ'ড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান।" আর একস্থলে ব'লেছেন, "কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত, সেইজন্য কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের, গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে।" সঙ্গীতধর্ম্ম তাজের মধ্যে আছে পূর্ণমাত্রায়—সে হিসাবে তাজের শিল্পমূল্য অসামান্য। প্রত্যেক স্থাপত্যশিল্পেরই একটা প্রয়োজনের দিক আছে যেটা সসীম, আর একটা দিক আছে তার সৌন্দর্য্যের, যেখানে সে অসীমের মধ্যে মুক্ত। রৌদ্রবর্ষায় বস্তুজগতে সে আমাদের আশ্রয়,—ধ্যানলোকে সে আনন্দের চিরনন্দন, সৌন্দর্য্যের সুরধাম। স্থাপত্যের মধ্যে তাজ মহত্তম, কারণ তাকে দেখে সীমা বা প্রয়োজনের দিকটা মনেই আসে না—গঠনসুষমার অনিন্দ্য বিকাশে, ব্যঞ্জনার মহনীয়তায় সে একেবারে আমাদের হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশ করে। মরিসের মতে আর্টের চরম অভিব্যক্তি হয় ভাবের সঙ্গে প্রয়োজনের অঙ্গাঙ্গি-মিলনে। তিনি বলেছেন, "কোন দেশে শিল্পের প্রসার কেমন হ'য়েছে আমি তার বিচার করি তার চিত্রগুলির মানদণ্ডে নয়, তার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষের মধ্যে সৌন্দর্য্যের আলিম্পন ও প্রতিবিম্বনে।" এই উক্তির দ্বারা মরিস্ একথাও বল্‌তে চেয়েছেন যে যে দেশের এবং যে জাতির মধ্যে সৌন্দর্য্যপ্রীতি এতদূর ব্যাপক হ'য়ে পড়েছে

যে প্রাত্যহিক ব্যবহারের তুচ্ছ জিনিষেও সে তার ছাপ রেখে গিয়েছে, সেই দেশের এবং সেই জাতির মধ্যেই শিল্প তার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। এই রূপচেতনা জাপানী জাতটার মধ্যে এমন ক্রিয়াশীল যে তাদের ওঠায়-বসায়, চলনে-বলনে এমন কিছুই পাওয়া যায় না যার মধ্যে ছন্দ এবং সুষমার অভাব ধরা পড়ে।

"মানুষের ভিতরে সে কোন্ বস্তু আছে যা নিশ্চিত-মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও অমরত্বের দাবী করে? এ আমাদের সেই মনের মানুষ যে তার অফুরান ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে ঝল্‌মল্ ক'রছে" এবং লোকে লোকে কালে কালে শিল্পকলার মধ্যে অভিব্যক্ত হ'চ্ছে। আর্টের চিরন্তনতা সম্বন্ধে কীট্‌স্ তাঁর "Grecian urn" কবিতার মধ্যে ব'লেছেন—মানবজীবন নশ্বর, আর্ট সুন্দর ও অবিনশ্বর; যার বিনাশ নেই, যা চিরন্তন, তা সত্য; অতএব আর্ট চিরন্তন, সত্য ও সুন্দর। সত্য সুন্দর পৃথক্ নয়, একই বস্তুর দুই বিভিন্ন হৃদয়ে প্রতিভাত বিভিন্ন মূর্ত্তি। সত্যসন্ধানীর কাছে যা সত্য, রূপদক্ষের চক্ষে তাই সুন্দর। "তাজমহল" শীর্ষক অপূর্ব্ব কবিতায় কবি অনেকটা এই ভাবেরই ইঙ্গিত ক'রেছেন। তিনি ব'লেছেন, সময় মানুষের এবং তার সংসৃষ্ট যা কিছু সকলেরই উপর তার অমোঘ প্রভাব বিস্তার করে যুগে যুগে; তাকে তো কেউ ভুলিয়ে রাখতে পারে না! সময়ের হৃদয়হরণ করতে পারে শুধু শিল্প, যখন সে তার সৌন্দর্য্যের অপরূপ উপচার নিয়ে,—তার কাননের কমনীয়তম কুসুমগুলি দিয়ে রমণীয় মাল্য গ্রন্থন ক'রে তার দ্বারে এসে উপস্থিত হয়।

"হে সম্রাট্, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয়হরণ
সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে;
কণ্ঠে তার কী মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে!

রাস্কিন্ ব'লেছেন, আর্টের মধ্যে যা কিছু মহৎ তা অসীমের আরতি; অথবা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"যাবার আগে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই,
যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই;
এই জ্যোতিঃসমুদ্র মাঝে, যে শতদল পদ্ম রাজে,
তারই মধু পান ক'রেছি ধন্য আমি তাই!"

হে ভগবান, হে বিশ্বশিল্পী, তোমার বিচিত্র রচনার মধ্যে যখন যেটি ভাল লেগেছে, তাতেই আমার চিত্ত ভ'রে গিয়েছে। সেই যে ভাল লাগা, তোমার প্রকাশের সঙ্গে আমার প্রাণের যে প্রেম-সম্বন্ধ, ক্ষণে ক্ষণে আমার হৃদয়াকাশে ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণে রঞ্জিত হ'য়ে ফুটে উঠেছে; কোকিলকূজনে, কমলগন্ধে যে-আনন্দ আমার জীবনকুঞ্জে নন্দিত হ'য়েছে, হে অনন্ত, জীবনান্তে সেই বন্দনাই যেন তোমার চরণারবিন্দে পৌঁছে দিতে পারি! যিনি অর্থ ও ভাষার অতীত, তাঁকে কিছু নিবেদন ক'রতে হ'লে চাই এমন কিছু যা ভাষা ও অর্থের অতীত—মনুষ্যলোকে সুর ছাড়া এমন জিনিষ আর কি আছে যা আনন্দের প্রেরণায় পরম-সুন্দরের চরণস্পর্শ ক'রতে সমর্থ? সঙ্গীতের মধ্যে আমাদের অন্তরতম মানুষটি সেই বিরাট্ ও মহান্ মানুষের কাছে তাঁর লিপির উত্তর পাঠিয়ে দিচ্ছে, যে লিপি তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন এই বিশ্বভুবনের আনন্দ-সন্দোহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে! শিল্পের মধ্যে তাই সঙ্গীতের আসন সর্বোচ্চে!

আর্ট কি তা দেখা গেল। আর্ট কি নয় তারই আলোচনা ক'রে শেষ ক'রব। শিল্প যে প্রয়োজনের ত্রিসীমায় যায় না·একথা প্রবন্ধারম্ভে বারবার বলা হ'য়েছে। ক্রোচি বলেন, শিল্প আনন্দেরও ধার ধারে না—সে আমাদের আনন্দ দিতে পারে কিনা কলালোচনার দিক থেকে সেকথা অবান্তর। আর্টকে তিনি একটি 'intuition' বা সহজ-বিজ্ঞান মাত্র মনে করেন। এবং যেহেতু ভাল-লাগা, না-লাগা নির্ভর করে মানুষের শিক্ষাদীক্ষার উপর সেই হেতু তা স্বত-উৎসারিত নয়; যাকে আমরা মনোবৃত্তি বলি সে জিনিষটা গড়ে ওঠে আবেষ্টনীর

মধ্যে। সুতরাং যা সহজলব্ধ বা a priori নয় তা আর্ট বা সহজ-বিজ্ঞানের উপজীব্য হ'তে পারে না। এ-মত কিন্তু আমাদের বেশ সমীচীন মনে হয় না—কেননা আনন্দকেও যদি শিল্পরাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে দেওয়া হয়, তাহ'লে "mere intuition" এর তাৎপর্য্য কি তা বোঝা যায় না। বাস্তবিক আর্ট তো ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, মনের বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি (creation of the mood), কবিহৃদয়ের ধ্যানস্বপ্ন। আনন্দ হ'তেই এর উৎপত্তি, আনন্দেই এর পরিসমাপ্তি। তাই কোন শিল্প-বস্তুকে ব্যক্তি-সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিরপেক্ষ সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়ে দেখা সম্ভব নয়। সম্বন্ধের সংকীর্ণতায় সমগ্রের ব্যাপ্তি ক্ষুণ্ণ হয় বটে—কিন্তু ব্যাপ্তির দিক দিয়ে যা হারাই, আবেগের তীব্রতার দিক দিয়ে তা দ্বিগুণ ক'রে ফিরে পাই। রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী' কবিতায় নারী-সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধবিরহিত রূপটিই প্রকাশিত হ'য়েছে। কল্পনার দিক দিয়ে এই কবিতা যেমন অনবদ্য মাধুর্য্যে মণ্ডিত হ'য়েছে, অবিমিশ্র রসের দিক দিয়ে এর সৌন্দর্য্যও সেই পরিমাণে খণ্ডিত হ'য়েছে সন্দেহ নেই। কল্পনা আমাদের বিস্মিত করে—স্পন্দিত করে না। তাই এই কবিতা একদিক দিয়ে যেমন অসাধারণ সুন্দর, আর এক দিক দিয়ে তেমনি এর কোথায় যেন অপরিমিত শূন্যতা!

আর্ট এত বেশি 'personal' (ব্যক্তিগত) ব'লেই তা আমাদের এত বেশি আনন্দ দিতে পারে—যেখানে সম্বন্ধ নেই সেখানে আবেগের তীব্রতা কোথায়? কাজেই আনন্দের অংশও তার মধ্যে অত্যন্ত কম। এই কারণেই বৈষ্ণব কবিরা ভগবানের সঙ্গে নানারূপ লৌকিক সম্পর্ক পাতিয়ে মানবীয় প্রেমের মধ্যে দিয়েই তাঁকে পেতে চেয়েছেন—এই কারণেই হিন্দুরা ভগবানের কতকগুলি প্রতীক কল্পনা ক'রে, তাঁর সঙ্গে নানা বিচিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে তাঁর স্বরূপকে উপলব্ধি ক'র্‌তে চেয়েছিলেন। ধর্ম্মের দিক দিয়ে যাই হ'ক, কাব্যহিসাবে যে পদাবলী সাহিত্য সত্যই অতুলনীয় এ সম্বন্ধে দুই মত হ'তে পারে না। এখানে মনে রাখ্‌তে হবে যে ব্যক্তিত্ব আর বৈশিষ্ট্য এক কথা নয়—একজনের

মনোবেগ অপরের হৃদয়ে সহজেই সঞ্চারিত হয়। মানুষে মানুষে যথেষ্ট প্রভেদ থাক্‌লেও তাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন কতকগুলি সহজ ও অপরিবর্ত্তনীয় বৃত্তি আছে যা শিক্ষাদীক্ষা ও আবেষ্টনীর প্রভাবের অনেক উপরে এবং যা বিচিত্র কুসুমদামগ্রথিত মাল্যের মধ্যস্থিত সূত্রটির মত, এই বহুধাবিভক্ত মানব সমাজকে একান্তভাবে ধ'রে রেখেছে। তাই কবির হৃদয়ের যে ভাব—তাঁর অনুভূতির যে অনুপতা তা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব হলেও সহজেই অপর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়; একের অনুভূতি বিশ্বের অনুভূতি হ'য়ে দাঁড়ায়। তবে ক্ষুদ্র আনন্দে শিল্পের মন ভরে না, সে বলে—"নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্"।

শেষকথা আর্ট নীতি নয়। স্কুলমাষ্টারীর দাবী সে কোন কালেই করে না। নীতির অংশ প্রবেশ ক'র্‌লেই তার রসের ও আনন্দের অংশ হ্রাস হয়ে আসে। সরল সহজ নীতিকথা কোন কালেই আমাদের বেশ হৃদ্য হয় না। সুতরাং সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে নীতি ও উদ্দেশ্যকে (purpose) প্রচ্ছন্ন রাখ্‌তে হয়। নীতিপ্রচারের দ্বারা যেমন আর্টের আনন্দ ক্ষুণ্ণ হয়—তার স্বচ্ছন্দ বিকাশ বাধা পায়—তেমনি বাস্তবতার নামে দুর্নীতি-প্রচারে শিল্পের শ্লীলতা ও শুচিতা নষ্ট হয়। অতএব সু কিম্বা কু কোন প্রকারের নীতি প্রচার করাই শিল্পের কর্ত্তব্য নয়; বাস্তবিক কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে কেবল বলা যেতে পারে সেখানি সুলিখিত কিংবা কুলিখিত; তার মধ্যে শীলোপদেশ আছে কিনা সে কথা সাহিত্যের পক্ষে একান্ত গৌণ।

নীতি সামাজিক শৃঙ্খলা ও সুবিধার জন্য বিরচিত নিয়মমাত্র। সুতরাং উপরে শিল্পের যে ব্যাখ্যা আমরা ক'রেছি সেই মাপকাঠি দিয়ে বিচার ক'র্‌লে অবশ্যই বল্‌তে হয় যে নৈতিক উপযোগিতার দিক দিয়ে কোন শিল্পলিপিরই মূল্য নির্দ্ধারিত হ'তে পারে না। আর্ট যদি intuition বা সহজ-বিজ্ঞান হয় তবে মানুষের নিজের-হাতে-গড়া কতকগুলি সাধারণ সামাজিক নিয়ম কখনই তার অঙ্গীভূত হ'তে পারে না। দেশকাল-পাত্রভেদে মানুষের নৈতিক আদর্শও

ভিন্ন। সুতরাং একদেশের শিল্প-সাহিত্যে যা নীতির পরাকাষ্ঠা ব'লে বিবেচিত হয়, অন্য দেশে অথবা অন্য কালে তা' সেরূপ সমাদর পায় না বা সম্পূর্ণ অনাদৃত হয়। আমাদেরই দেশের সমাজচিত্রে পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে যদি এক পুরুষের একাধিক বিবাহের প্রসঙ্গ থাকত তবে তা আদৌ অশোভন হ'ত না—কিন্তু এখন হয়। তেমনি সে সময়ের সাহিত্যে বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গমাত্রও অরুচিকর ছিল, এখন তা সমাদরে সাহিত্যের আসরে স্থান পাচ্ছে। বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনে নিরতিশয় বিরক্ত ও মর্ম্মাহত হ'য়ে সেকালে গুপ্তকবি, দাশুরায় প্রভৃতির মত মননশীল লেখকও বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে বক্রোক্তি ক'রতে কুণ্ঠিত হন নি। বিভিন্ন দেশের নৈতিক আদর্শে যে বিভিন্নতা থাক্‌তে পারে তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এরূপ পরিবর্ত্তমান নৈতিক আদর্শ কথনই উচ্চাঙ্গের শিল্পে স্থান পেতে পারে না। হুইট্‌ম্যান্‌ বলেছেন,

"I give nothing as duties.

What others give as duties, I give as loving impulses.

(Shall I give the heart's action as a duty ?)

অর্থাৎ কর্ত্তব্যের বিশ্লেষণ সে আমার নয়।

অন্যে যারে কর্ত্তব্য বাখানে আমি তারে দিই 'প্রেম'-নাম।

(হৃদয়ের স্বাধীন প্রয়াসে কর্ত্তব্য কি কভু বলা সাজে ?)

উদ্দেশ্যের দিকটা যে-কাব্যের মধ্যে খুব পরিস্ফুট তার সঙ্গে আমাদের প্রাণের সুরটি তেমন মেলে না—শুদ্ধ সৌন্দর্য্যের মহিমা নিয়ে যা আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করে তারই নাম কাব্য।

এ প্রসঙ্গে অতি-আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে মানুষের যৌন প্রকৃতিকে এমন সূক্ষ্মভাবে চিরে চিরে দেখান হ'য়েছে, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হ'য়েছে, যে তার শিল্পসৌন্দর্য্য পদে পদে ব্যাহত হ'য়েছে। যৌনজীবনের সৌন্দর্য্য ও শুচিতা নির্ভর করে রহস্যের গভীরতায়,

বাসনার নগ্নতায় নয়। দুটি হৃদয় যখন কোন এক অনির্দ্দেশ্য চিরন্তন আকর্ষণে পরস্পরের অতি কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়—দেহের লালসা যখন উৎসারিত হয় পরিশুদ্ধ হৃদয়াবেগের উৎসমুখে তখনই তা চারুকলার বিষয়ীভূত হয়। জৈব প্রকৃতির ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ তো বৈজ্ঞানিকের কাজ—তার তত্ত্বের দিক। যৌন-অভিজ্ঞতার ভিতরে যে অনির্দ্দেশ্য রহস্য ও সহজ আনন্দ নিহিত আছে তারই রসসম্পৃক্ত বিবৃতির নাম সাহিত্য। আজকালকার তরুণ লেখকেরা পাশ্চাত্যের অনুকরণে আর্টকে বিজ্ঞানের কোঠায় এনে ফেলেছেন—তথ্যের চাপে সত্যের কণ্ঠরোধ ক'রেছেন। "কৃষ্ণকান্তের উইলে" গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর অবৈধ (অবশ্য সামাজিক হিসাবে) আকর্ষণের কথা ব'লতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র একস্থলে ব'লেছেন, "কেন যে এতকালের পর তাহার এ দুর্দ্দশা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না এবং বুঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে—কখন তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন? জানি না। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা তাহা বলিয়াছি। তাহাতে কি হয় না হয় আমি জানি না। যেমন ঘটিয়াছে আমি তেমনি লিখিতেছি।" মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এই প্রেমের নিপুণ বিশ্লেষণ বঙ্কিমের ক্ষমতার অতীত ছিল না, তবু তিনি সে প্রয়াস করেন নি, কারণ শিল্প ও বিজ্ঞানের স্ব স্ব অধিকার সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন; সাহিত্যে তত্ত্বের আলোচনায় শিল্পের অবাধ আনন্দ ক্ষুণ্ণ হয় একথা তিনি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতেন। নিখিলমানবের প্রাথমিক হৃদয়বৃত্তি—এই যৌনকামনাকে অতিমাত্রায় জাগ্রত ক'রে তুলতে গিয়ে হুইট্‌ম্যানের "The Children of Adam" কাব্যখানি রসাংশে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছে ব'লে মনে হয়। যৌনজীবনের আলেখ্য অঙ্কনে শিল্পের আপত্তি নেই—আপত্তি তার অঙ্গের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদে। গ্রীক ভাস্করক্ষোদিত নগ্ন প্রতিমা যখন দেখি তার মধ্যে কুৎসিত কিছুই পাই না, কারণ সেখানে বিচ্ছিন্নতা নেই, আছে অংশসমূহের সুব্যবস্থিত সমগ্রতা।

সবশেষে একথা বলা যেতে পারে যে নৈতিক শব্দের অর্থ যদি হয় "আধ্যাত্মিক", তবে তা শিল্পের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের অধ্যাত্ম-প্রকৃতির অভিব্যক্তির নামই শিল্প। আমাদের সকল আশা, সব ভালবাসা, অন্তরের গভীরতম পিপাসা যখন রূপের দুয়ার দিয়ে প্রবেশ ক'রে আমাদের অপরূপের রাজ্যে নিয়ে যায় তখনই আমরা ললিতকলার চরমতম অবদানকে পেয়ে কৃতার্থ হই।

কাব্যে সত্য-শিব-সুন্দর

সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্ম্মে আজকাল আমরা প্রায়ই সত্য-শিব-সুন্দর এই তিনটি শব্দ একত্র শুনিতে পাই এবং মোটামুটি ঐ শব্দগুলির একটি মনঃকল্পিত অর্থও করিয়া লই। অনেকেরই বিশ্বাস উক্তিটি উপনিষদের; অবশ্য এ বিশ্বাস কেমন করিয়া আসিল বলা কঠিন। বস্তুতঃ পাণিনির পূর্ব্বে সংস্কৃত-সাহিত্যে 'সুন্দর' শব্দই কোথাও পাওয়া যায় না এবং ইহা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে "সত্যং শিবং সুন্দরম্" খুব প্রাচীন পদযোজনা নহে। সম্ভবতঃ উপনিষদের 'সচ্চিদানন্দই' পরবর্ত্তী কালে 'সত্যশিবসুন্দরে' রূপান্তরিত হইয়াছে। যতদূর জানা যায়, মহাত্মা রামমোহন রায় ঐ শব্দাবলীর একত্র গ্রন্থন করিয়াছেন এবং তাহার পরে ব্রাহ্ম-সমাজের মারফতে কথাগুলি আমাদের দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমে প্লেটোই প্রথম "the truth, the good, the beautiful" এই মন্ত্রের উদ্গাতা এবং সম্ভবতঃ রাজা রামমোহন উপনিষদের 'সচ্চিদানন্দের' সঙ্গে এই বাণীর ভাবসাম্য দেখিয়া পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত সমাজের মন্ত্ররূপে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহা হউক, সত্যশিবসুন্দরের উৎপত্তি লইয়া আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কাব্যের মধ্যে উহাদের স্থান কোথায় ইহাই আমাদের বিচার্য্য। প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে সত্য, শিব এবং সুন্দর পৃথক্ বস্তু নহে, একই ভাবের বিভিন্ন রূপ। যাহা নিত্য ও শাশ্বত অর্থাৎ যাহা চিরদিনই বর্ত্তমান থাকে তাহাই সত্য। আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানও এই সত্যকে স্বীকার করে; জড় বিজ্ঞানের মতেও পদার্থের যদি কেবল রূপান্তরই সম্ভব হয়, তবে অধ্যাত্মসত্তার চরম বিনাশ কল্পনা করা কখনই সঙ্গত নহে। হিন্দু শাস্ত্রে অস্তিত্ব-হীনতা বুঝাইতে 'নাশ' বা 'লোপ' (অদর্শন) ব্যতীত অন্য কোন পরিভাষা

নাই; কারণ আর্য্য ঋষিরা কোন পদার্থেরই আত্যন্তিক বিনাশ স্বীকার করেন নাই। যাহা চক্ষুর অগোচর তাহা যে নাই তাহা কেমন করিয়া বলি?

বিজ্ঞানের ন্যায় কাব্যেও আমরা সেই সত্যেরই সাক্ষাৎ লাভ করি। তবে কাব্যে তাহাকে বস্তুরূপে পাই না, পাই ভাবরূপে; পরিচ্ছিন্ন সাময়িক প্রকাশরূপে নহে, পরন্তু স্থান-কালের অতীত এক অবিনশ্বর ভাববিগ্রহরূপে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষা ও দার্শনিকের শুদ্ধ জিজ্ঞাসালব্ধ সত্য হইতে কবির ধ্যানলব্ধ সত্যের কিছু পার্থক্য আছে। কবি সত্যকে দেখেন সুন্দররূপে, তাহার নগ্নরূপে তাঁহার মন ভরে না।

শুষ্ক জ্ঞানের পথ কবির নহে। জ্ঞানের দ্বারা আত্মার ভেদ-বুদ্ধিই জাগ্রত হয়,—'নেতি', 'নেতি' করিতে করিতে আসলে গিয়া পৌছান কঠিন হইয়া উঠে। তাই বেদান্ত দর্শনে দ্বৈতাদ্বৈতের কথাপ্রসঙ্গে বিজাতীয়, সজাতীয় ও স্বগত এই ত্রিবিধ ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রেমের জগতে আমরা পাই যুগপৎ এই ত্রিবিধ মিলন,—আপাত-বিভিন্ন বস্তুসমূহকে দেখি এক মহাতরুর শাখাপত্ররূপে।

সত্য হয় সুন্দর যখন সে আনন্দ দান করে। কেবল ভাব বা কেবল বস্তু আমাদের আনন্দ দিতে পারে না, কারণ বস্তু-নিরপেক্ষ ভাব আমাদের কল্পনার অতীত এবং ভাবনিরপেক্ষ বস্তু প্রাণহীন জড়পিণ্ডমাত্র। প্রথমটি লইয়া ব্যস্ত দার্শনিক, দ্বিতীয়টির সাধনায় নিরত বিজ্ঞানবিৎ। কবি কিন্তু দুইটির কোনটিকেই ত্যাগ করেন না; তিনি ভাবকে দেখেন বস্তুরূপের মধ্য দিয়া, সত্যকে লাভ করেন রূপ-প্রতিমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া। কবি সাকারের উপাসক, ভাব হইতে রূপের পথে এবং রূপ হইতে ভাবের পথে তাঁহার নিত্য অভিসার। সত্য যখন রূপের মধ্যে ধরা দেয়, ভাব যখন প্রতীকের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়, তখনই হয় তাহা সুন্দর। সুন্দর বলিতেই আমরা বুঝি মূর্ত্তি—যাহার রূপ নাই তাহা কখনই সুন্দর হয় না। নিখিল বিশ্ব-প্রকৃতি এক মহাভাবের প্রকাশ,—তাই সে সুন্দর।

এই যে বাহিরের প্রকৃতি তরু-লতা, নদ-নদী, সমুদ্র-পর্ব্বত, আকাশ-বাতাস প্রভৃতি দ্বারা শোভিত, ইহারাই তো সেই মহাভাবের বিচিত্র ভাষা—এই যে বস্তুপুঞ্জ, ইহাদের পশ্চাতে আছে এক মহান্ অর্থ—এক নিগূঢ় সত্য। এই ভাবময়ী ভাষা, অনন্ত অর্থের এই সাকার প্রতীক, ইহার ব্যাখ্যাতা কবি ও শিল্পী। অদৃশ্য হস্তের এই চারুকারু, অমেয় মনের এই সুষীম ভাবনা অনুভব করেন কবি। ভাবকে প্রত্যক্ষ করিবার, সৃষ্টির এই অনাদি অক্ষরের অর্থ গ্রহণ করিবার প্রতিভা আছে একমাত্র কবির। কারণ মানুষের যে-বদ্ধ দৃষ্টি তাহার সত্য-দর্শনের অন্তরায়, কবি সেই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হইতে মুক্ত। স্বার্থের যবনিকা তাঁহার সম্মুখে নাই—সংস্কারের ধূলিকণায় তাঁহার মনের আকাশ আচ্ছন্ন নহে, তাই বস্তুপুঞ্জের অন্তর্নিহিত অর্থ তাঁহার মনোলোকে সহজেই প্রতিবিম্বিত হয়।

এই যে ভাবসত্য যাহাকে দার্শনিকেরা লাভ করেন বুদ্ধি ও বিচারের আনুকূল্যে, কবি তাহাকে পান অনাবিল প্রেমের প্রেরণায়, এবং এই ভাবকে তিনি রূপায়িত করেন কতকগুলি মূর্ত্তির (image) মধ্য দিয়া। প্রেমের স্বধর্ম্ম ভাবকে রূপের প্রতিমায় আরোপ করা, আবার রূপকে ভাবের আকাশে মুক্ত করিয়া দেওয়া। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন ভাব কবির মনে রূপের আকারে ফুটিয়া না উঠে ততক্ষণ পয্যন্ত সেই ভাবের সহিত প্রেম হয় না। তিনটি পদার্থের গতি ও ক্রিয়া বুঝাইতে কাগজের উপর তিনটি বিন্দুই হয়ত দার্শনিক অনুভূতির পক্ষে যথেষ্ট; কবি কিন্তু এত অল্পে তুষ্ট হন না। ঐ পদার্থনিচয় যদি জীবনের গভীর অন্ধকারে আলোকপাত না করে, উহাদের গতিবেগের তরঙ্গ যদি আমার হৃদয়ে সঙ্গীতের আনন্দে বাজিয়া না উঠে, তবে উহাদের চলা-না-চলা আমার পক্ষে সমান। এমন কি, একথাও জোর করিয়া বলা চলে না যে রূপ ভাবের অনুগামী হয়। একটা সমগ্রভাব কবির অন্তরে একেবারে আকার লইয়াই আবির্ভূত হয়; কবির হৃদয়-সমুখ এই ভাব যেন মন্থন-সঞ্জাত শশাঙ্ক, সুধালোকে নিখিল প্লাবিত করিয়া উদিত হয়—অথবা এ যেন পরাগ-পাগল পুষ্প-পরিমল বায়ুকে আকুল করিয়াই ভাসিয়া বেড়ায়। সৃষ্টির অন্তরের যে অনির্ব্বচনীয় ভাব

তাহা রমণীয় রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রকৃতির নব নব বৈচিত্রীর মধ্যে। সাজাহানের প্রেম মর্ম্মরশতদলে বিকশিত হইয়াছিল বলিয়াই না তাহা এমন অপূর্ব্ব সুন্দর!

সৃষ্টির মধ্যে যে সম্পূর্ণতার ব্যঞ্জনা তাহা ধরা পড়ে কবির চোখে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কবির দৃষ্টি সংস্কার-নির্ম্মুক্ত, উদার ও অবারিত। কিন্তু প্রসারই কবিদৃষ্টির একমাত্র লক্ষণ নহে; ইহা যেমন সুদূর-প্রসারী তেমনই গভীর। রাত্রিকালীন আকাশ কবির কানে কানে কত কথাই না কহিয়া যায়—সে যেন তাঁহার ভাষা জানে, তাহার সহিত কবির যেন জন্ম-জন্মান্তরের পরিচয়। অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা তাঁহাকে বিশ্বরহস্যের দূরতম নেপথ্যে লইয়া যায়, ধ্যানের তন্ময়তা তাঁহাকে অকূল অতলের কত না অজ্ঞাত রত্নের সন্ধান দেয়। তাই তিনি খণ্ডকে দেখেন অখণ্ড ও সম্পূর্ণরূপে—এক মহাসত্তার প্রকাশরূপে। জগতের ভাবগত ও সৌন্দর্য্যগত ঐক্য আবিষ্কার করাই তাঁহার কাজ। বস্তুকে অবচ্ছিন্নরূপে কল্পনা করা সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয়—শব্দকে গন্ধ হইতে, রূপকে রস হইতে পৃথকরূপে অনুভব করা দৃষ্টির অক্ষমতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ধ্যানের লোকে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ সব একাকার হইয়া যায়। এক মহাশক্তির প্রকাশরূপে আমরা তাহাদের অনুভব করি; বৈচিত্র্যের মধ্যে দেখি ঐক্য, অশান্তির অন্তরে দেখি 'সুমহান্ শান্তি'। তাপরশ্মি হইতে বিচ্ছিন্ন আলোকরশ্মি যেমন নানা শারীরিক ব্যাধির উপশম করে, সেইরূপ অনন্ত বিক্ষোভ হইতে বিচ্ছিন্ন এই কেন্দ্রগত শান্তি আমাদের আত্মাকে এক অননুভূতপূর্ব্ব অমৃতের আস্বাদে পরিতৃপ্ত করে।

চোখ দিয়া যাহা দেখিতেছি মনের দেখার সহিত তাহা যে হুবহু মিলে না ইহা আমরা স্বতঃই অনুভব করি। যেমন জড়জগতে আণবিক শক্তির আলোড়নে প্রকাশিত হয় বর্ণ, আলোক ও উত্তাপ—যাহা শক্তিমাত্র তাহা যেমন বর্ণ ও আলোকচ্ছটায় বিম্বিত হয়, তাপরূপে অনুভূত হয় সেইরূপ যাহা সত্য বা ভাবমাত্র তাহাই আমাদের নেত্রপথে রূপরসাদি-বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতিরূপে প্রতিভাত হয়।

কবির গভীর দৃষ্টি বিষয়সমূহের অভ্যন্তরে অবগাহন করিয়া একেবারে কেন্দ্রে গিয়া উপনীত হয়। তাই তাঁহার পক্ষে চোখ দিয়া শোনা অথবা কান দিয়া দেখা কিছুই বিচিত্র নহে। এই বিশ্ব-শতদলের মধ্যদলে যে মহান্ 'এক' অধিষ্ঠিত আছেন, ছন্দে গানে, উৎপেক্ষা ও উপমায় কবি ক্রমাগত তাঁহারই দিকে ইঙ্গিত করেন। বিশ্বলয়ের বিরাট ছন্দে যেখানে তাল ভঙ্গ হয় কবির বীণা সেখানে নব নব সুরের সমাবেশ করিয়া সঙ্গীতকে সম্পূর্ণ করে; অসম্পূর্ণ অনুভূতিগুলি যেখানে ছিন্নমাল্যের ভ্রষ্টকুসুমের মত ধূলি-লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া থাকে, কবি কল্পনার স্বর্ণসূত্র যোজনা করিয়া সেইখানে তাহাদের ধ্যানের হারে গাঁথিয়া তোলেন।

শিল্পে, সাহিত্যে অনেকে আছেন বাস্তবতার পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে যেমনটি দেখা যায় ঠিক তেমনিটি অঙ্কিত করাই হইল শিল্পীর কাজ;—সাহিত্য সমাজের দর্পণ, শিল্প প্রকৃতির অনুকরণ। কিন্তু কোন বস্তুরই হুবহু অনুকরণ করা সম্ভব নহে—প্রয়োজন-অনুসারে শিল্পীকে সংযোগ-বিয়োগ কিছু করিতেই হয়। বাস্তব জগৎ প্রয়োজনের জগৎ, তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ প্রধানতঃ শরীরের। কিন্তু সাহিত্যে মানুষ সেই বাস্তব জগৎকে অবিকল সেইরূপই দেখিতে চায় না। প্রয়োজনের বাহিরে যে অবাধ অবকাশ, কাজের পরপারে যে আনন্দের লীলা আমাদের মনকে উৎসবের বর্ণরাগে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই শাশ্বত উৎসবের সঙ্গীতধ্বনি শুনিবার জন্য আমাদের মন কি কোন দিনই উৎকণ্ঠিত হয় না? প্রত্যহের জীবন সে তো শুধু দেহধারণের জন্য—সেখানে আছে নিত্য অভাব ও অসঙ্গতি, বেদনা ও হাহাকার। তাই সেখানে সৃষ্টির নবীনতা নাই, আছে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু শিল্পে আমরা প্রাত্যহিকের পুনরাবৃত্তি কামনা করি না—আমরা চাই নূতনের সাক্ষাৎ, আনন্দের সন্দেশ। পুরাতনের সহিত পরিচয় ঘটাইয়া দেওয়া উত্তম দূতীর কাজ হইতে পারে, কবির নহে। কবি কল্পমায়ায় নূতন ধ্যানলোকের সৃষ্টি করেন। এ যেন বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট নূতন জগৎ—সৃষ্টির দ্বিতীয় সৃষ্টি। আমাদের এই আদিম

বিশ্বকে কবি নবীন করিয়া কল্পনা করেন ও রমণীয় করিয়া রচনা করেন ; তাই কবির বীণায় দুঃখের রাগিণীও মধুচ্ছন্দে বাজিয়া উঠে ; সেই অলৌকিক লোকে গভীরতম বিষাদও মধুরতম আহ্লাদ বহন করিয়া আনে। সাহিত্য-দর্পণকার এই মায়ার নাম দিয়াছেন "অলৌকিক-বিভাব"। সাহিত্যে বাস্তববাদীও, যদি তিনি প্রকৃত শিল্পী হন্ তবে, জীবনের সাধারণ প্রতিচ্ছবি দিয়াই ক্ষান্ত হন না। রূপের তুলিকায় যে অপরূপ আলেখ্য তিনি অঙ্কিত করেন তাহা বাস্তবের অপেক্ষা বহুগুণে পূর্ণতর, গভীরতর ও মধুরতর হইয়া উঠে।

কাব্যে বাস্তব বলিতেও বুঝিব সত্যেরই প্রকাশ, তথ্যের নহে। কারণ বস্তু এবং সেই বস্তুসম্বন্ধে অনুবোধ এক জিনিষ নহে। এই অনুবোধেরই নাম সত্য। তথ্য কাব্যের উদ্দীপক হইতে পারে, কিন্তু উপজীব্য নহে। বস্তু যেখানে বস্তুই রহিয়া যায়, অন্তর্গূঢ় ভাবের ইঙ্গিত করে না—সেখানে চিত্র হয় "পট" অথবা "আতপচিত্র," আলেখ্য হইয়া ফুটিয়া উঠে না। সাহিত্যে বাস্তবতার অর্থ বস্তুসম্বন্ধে আমাদের অনুভূতিকে প্রকাশ করা —পারম্পর্য্যবিহীন ঘটনাবলীর অনুলেখনমাত্র নহে। একটি বৃক্ষ অথবা মানুষের ছবি যদি আঁকিতে চাই তবে তাহার বাহিরের অবয়বের অবিকল নকল করিলেই যথেষ্ট হইবে না ; সেই বৃক্ষ বা মানুষের পার্শ্বে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে, যতক্ষণ না উহা একটি প্রচ্ছন্ন ভাবের প্রতীকরূপে প্রতিভাত হয়। বাহিরের রূপকে প্রকাশ করিতে যন্ত্রই হয়তো যথেষ্ট, কিন্তু কবির মন্ত্র সেই রূপের অন্তরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, নির্জীব প্রতিমাকে লাবণ্যের হিল্লোলে লীলায়িত করিয়া তুলে।

শিল্পের 'সুন্দর' 'শিবে'র সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ; অর্থাৎ যে পরিমাণে যে কাব্য সুন্দর সেই পরিমাণে তাহা আমাদের অন্তঃস্থিত কল্যাণের আদর্শকে অভিব্যক্ত করে। এই কল্যাণ শিল্পে যেখানে অবিমিশ্র নীতি অথবা উপদেশের আকারে প্রকাশ পাইয়াছে সেখানে তাহা দূষণীয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কল্যাণ যেখানে স্বভাবের নিয়মেই সুন্দরের মধ্যে জন্মলাভ করে

সেখানে রসও অব্যাহত থাকে, অথচ আমাদের মনের স্বয়ং-সিদ্ধ যে কল্যাণ-বৃত্তি তাহাও যথেষ্ট প্রসাদ ও প্রসার লাভ করে। বস্তুজগতে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য (coherence) অনেক স্থলেই দেখা যায় না। একটি ঘটনা কেন হইল অনেক সময়ে তাহার কোন অর্থই আমরা খুঁজিয়া পাই না—কাজেই তাহা আকস্মিক ও অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয়। কল্পনার জগতে কিন্তু আকস্মিকের স্থান নাই, সেখানে দ্রষ্টা বা কবি সমস্ত ঘটনাকে এক অব্যাহত অখণ্ড দৃষ্টিতে উপলব্ধি ও প্রকাশ করেন, সুতরাং সমগ্র ঘটনার কোন অংশের তাৎপর্য্যসম্বন্ধে পাঠকের মনে কোন সংশয় থাকে না। এই যে সংহতির সুষমা (symmetry or coherence), ইহা একধারে সৌন্দর্য্য এবং কল্যাণ। রামায়ণে রামচন্দ্রের দুঃখের কাহিনীর মধ্যে আছে পরিপূর্ণ কল্যাণের আদর্শ। স্বেচ্ছাবৃত নির্ব্বাসনের মধ্যে, ব্যক্তিগত চরম দুঃখের মধ্যে সমষ্টির পরম কল্যাণ। তাই না ইহা এমন হৃদ্য ও অনবদ্য। সীতা-নির্ব্বাসনকে যদি বিচ্ছিন্ন ঘটনাহিসাবে কল্পনা করা যায় তবে তাহার মধ্যে পাওয়া যায় হৃদয়হীন নির্ম্মমতা। কিন্তু কাব্যগত সমগ্র ঘটনার পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে আমরা পাই শিব-সুন্দরের অনির্ব্বচনীয় অনুপ্রেরণা; সেখানে আছে রাজ্য ও প্রজা-সাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত রাজাধিরাজের অপূর্ব্ব স্বার্থবিসর্জ্জন—আরাধ্য দেবতার মঙ্গলের মুখ চাহিয়া পতিপ্রাণা সতীর জ্বলন্ত আত্মাহুতি। কালিদাসের কাব্যে আষাঢ়াকাশের সঞ্চীয়মান ঘনঘটা যদি নিখিল-ধরণীর পিপাসাশান্তির আশ্বাস বহন না করিয়া কেবল যক্ষেরই বিরহোপশমের কারণ হইত—কবিপ্রেরিত মেঘদূতের সান্ত্বনাবাণী যদি বিরহান্তে আমাদেরও ভাবি-মিলনের ইঙ্গিত না করিত তবে তাহা কখনই এমন হৃদয়সংবেদ্য হইত না। দুঃখ যদি কেবল দুঃখ হইয়াই থাকিত তবে তাহার জন্য আমরা কি বিন্দুমাত্রও ব্যাকুল হইতাম? অলঙ্কারশাস্ত্রে যাহাকে অলৌকিক-বিভাবত্ব বলা হইয়া থাকে তাহার অর্থ হইল দুঃখকে ক্ষেমে, বীভৎসতাকে প্রেমে পরিণত করা—সঙ্গতিহীন লৌকিক সংস্থানকে ভাবের স্বর্গে সুসঙ্গত ও সুসমঞ্জস করিয়া

কল্পনা করা; এক কথায়, জীবনের সকল ঘটনার মধ্যেই আনন্দের সুমধুর সুরটি ভরিয়া দেওয়া।

মম্মটাচার্য্য বলিয়াছেন, কাব্যের একটি গুণ 'শিবেতরে'র অর্থাৎ দুঃখের নাশ; কিন্তু সেই দুঃখনাশ-প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হইবে কান্তাসদৃশ মধুরতাযুক্ত উপদেশ দ্বারা। শব্দ প্রধানতঃ তিন প্রকারের; প্রভুসম্মিত, সুহৃৎসম্মিত এবং কান্তাসম্মিত। প্রভুসম্মিত যে বাক্য তাহাকে আমরা ভয় বা শ্রদ্ধা করি, সুতরাং তাহার প্রভাব মানবজীবনে খুবই সামান্য। যেমন বেদ-বাণী, ইহাকে আমরা সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা করি কিন্তু ইহা আমাদের চিত্তকে সুধারসসিক্ত করিতে পারে না। সুহৃৎসম্মিত পুরাণেতিহাসের উপদেশও আমাদের জীবনে পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে না; তাই আচার্য্যপাদ কাব্যের প্রসঙ্গে প্রিয়ার অনুরূপ উপদেশের কথা বলিয়াছেন। অমোঘ ইহার প্রভাব—আশ্চর্য্য ইহার ব্যাপ্তি। ললিতপদ-কদম্বসন্দীপিত কবিকথা কানের ভিতর দিয়া আমাদের মর্ম্মকুহরে প্রবেশ করে এবং আনন্দঘন চৈতন্যের উদ্বোধন করে। কাব্য সেই সুদুর্লভ বচন একমাত্র যাহার মধ্যে 'হিত' এবং 'মনোহারী'র অঙ্গাঙ্গি-মিলন সম্ভব হয়।

মূলতঃ অনন্তের সহিত অভিন্ন হইয়াও মানুষ যে কার্য্যতঃ ক্ষুদ্রহ ইতেও ক্ষুদ্র, ইহারই মধ্যে তাহার নৈতিক জীবনের প্রেরণা নিহিত রহিয়াছে। জীবনের মধ্যে এই যে একটা বিরোধ—অনন্ত হইয়াও যে মানুষ সান্ত—এই বিরোধ পরিহার করিবার অর্থাৎ ঐ আদর্শের অনন্তকে আপনার মধ্যে কার্য্যগত জীবনে পরিণত করিবার যে-চেষ্টা তাহাই তাহার নৈতিক জীবন। ব্যক্তিগত জীবনকে বিশ্বজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত করিয়া না দেখিলে তাহার ক্ষুদ্রতা ঘুচে না; ফুল যদি ফুল হইতে বিচ্ছিন্নই রহিয়া যায়, তবে তাহার মালাকারে পরিণতি কখনই সম্ভব হয় না। তাই সৃষ্টির অন্তর্নিহিত একত্বকে উপলব্ধি করিতে হইলে আত্মাকে ব্যক্তিগত জীবন হইতে বিশ্বজীবনে প্রসারিত করিয়া দিতে হয়। বাস্তবিক, ব্যক্তি ও সমাজ দুই স্বতন্ত্র পদার্থ নহে—একই অখণ্ড বস্তুর

দুইটি দিক। কবির বীণায় নিখিলের এই চিরন্তন মিলনের বাণীই ধ্বনিত হয়।

বিখ্যাত কবি ও সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড একস্থলে বলিয়াছেন, জীবনের উপর অধ্যাত্মভাবের উদ্‌ভাসের নামই কাব্য (powerful and beautiful application of ideas to life) ; অবশ্য 'ideas' বলিতে তিনি নীতি বুঝেন নাই অথবা নীতিমূলক কাব্যকেও তিনি শ্রেষ্ঠ আসন দেন নাই। তাঁহার মতে জীব-জীবনের সহিত যে-ভাবের কোন সংযোগ নাই—যে ভাব মহাশূন্যেই নিয়ত ঝুলিতেছে সে-ভাব, যত মহানই হউক না কেন, কাব্যের সম্পদবৃদ্ধি করে না; কেন না, জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন যে-ভাব তাহা আমাদের কাছে নিরর্থক, সুতরাং প্রকাশের সম্পূর্ণ অযোগ্য। ঐ যে দূরতম নীহারিকা মহাকাশে দুলিতেছে, আমার কাছে উহার কোন অর্থই থাকে না, যদি ঐ নক্ষত্রলোকের ভাষার সহিত আমার অন্তরের ভাষার কোন মিল না থাকে। বৈজ্ঞানিক উহার সংস্থান, পরিমাণ ও গতি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া কতকগুলি "সামান্য গ্রহের" আবিষ্কার করেন, কিন্তু তাঁহার ঐ আবিষ্কারে জগতের যত উপকারই হউক উহাকে কাব্য কিছুতেই বলা চলে না। বিজ্ঞানের স্বাভাবিক গতি সামান্য হইতে বিশেষে, কাব্য চলে বিশেষ হইতে সাধারণে; যাহা কবির একান্ত নিজস্ব কাব্যমায়ায় তাহা সহজেই সকলের হইয়া যায়।

কিন্তু যেখানে এই মঙ্গলকে কেবলমাত্র নীতোপদেশে পর্য্যবসিত করা হয় সেইখানেই কাব্য হইয়া পড়ে তত্ত্ব—সত্য হইয়া যায় তথ্য; শ্রদ্ধা আসে, সম্ভ্রম আসে, কিন্তু আনন্দ অলক্ষ্যে দূরে পলাইয়া যায়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত মহত্তম কবিও সময়ে সময়ে তাঁহার কাব্যে নীতিকে কল্যাণ বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন এবং অজ্ঞাতসারে নীরস নীতিতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। যেখানে তিনি বলিয়াছেন "his everlasting purposes embrace all accidents converting them to good," সেখানে তাঁহার কাব্য রসহীন দর্শনে পরিণত হইয়াছে—কারণ "ভগবান আছেন এবং তিনি আমাদের

সকল কর্ম্মকেই কল্যাণের পথে লইয়া যাইতেছেন” এই উক্তির মধ্যে আবেগের গাঢ়তা, কল্পনার বর্ণরাগ কই—প্রকাশরূপের মধ্যে বিষয়ের অতীত বস্তুর ধ্বনিই বা কোথায়? ইহা তো শুভসুন্দরের স্তবগান নহে—ইহার মধ্যে অপ্রত্যাশিতের বিস্ময় নাই। ইহা বহুবিদিত সাধারণ নীতিকথা, ‘ললিত-গীতির কলিতকল্লোল’ ইহা নহে। তাই শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে সুন্দরের আসন সর্ব্বাগ্রে এবং তাহার সঙ্গে থাকে মঙ্গল। তাই চারুশিল্পে প্রথম ও প্রধান কথাই প্রকাশ, সৌন্দর্য্যের দৃষ্টিকোণ হইতে সত্যমঙ্গলের একাত্মদর্শন। কান্তাসম্মিত কথাটির মধ্যে এই রসসম্পৃক্ত প্রকাশেরই ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। এই প্রকাশই সত্যবস্তুকে সুন্দর করে, ক্ষেমকে প্রেমে পরিণত করে—সংসারের মরুপ্রান্তরে সুরধুনীর সুধাধারা বহাইয়া দেয়।*

তবে একথাও ভুলিলে চলিবে না যে শিল্প-সৃষ্টির উপভোগের কালে বস্তু-অবস্তু, কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্নই আসে না। সে একটা পরম মুহূর্ত্ত যখন আমরা আমাদের অতীত-ভবিষ্যৎকে ভুলিয়া আনন্দঘন বর্ত্তমানকে লইয়া বিভোর থাকি; কথা সেখানে অর্থকে অতিক্রম করে—অর্থ সেখানে সুরের মাঝে হারাইয়া যায়—মানুষের সমস্ত অতীত ও অনাগত সেখানে মুছিয়া লেপিয়া একাকার হইয়া যায়। মানুষের গতি এখানে বিলম্ব-ভয়ভীত, অফিসচারী কেরাণীর অসংলগ্ন পদক্ষেপমাত্র নহে,—নির্ভীক ও নির্ম্মুক্ত জীবের জীবনানন্দে আন্দোলিত নৃত্যভঙ্গিমা। কিন্তু তবুও যতই কামনা করি ব্যাবহারিক জীবনের প্রসঙ্গ হইতে একান্ত মুক্তি মানুষের নাই;—তাপ জুড়াইয়া যায়, আবেগও শান্ত হয় এবং সেই চিরন্তন প্রশ্ন বারংবার আমাদের মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলে,—যাহা পাইলাম তাহাতে আমার বা মানব-

* ইংরাজীতে যাহাকে Poetic Justic বলা হয় সে জিনিষটি কি? সাধারণ ব্যবহার-শাস্ত্রের বিচার অথবা বিচারের নামে স্বৈরাচার তাহা নিশ্চয়ই নহে। জীবনের পরিণতি ও পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে কবির যে অলৌকিক ধারণা, অন্তলীন প্রতিভাবলে তিনি তাহার অনুকূল এমন একটি অপূর্ব্ব পরিমণ্ডল রচনা করেন যে ঘটনাসমূহ স্বভাবের নিয়মেই সেই চরম আদর্শে গিয়া মিলিত হয়।

সমাজের জীবনাদর্শ উন্নীত হইল কতটুকু ? উড়িয়া-চলা বন্ধ হইলে আবার পায়ে-হাঁটা আরম্ভ হয়—আবেগের সুরে প্রাণের আলাপ থামিয়া গেলে কাজের ভাষায় চলে নিত্যকার প্রয়োজনসাধনের পালা। হৃদয়ের ছবিকে দেখি বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ হইতে—সুতরাং সত্য-মিথ্যা, বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্ন স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে; এবং এই বিচারের দ্বারাই চারুশিল্পের আয়ু নিরূপিত হয়।

কিন্তু যখন শুনিলাম, "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্" তখন কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হয়তো ক্ষণিক জাগিল, কিন্তু প্রাণ তাহাতে সাড়া দিল না। নীরস উপদেশ মস্তিষ্ক হইতে হৃদয়ের তীর্থে যাত্রা করিয়া পথের মাঝেই পথ হারাইল! 'মোহমুদ্‌গরের' মুদ্‌গরের আঘাত জগতে কয়জন সহ্য করিতে পারিয়াছে—আর আঘাতের পরেও যে সকল ভাগ্যবান্ বাঁচিয়া আছেন কয়জন তাঁহাদের মধ্যে তাহার দ্বারা উদ্দীপিত হইয়াছেন? কাব্যের অমৃত-সঙ্গীতে চিত্তবীণায় যদি সুরতরঙ্গই না উঠিল—ভাবের রসোল্লাসে জীবন-সাগরে যদি জোয়ারই না জাগিল—জনে-জনে, মনে-মনে কবিচিত্তের দীপ্ত-মণি যদি দুঃখের অন্ধকারে অন্তহীন আলোকের উচ্ছ্বাসই না আনিল, তবে তাহার সার্থকতা কোথায়?

দেহের সহিত দেহীর, তনুর সহিত মনের, সুন্দরের সহিত সত্যের এই যে নিত্য নিবিড় সম্বন্ধ ইহাকেই কীট্‌স্ বলিয়াছেন সৌন্দর্য্য, শেলী বলিয়াছেন প্রেম, ওয়াডর্স্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন আত্মা, রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন জীবনদেবতা। সত্যকে যখন আমরা ভালবাসি তখন সে হয় সুন্দর অর্থাৎ সত্য তখন অনিরূপ্য ভাবের অবস্থা হইতে কবির হৃদয়ের ছাঁচে সুনির্দ্দিষ্ট রূপের আকারে প্রস্ফুটিত হয়। জলের যেমন নিজের কোন আকার নাই আধার-অনুসারে তাহার রূপের পরিমাণ হয়, তেমনই ভাবময় সত্যবস্তু কবির হৃদয়াধারে রূপময় অমৃতের আকারে ক্ষরিত হয়। সত্য বিশ্বজনীন; সুন্দর, কবির একান্ত আপনার হইয়াও, সকলের। এই যে প্রেম বা প্রাণ, আনন্দ বা জীবন ইহার কাজই হইল সৃষ্টি অর্থাৎ আত্মাকে বহুলরূপে, বিচিত্ররূপে প্রকাশ। ভূমার আনন্দ হইতেই তো এই অনন্ত নক্ষত্রসনাথ বিশ্বের প্রকাশ; চিন্ময়-লোকে

যিনি ধ্যানাসনে আসীন প্রেমলোকে তাঁহাকে রূপ-প্রতিমায় অধিষ্ঠিত দেখিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। অরূপের সঙ্গে প্রেম চলে না, তাই না অপরূপের সৃষ্টি! বাস্তবিক মানুষের অর্দ্ধেক ভাব এবং তাহার অবশিষ্টাংশ প্রকাশ।

দেহ ও দেহীর এই মিলনের গান গাহেন কবি। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও ঐক্যের ভিতরে বিচিত্রতার সুর-সাধনা কবির। জগতের আদি কবিতা তো অনাদি কাল হইতেই লিখিত আছে, সেই মহাকাব্যের অন্তরালে যে গোপন অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে তাহাই আবিষ্কার করেন কবি এবং তাহার ব্যঞ্জনা করেন মানুষের ভাষায়, মানুষের রূপে; শাশ্বত মানব কবি, তাঁহার বাণী যুগযুগান্তরের তমিস্রা ভেদ করিয়া আলোকের জয়গান গাহিয়া চলে—কল্পকালের আকুল আশা তাঁহার সঙ্গীতে ভাষা পাইয়া অমর হইয়া যায়।

কিন্তু কেবল ধ্বনি বা কেবল বর্ণই শিল্প নহে। চিন্ময় আকাশের ঈথর-স্রোতে ভাবের বিদ্যুৎ যখন শব্দ ও বর্ণে রূপান্তরিত হয় তখনই হয় শিল্প, তখনই হয় সঙ্গীত। কাব্য, ভাবের একটি তীক্ষ্ণ ও তীব্র অনুভূতি যাহা কোন জীব অথবা উদ্ভিদাত্মার মতই একটি রূপকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না এবং রূপসমুদ্রের অসংখ্য তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্যে নিজের ঊর্ম্মিটি জুড়িয়া দেয়। বস্তুতঃ কবির দৃষ্টিতে ভাব ও রূপ, সত্য ও সুন্দর এক বস্তু, সত্যের সুন্দরে রূপান্তর, ঠিক যেন তড়িতের শব্দে রূপান্তর; সহজে এবং স্বভাবের নিয়মেই তাহা সংঘটিত হয়। বাইবেলে একটি কথা আছে—ভগবান মানুষকে নিজের প্রতিমায় (ছায়ায়) গড়িয়াছেন; কথাটি একটু উলটাইয়া বলিলে বোধ হয় আরও সঙ্গত হইত; "মানুষ ভগবানকে নিজের রূপে গড়িয়াছে," অর্থাৎ যিনি অরূপ, প্রেমের অধিকারে মানুষ নিজের-'ছাঁদেই' তাঁহাকে রচনা করিয়াছে। তাই মধুর রসের সাধক বৈষ্ণবকবিকুল উপাস্যকে হৃদয়াসনে পরমাত্মীয়রূপে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। আশ্চর্য্য এই প্রেমের প্রতাপ; ইহা মর্ত্ত্যকে স্বর্গে পরিণত করে, স্বর্গকে ধূলিময়ী ধরণীর ক্রোড়ে টানিয়া আনে, মহান হইতেও যিনি মহান তিনি অণু হইতেও অণু হইয়া যান।

এবারে প্রকাশের কথা আর একটু বলি। বস্তুসত্তার মধ্যে যে সৌন্দর্য্য নিহিত আছে প্রকাশের সুষমায় তাহা মধুর ও নূতনতর সৌন্দর্য্যের আভাস লইয়া আসে। বস্তু-প্রতিমা ভাবের আধাররূপে প্রযুক্ত হয় বলিয়া তাহার মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য্য অভিনব শক্তি অনুভূত হয়। প্রয়োজনের জগতে, বংশ-নালিকা কেবল তৈলাধারের কার্য্যই করে, কিন্তু তাহারই রন্ধ্রমুখে সঘন চুম্বন দিলে বিবশ বংশী অপূর্ব্ব আবেশে বাজিয়া উঠে। প্রতীকের সাহায্যে অনেক সময়ে কবি এমন নিগূঢ় ভাবসৌন্দর্য্যের ব্যঞ্জনা করেন যাহা তাহার বস্তুগত সৌন্দর্য্যকে বহুগুণে অতিক্রম করিয়া যায়,—যেমন শুভ্র শতদলকে যখন দেখি জ্ঞান ও পবিত্রতার মূর্ত্ত প্রকাশরূপে তখন তাহার ভাব-গত সৌন্দর্য্য কি আমাদের প্রাণে ভাগবত সৌন্দর্য্যের ইঙ্গিত আনিয়া দেয় না? সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিই তো সেই অদৃশ্য শিল্পীর সীমাহীন আনন্দের প্রতীক; প্রতীক বলিয়াই সে সীমার মধ্যেও অসীমের ব্যঞ্জনা করে। বিশ্বরঙ্গালয়ে দর্শকের আসনে বসিয়া কবি দেখেন রহস্যময় নেপথ্য হইতে কেমন করিয়া এই সুনিপুণ অভিনেতা নানা বেশ ও নানা ভূমিকায় ক্ষণে ক্ষণে আমাদের মন ভুলাইয়া অভিনয় করিয়া যাইতেছেন।

ভাবুক লোক তো অনেক আছেন; নিসর্গশোভার আবেষ্টনে বাস করেনও অনেকে; কিন্তু তাঁহাদের আমরা কবি বলি না, কারণ তাঁহাদের মধ্যে প্রকাশ-শক্তির অভাব। এই প্রকাশের অক্ষমতা আসিয়া পড়ে অনুভূতির অসম্পূর্ণতা হইতে; ভাব যেখানে কুহেলির মত নীচের আকাশকেই আবৃত করিয়া আছে সেখানে উপর হইতে ধারাবর্ষণের আশা করা কেবল অন্যায় নয়, অসম্ভব। তাই প্রকৃতিকে নিজের চোখে দেখিয়া যে আনন্দ তাহার অপেক্ষা কবির দৃষ্টিতে দেখিয়া আনন্দ অনেক অধিক; মনে হয় যেন সেই দেখাই আমার সত্যকার দেখা, এমন করিয়া আর কখনও দেখি নাই। সমগ্র প্রকৃতিরাজ্যে এমন কোন বস্তুই নাই যাহার মধ্যে সমগ্রতার সৌন্দর্য্য নিহিত না আছে। তাই ঋষি-কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ গাহিয়াছেন—

To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears.

কাননের ক্ষুদ্রতম কুসুমও আমার প্রাণে অশ্রুর অতীত ভাবের আভাস আনিয়া দেয়। অংশের মধ্যে সমগ্রতার প্রকাশ কবি ভিন্ন আর কে দেখাইবে? সাধারণের চিত্তবৃত্তি সুপ্ত, কবি "সোনার কাঠির" 'পরশ' দিয়া তাহাকে জাগাইয়া তোলেন; তখন কবির ভাব আমার হইয়া যায়, একের আনন্দ নিখিলহৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় রসে উল্লসিত হইয়া উঠে।

কিন্তু যাহা সহজেই জ্ঞাত হওয়া যায় সহজেই তাহা জীর্ণ হইয়া যায়। পরিস্ফুট হইলেই সব কিছু সুন্দর হয় না। যাহার আদ্যন্ত সমস্তই দেখিতে পাই যাহার সবটাই অবিকল ব্যক্ত করিতে পারি তাহার অপেক্ষা যাহা সূক্ষ্ম-সুকুমার, যাহা প্রকাশের অতীত তাহাই রহস্যের মায়ায় আমাদের মুগ্ধ করে। জগতে যে মানুষকে সহজেই বোঝা হইয়া যায় চলিত কথায় তাহাকে বলা হয় "বোকা"। তাহার কোন আকর্ষণ নাই; রূপসৌষ্ঠব বর্ণ-বৈচিত্র্য কিছুই তাহাকে আমাদের কাছে প্রিয় করিতে পারে না; অপিচ যে-তন্বঙ্গীর শ্যামল শোভা ও নীলিম নয়ন রহস্যের অতলতায় অসীম ও অনবগাহ, সে অনায়াসেই আমাদের মনোহরণ করে। বিশ্ব-প্রকৃতির সবটাই যদি উপলব্ধ হইয়া যাইত তবে তাহাকে বুঝিবার জন্য আগ্রহ আদৌ থাকিত না, বহু-অধীত পুথির মতই তাহা হইত জীর্ণ ও অনাবশ্যক। সত্যকার কবির কাব্য যত বারই পড়ি তাহা কখনও পুরান হয় না, প্রত্যেক বারই তাহা অনির্ব্বাচ্য সংকেতে আমাদের নব নব আনন্দলোকে লইয়া যায়, তাহার পীযূষবর্ষণের আর বিরাম থাকে না। অনন্তের অন্তরের যে অশ্রান্ত সঙ্গীত অনাদিকাল হইতে ধ্বনিত হইতেছে তাহারই দু' একটি সুর কবি-বীণা হইতে কবে নিখিল মানবের হৃদয়ে লাগিয়া অমৃতধারায় ঝরিয়া পড়িবে আজিও জগৎ নির্নিমেষে তাহারই প্রতীক্ষায় চাহিয়া আছে।

কাব্যে ভাব ও শৈলী

আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা বলেছেন, "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" অথবা "রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্" বা ঐরকম আর কিছু। অর্থাৎ তাঁরা বল্‌তে চান যে বাইরের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে আমাদের মনে যে বিচিত্র ভাবের উদয় হয় তাকে সহৃদয় জনের উপাদেয় ও উপভোগ্য ক'রে প্রকাশ করাই সাহিত্য। এরই নাম ভাবের রসে রূপান্তর।

ভাব কেমন ক'রে রস হয়? বিভাব ও অনুভাবের মধ্য দিয়ে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী অন্যান্য ভাবের পরিপোষকতায় হয় ভাবের রসে পরিণতি। কাব্যপ্রকাশ বলেছেন—

> "কারণান্যথ কার্য্যাণি সহকারীণি যানি চ
> রত্যাদেঃ স্থায়িনো লোকে তানি চেন্নাট্যকাব্যয়োঃ।
> বিভাবা অনুভাবাশ্চ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ
> ব্যক্তঃ স তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ।"

অর্থাৎ নাটক এবং কাব্যে রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের যে কারণ, কার্য্য ও সহকারী কারণ, তাদের যথাক্রমে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী নাম দেওয়া হয় এবং এই বিভাবাদির দ্বারা প্রকাশিত যে স্থায়ি-ভাব তার নাম রস।

আমাদের বাহিরে যে জগৎ তার সঙ্গে আমরা বিচিত্র সম্বন্ধসূত্রে বাঁধা। আমাদের মনের সঙ্গে তার সংস্পর্শে রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, শম (নির্বেদ) মোটামুটি এই নয়টি এবং আরও অনেকগুলি ভাবের উদ্ভব হয়। এই নয়টি মূলভাবকে বলা হয় স্থায়ি-ভাব, শাখাভাবগুলির নাম সঞ্চারী বা ব্যভিচারী।

এই ভাবগুলি (emotion) কিন্তু লৌকিক, যেহেতু এরা আমাদের মনের বিরাগ-অনুরাগ, কামনা-বেদনার রঙে রঙীন। অর্থাৎ বহির্বিশ্বের সঙ্গে কে

স্বার্থের সম্বন্ধে আমরা জড়িত এই বিরাগ-অনুরাগের মূলে স্বার্থের সেই চিরন্তন প্রেরণা। কোন বস্তুকে আমরা ভালবাসি, কোনটিকে বা ঘৃণা করি। কেন? যে সামাজিক রীতি-নীতির আবহাওয়ায় আমরা মানুষ, বাইরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অনেকটা তারই প্রভাবে গ'ড়ে ওঠে। অর্থাৎ কোনও বস্তুর সহিত আমাদের যে প্রীতি বা অপ্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয় সামাজিক মানুষের বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষা তার জন্যে অনেকপরিমাণে দায়ী; তাই ভাল লাগা—না-লাগার আদর্শ দেশে দেশে কালে কালে ভিন্ন।

তবুও কোথায় যেন মানুষের মনের একটা অখণ্ড ঐক্য আছে। ভূগোলের সীমারেখার বাহিরে মনের সেই নিভৃত নন্দনে আনন্দের নিত্যলীলা। সেখানে জাতিতে জাতিতে ধনি-দরিদ্রে, উচ্চ-নীচে প্রভেদ নেই—সকলেই প্রেমের ফাগ অঙ্গে মেখে হোলি-খেলায় মেতে ওঠে। এই মণিমঞ্জুষার কুঞ্চিকা আছে কবির কাছে—এই রহস্যলোকের পথ দেখিয়ে দেয় কাব্য। কেমন ক'রে তা বলি।

মনে করুন, আপনার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে, আপনি শোকে একান্ত অভিভূত হয়েছেন। এক্ষেত্রে আপনার মনে শোকভাবের মূল বা আলম্বন কারণ বন্ধুর মৃত্যু অথবা বিনষ্ট বন্ধু। এইটী আলম্বন বিভাব। তারপরে তাঁর সংকার, তাঁর বিয়োগ, তাঁর স্ত্রীপুত্রাদির কাতরতা এইসব উদ্দীপক কারণে শোকভাব ক্রমশঃ তীব্র ও ঘনীভূত হয়ে উঠ্‌ল; অতএব ঐগুলি উদ্দীপন বিভাব। তারপরে আপনার মনের সঞ্চীয়মান শোক উদ্বেলিত হয়ে দৈবনিন্দা, ভূমিপতন, উচ্ছ্বাস, বিবর্ণতা, রোদন প্রভৃতি নানা বিকার ও প্রকারে পরিব্যক্ত হ'ল; এগুলি হ'ল অনুভাব। অবশেষে এর সঙ্গে নির্ব্বেদ, মোহ, স্মৃতি, গ্লানি, জড়তা প্রভৃতি বহু ব্যভিচারী বা শাখাভাব সংযুক্ত হয়ে মূল স্থায়িভাবটিকে পরিপুষ্ট ক'রে তুলল। "স্তোকৈর্বিভাবৈরুৎপন্না স্ত এব ব্যভিচারিণঃ" অর্থাৎ স্বল্প বিভাব থেকে উৎপন্ন যে ভাব তাকে বলা হয় ব্যভিচারী, মূলভাবের পরিপোষণই হ'ল এর কাজ। কারণ অলঙ্কারিকদের

মতে পরিপোষ ব্যতীত ভাবের রসত্ব হয় না—"পরিপোষ-রহিতস্য কথং রসত্বম্।" যা হোক্, এই রকমে মূল-ভাবটি ক্রমে এক অপূর্ব্ব প্রপানক রসে রূপান্তরিত হ'ল। কিন্তু এদের বিভাবঅনুভাবাদি সংজ্ঞা দিতে হ'লে এগুলিকে কাব্য-নাটকে আরোপিত করা চাই। অর্থাৎ অন্য কথায় কাব্য-সংশ্রয়ে এই লৌকিক ভাবগুলিকে অলৌকিক-বিভাবত্বে পরিণত করা চাই। বিশ্বজগতের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমাদের মনে ক্রমশঃ যে-সকল ভাব উদ্ভূত হয়, **বাসনা বা সংস্কাররূপে** সেগুলি আমাদের স্মৃতির মধ্যে স্থায়ী হয়ে যায়। যখন লৌকিক বিভাব ও অনুভাব কবির রচিত চিত্রে সমর্পিত হয়ে নিখিল অনুরাগীর হৃদয় স্পর্শ করে তখনই তারা অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হয় এবং পাঠকের প্রসুপ্ত বাসনায় আঘাত ক'রে রমণীয় ভাবের উদ্বোধন করে।

আলঙ্কারিকেরা স্পষ্টই বলেছেন যে, লৌকিক ভাবগুলি যে-পর্য্যন্ত না অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হয় সেপর্যন্ত তারা কাব্যের বিষয় হ'তে পারে না। কোন বস্তুর লৌকিক সত্তা ও ভাবসত্তা এক জিনিস নয়। শিল্পী তাঁর কল্পনা বা অন্তঃপ্রেরণার সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ নূতন জগৎ সৃষ্টি করেন,—যেখানে ভাবগুলি সকলপ্রকার-সম্বন্ধ-নিরপেক্ষ হয়ে সহজ স্বরূপে প্রকাশিত হয়।

"হেতুত্বং শোকহর্ষাদের্গতেভ্যো লোকসংশ্রয়াৎ
শোকহর্ষাদয়ো লোকে জায়ন্তাং নাম লৌকিকাঃ।
অলৌকিক-বিভাবত্বং প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ
সুখং সঞ্জায়তে তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽপীতি কা ক্ষতিঃ॥"

সেইজন্য লৌকিক জগতে শোকহর্ষাদির যে-হেতু তা আমাদের শোক এবং হর্ষই দিয়ে থাকে, কিন্তু মনের মণিকক্ষে সম্বন্ধবিরহিত অবস্থায় তারাই আমাদের অনবচ্ছিন্ন আনন্দের কারণ হয়। সাংসারিক লাভক্ষতির প্রসঙ্গ অসঙ্গতভাবে যুক্ত থাকে না ব'লে কাব্যের কল্প-কাননে দুঃখের মৃণালে সৌন্দর্য্যের শতদল ফুটে ওঠে। মনুষ্যজীবনে মৃত্যু একটি শোকাবহ বস্তু, মৃতব্যক্তির সহিত আমাদের ব্যক্তিগত অথবা সমাজগত সম্বন্ধ যতই অধিক

হয়, মৃত্যুজনিত শোকের মাত্রাও হয় ততই অধিক। কিন্তু সেই মৃত্যুঘটনাকে অবলম্বন ক'রে কবি যখন কাব্য রচনা করেন তখন তিনি এই পার্থিব শোককে কল্পরথে অপার্থিব সৌন্দর্য্যধামে নিয়ে যান, তাই করুণরসাত্মক কাব্য পড়েও আমরা দুঃখিত না হ'য়ে হই আনন্দিত। উৎকট শারীরিক যন্ত্রণার অভিব্যক্তিও যে সুন্দর ও আনন্দময় হ'তে পারে তার উদাহরণ মাইকেল এঞ্জেলোর Dawn বা "উষা" ছবিখানি। মদিরারস-বিহ্বল পাশবিকতাও যে মনোগ্রাহী হ'তে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তকবি বার্ণেসের "Jolly Beggars"। পরলোকের পথে যে চলে গেছে, সে জীবিত থাকলে ব্যক্তি ও সমাজগত কোন সুবিধা-অসুবিধা হ'ত কি-না এ মাপকাঠি দিয়ে শিল্পের বিচার করা চলে না, আর করলেও সেই অকরুণ বিচারপ্রক্রিয়া প্রতিপাদ্য করুণ রসের চেয়ে নিতান্ত কম করুণ হয়ে ওঠে না। মনে রাখতে হবে কাব্যের আনন্দও লোকোত্তর আনন্দ। লটারীতে লাখ টাকা পাওয়া গিয়েছে শুনলে কার না আনন্দ হয়? তাই ব'লে এই অভাবিত অর্থপ্রাপ্তির ব্যাপারকেও কি বলতে হবে কাব্য? না; সাংসারিক লাভলোকসানের বুদ্ধি থেকে উদ্ভূত যে আহ্লাদ তার অলৌকিকতা কোথায়? 'ধীজন্যস্য আহ্লাদস্য ন লোকোত্তরত্বম্'। প্রয়োজনে আনন্দ নেই—তাই সে অসুন্দর; অভাবের ঘরে রসদ জোগানই যে তার কাজ! প্রয়োজনের অতীত যা তাই ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে মহীয়ান —সুন্দরের মন্দিরে তাই সহৃদয়জনের আনন্দময় পরিচয়পত্র!

তবেই দেখা গেল বিভাবের সাহায্যে বাসনারূপে অবস্থিত রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব রস অথবা রসাস্বাদনের অঙ্কুর অবস্থায় উপনীত হয়। অর্থাৎ একে বলা যেতে পারে তথ্যের সত্যে রূপান্তর। কোন্ কুহক এই অসাধ্য সাধন করে? কবিপ্রেরণা বা কল্পনা। বুদ্ধির দিক থেকে বিচার-বিমর্শের সাহায্যে বহির্জগৎ (আমাদের আত্মকেন্দ্রের বাহিরে যে জগৎ) থেকে আমরা পাই সত্যের সন্ধান—অনন্ত কার্য্যকারণপরম্পরার শৃঙ্খলে বাঁধা যে সত্য তাকে আমরা লাভ করি অবিমিশ্র বিচারবুদ্ধির সহায়তায়। কিন্তু দার্শনিক বা

বৈজ্ঞানিক আজীবন সাধনা ক'রেও যে সত্য-বস্তুর সন্ধান পান না, কবি অন্তঃ-প্রেরণার বলে চকিতে প্রবুদ্ধসংবিতে সেই শাশ্বত সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই অন্তঃপ্রেরণাকে (intuition) কাণ্ট্ বলেছেন তর্কবুদ্ধির অতীত বিচারশক্তি, যা কামনাবিহীন হয়েও আনন্দ দান করে। এই আনন্দকে 'সাহিত্যদর্পণ'কার তুলনা করেছেন ব্রহ্মাস্বাদের আনন্দের সঙ্গে। অপূর্ণ প্রকৃতির মধ্যে যে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা রয়েছে—পরিচ্ছিন্ন বিশ্বলয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সঙ্গীতের যে অভ্রান্ত ইঙ্গিত রয়েছে কবি-মনে তার অনির্বচনীয় সুষমাটুকু ধরা পড়েই। বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে যা সত্য, আত্মসাধনার ক্ষেত্রে যা কল্যাণ, কবিকল্পনার দিক থেকে তাই আবার সুন্দর। তাই ইউরোপে প্লেটো ও ভারতে পুণ্যতপা ঋষিরা পুনঃপুনঃ ঘোষণা করেছেন এই সত্যশিবসুন্দরের বাণী। আনন্দময় সত্যের অপর নাম সুন্দর—হৃদয়ের কাজ আনন্দ দান ও আনন্দ গ্রহণ। কবি দেখেন হৃদয় দিয়ে—তাই কবির স্বপ্নলব্ধ সত্য হয় সুন্দর। কীট্‌স্‌ও তাঁর Grecian Urn কবিতায় অনেকটা এই ভাবেরই ইঙ্গিত করেছেন।

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কাব্যের সূত্র দিয়েছেন 'emotion recollected in tranquillity'। আবেগের প্রথম মুহূর্ত্তে যখন মনের ওপর কেবল এসে লেগেছে ভাবের একটা প্রচণ্ড সংঘাত (আলঙ্কারিকদের মতে উদ্দীপনা) তখন প্রকাশ সম্ভব নয়, কেন-না সেটা আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বে ব্যাকুলতার অবস্থা। সংবেদনার পরে যখন ঐ ভাব-সম্বন্ধে সংবিৎ জেগে ওঠে, অর্থাৎ আবেগময় অস্ফুট ভাবকোরক যখন অন্তর্লোকে সৌন্দর্য্যময় প্রফুল্ল প্রসূনে রূপায়িত হয়, বহিঃপ্রকাশের প্রসঙ্গ আসে তখনই! অন্তঃপ্রেরণাবলে কবি সুন্দরকে লাভ করেন, বহিঃপ্রকাশের কুশলতায় তাকে সহৃদয়জনের হৃদয়সংবেদ্য ক'রে তোলেন, ভাবকে রসে পরিণত করেন। নূতন মৃৎপাত্রে যে প্রচ্ছন্ন মৃদু সৌরভ আছে তা যেমন তাতে জল না ঢাললে বোঝা যায় না, সেই রকম সহৃদয় জনের হৃদয়ে রতি প্রভৃতি অব্যক্ত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে,—কাব্যপাঠ অথবা শ্রবণে মনের সেই রুদ্ধ উৎস সহসা মুক্ত হয়ে যায়—প্রাণে অপূর্ব্ব সৌরভ

তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় ভাব রসরূপ লাভ করে। কারণ, 'আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ'—ভাবের আস্বাদিত অবস্থার নামই রস—অনাস্বাদিত ভাবকে 'রস' সংজ্ঞা দেওয়া যায় না ; কিন্তু প্রকাশ আরম্ভ হয় সংবিতের অবস্থায় (conscious) এবং কবি স্মৃতি থেকে উদ্ধার ক'রে সেই আবেগময় সান্দ্র মুহূর্ত্তের অপরূপ আলেখ্যখানি আমাদের মনের সামনে ধ'রে দেন। এই যে শক্তি যার বলে কবি অন্তঃপ্রেরণা দ্বারা উপলব্ধ সত্যকে সময়ান্তরে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেন, তারই নাম দিয়েছেন কোল্‌রিজ্‌ 'গৌণ কল্পনা'।

Aesthetic experience, আলঙ্কারিকরা যাকে বলেছেন 'ভাব', যদি হয় শিল্পের প্রধান উপাদান, তবে সেই ভাবের "সাধারণীকরণ" হ'ল তার প্রাণ—'ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণীকৃতিঃ'—অর্থাৎ এক কথায় যে-পর্য্যন্ত ভাব রসে রূপায়িত বা প্রপানক অবস্থায় উপনীত না হচ্ছে সে-পর্য্যন্ত তাকে শিল্পনির্ম্মিতি বলা চলে না। কারণ ভাবের উন্মেষের পূর্ব্বে যে অনুপ্রেরণা সেটা হ'ল কবি বা শিল্পীর একান্ত নিজস্ব—তার সঙ্গে সহৃদয়-জনের সংবেদনার কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু কেবল কবি-মনের ভাব-কল্পনায় তো কাব্যের সৃষ্টি হয় না—হয় সেই কল্পনাকে আস্বাদ্যমান রূপ দেওয়াতে। অন্য কথায় রসানুষিক্ত না হ'লে কোন বাক্যই কাব্য হয় না, শব্দ রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদক না হ'লে কাব্যহিসাবে গণ্য নয়। এই যে বহিঃপ্রকাশ এর পূর্ব্বে আত্মপ্রকাশ (অনুভাব) বলেও একটা বস্তু আছে। আবেগতরঙ্গের গভীর আঘাত যখন হৃদয়-উপকূলে প্রথম এসে লাগে তখন সেই আলোড়নের (overflow) মধ্যে উপলব্ধির ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু সম্পূর্ণতার আনন্দ নেই। আমাদের মনেও কোন ভাব ঠিকমত অনুভূত হয় না, যতক্ষণ না সেই ভাবের পূর্ণমূর্ত্তিখানি আমাদের মনের পটে আঁকা হয়ে যায়—মানসপটের এই চিত্র অশরীরী—এই মূর্ত্তি, ভাবমূর্ত্তি।—

"ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জ্জিতঃ"—নাট্যশাস্ত্র

বাস্তবিক ভাববর্জ্জিত রস অথবা রসবর্জ্জিত ভাবের কল্পনা অসম্ভব। অস্ফুট আবেগের চিন্ময় প্রকাশই তো ভাব। চিন্ময় ভাবকে বাঙ্ময় রসে অভিব্যক্ত

করলে হয় কাব্য। কিন্তু পূর্ব্বসিদ্ধ বস্তুই কেবল ব্যক্ত হ'তে পারে—যেমন, প্রদীপের আলোয় আগে-হ'তে-আছে যে জিনিষ তারই প্রকাশ সম্ভব। রসও পূর্ব্বসিদ্ধ। ভাব যে কবিমনে অলৌকিকরূপে আস্বাদিত সে-বিষয়ে সন্দেহ কি?

আর এক কথা, কবির মনোভাব সকলের হয় কেমন করে? দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেম, যক্ষের বিরহ নিখিলমানবের চিত্তে স্পন্দন আনে কেন? স্থায়ি-ভাব যেখানে আছে সেখানেই বীজাঙ্কুর-ন্যায়ে রসের সম্ভাবনা ধ'রে নিতে হবে। স্থায়ী অর্থাৎ মূল ভাবগুলি বা তার কোন কোনটি, বাসনা বা সংস্কাররূপে প্রত্যেক মানুষের মনে বিরাজ করে। সেই মগ্ন-চৈতন্যের অবস্থাকে ধ্বনি, সুর বা রঙের আঘাত দিয়ে জাগিয়ে তোলাই শিল্পের কাজ (প্রকাশ)। সেইজন্য সহৃদয় জন ভিন্ন অন্য কেউ রসের আস্বাদনে সমর্থ নয়। রবীন্দ্রনাথের নানা-বয়সের নানা-ভাবের রচনা ভিন্ন ভিন্ন লোককে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আঘাত করে; রতি পর্য্যন্ত যার সীমা সে শৃঙ্গার-রসাত্মক কাব্যগুলি পড়ে আনন্দ পায়, অধ্যাত্ম-অনুভূতির দ্যোতক গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি তার অন্তরকে স্পর্শ করে না। অনেকে এমন কথাও বলে থাকেন, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার যে-বিকাশ তাঁর যৌবনের লেখা কাব্যগুলিতে দেখা গিয়েছে—গীতাঞ্জলি ও তৎপরবর্ত্তী কোন কাব্যের ভিতরই তা আর ফিরে পাওয়া গেল না। অথচ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং শান্তরস-পিপাসু পাঠকমাত্রেই ঐগুলিকেই তাঁর কাব্যগগনের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক বলে মনে করেন। তবেই দেখা যায়, সহৃদয় হ'তে হ'লে **বাসনা**পরায়ণ হওয়া চাই। আইন্‌স্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথোপকথনে এক জায়গায় জার্ম্মান মনীষী বলছেন—'ভাবের বস্তুকে ঠিকমত বিশ্লেষণ ক'রে বোঝান কঠিন। ঐ যে লাল ফুলটি আপনার টেবিলের ওপর দেখচি ওটা হয়ত আমার এবং আপনার কাছে এক বস্তু নয়।" কবি উত্তর করলেন—"হাঁ, কিন্তু তবুও আশ্চর্য্য এই যে ব্যক্তিগত রুচি বিশ্বজনীন রুচির মধ্যে অহরহই লীন হয়ে যাচ্ছে।"

কথাটা দাঁড়াল এই রকম।—লাল ফুলটি আমি দেখলাম সম্পূর্ণ আমার

দৃষ্টি দিয়ে, অর্থাৎ ফুলটি আমার মনে ব্যঞ্জনার দ্বারা যে ভাবটি জাগিয়ে তুলল অপরের মনে হয়ত ঠিক সেই ভাবটি জাগাতে পারেনি। ফুলের সংস্পর্শে এসে আমার কল্পকাননে যে ভাবকুসুম ফুটে উঠল তারই অতীন্দ্রিয় সুষমাটুকু রসজ্ঞের সামনে মনোজ্ঞরূপে ধরে দেওয়াই তো কাব্য। কিন্তু যে-ভাব আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব আবেগের পরিণতি তা সহৃদয়মাত্রেরই উপভোগ্য হয় কি কারণে? যা একান্ত ব্যক্তিগত (personal) তা-ই সর্ব্বসম্মত হয় কোন্ মায়ায়? এর উত্তরে আলঙ্কারিকেরা বলেন, "বাসনা" (দরদ) যাদের আছে, ব্যঞ্জনার দ্বারা অনুভবের শক্তিও আছে তাদের, রূপদক্ষের আলেখ্যে এই ব্যঞ্জনা থাকে প্রচুর। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার যে প্রেম, ব্যঞ্জনার দ্বারা তা আমার নিজস্ব হয়ে যায়—বিশেষ বিভাব সামান্য বিভাবে পরিণত হয়। যখন নাট্যালয়ে শকুন্তলার অভিনয় দেখি তখন আমার যদি এই প্রতীতি থাকে যে, আমি অন্যের প্রণয়ের চিত্র দেখছি তা'হলে তা থেকে আনন্দের চেয়ে লজ্জা পাওয়ার কথাই বেশী। তা'হলে ব্যঞ্জনা হ'ল চারুশিল্পের সেই অনির্বাচ্য শক্তি যা ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনাকে বিশ্বের সকাশে অনায়াসে প্রকাশ করতে পারে, যা পাঠকের মনে এই ভাব জাগাতে পারে—'পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ' —পরের অথচ ঠিক পরের নয়, আমার অথচ ঠিক আমার নয়। কোল্‌রিজ একে বলেছেন "willing suspension of disbelief"; কিন্তু কোন কিছুকে পরিহার করার প্রশ্ন ওঠে তখনই যখন সেটা পূর্ব্ব থেকেই বর্ত্তমান থাকে। আসলে অভিনয় জিনিষটাকে আমরা বিশ্বাসও করি না, অবিশ্বাসও করি না। শিল্পের ক্ষেত্রে বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্নই অবান্তর। এই ব্যঞ্জনাকেই কেউ বলেছেন, "communication" কেউ বা "contagion"। শকুন্তলার দর্শনে দুষ্মন্তের অনুরাগ পরিমিত হওয়াই সম্ভব, কিন্তু কাব্য-নাটকে আরোপিত সেই ভাব জনে জনে সঞ্চারিত হয়ে সীমাহীন অপরূপতা লাভ করে। এই কারণেই রসকে বলা হয় অলৌকিক। প্রথম উদ্দীপনার সময়ে যা থাকে একান্ত ব্যক্তিগত, ভাবপরিণতির কালে তাই হয় সম্বন্ধবিরহিত, শাশ্বত ও

অমেয়। ইউরোপীয় মনীষীরা বলেন আবেগকে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন, কামনাশূন্যরূপে কল্পনা করলে হয় ভাবের উৎপত্তি, তারই অপর নাম সৌন্দর্য্য—নিঃস্বার্থ বা নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ। যে জিনিষ কামগন্ধশূন্য (disinterested) তা সহজেই সকলের গ্রহণীয় হয়। কারও মাতা, কন্যা, বধূ নয় বলেই উর্ব্বশী বিশ্বের প্রেয়সী।

'সাহিত্য-দর্পণ'কার বলেছেন—'রস্যমানতামাত্রসারত্বাৎ প্রকাশ-শরীরাৎ অনন্য এব হি রসঃ' অর্থাৎ আস্বাদ অথবা চর্ব্বণাই সার অথবা সামাজিকজনের উপাদেয়তার কারণ হওয়াতে সংবিৎস্বরূপ থেকে জ্ঞানরূপতা-প্রাপ্ত যে রত্যাদি-ভাব তাই হ'ল রস। আনন্দচমৎকার-সংবলিত ভাব সামাজিকজনের উপাদেয় হয় বলেই তাকে বলা হয় রস। এখানে প্রকাশ-শরীরের অর্থ করা হয়েছে সংবিৎ-স্বরূপ থেকে জ্ঞানরূপ লাভ করেছে যে রতি প্রভৃতি ভাব; তা হ'লে বিশ্বনাথের মতে কাব্যের প্রকাশ একটা সজ্ঞান প্রচেষ্টা (conscious activity)। যে বিভাবাদি-কারণের কার্য্য হ'ল ভাব সেইগুলি অবচেতন মনের স্বতঃপ্রবর্ত্তিত ক্রিয়া হলেও প্রকাশের পূর্ব্বে ভাবের অবস্থায় তারা সংবিৎ অথবা চেতনার স্তরে এসে দাঁড়ায়। এই চেতনার অভাবে ভাব কিছুতেই রস্যমান অবস্থায় পৌছতে পারে না। ভাবটিকে কোন্ রূপ-মায়া দিয়ে প্রকাশ করলে, ধ্বনি-তরঙ্গের কোন্ আঘাত দিলে দরদীজনের মনের তারে সহজেই তা'র ঝঙ্কার উঠবে ঐন্দ্রজালিক কবি সে রহস্য ভাল ক'রেই জানেন। সত্যই "মূল্যহীনেরে সোনা করিবার পরশপাথর হাতে আছে" একমাত্র কবির।

কাব্যের কতটুকু ভাব আর কতটুকুই বা তা'র প্রকাশ এর আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখি এর মধ্যে প্রকাশের অংশই বেশী। কেবল প্রথম উদ্দীপনার আবেগ ছাড়া এর সবটাই প্রকাশ। রস যদি কাব্যের প্রাণ হয় তাহ'লে বলতে হয় শিল্প প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তবিক বাসনারূপে ভাব তো সকলের মনেই বিরাজিত, তাকে বাস্তবতার উৰ্দ্ধে অলৌকিকের রাজ্যেও নিয়ে যান হয়ত অনেকে, কিন্তু তাঁদের ত আমরা কবি বা শিল্পী

বলি না। কবি তিনি যাঁর ইন্দ্রজালে স্বজ্ঞালব্ধ (intuitively realized) ভাব কথাশরীর নিয়ে রসের উদ্বোধন করে। যিনি লৌকিক প্রতিরূপের সাহায্যে অলৌকিকের ব্যঞ্জনা করেন—যিনি পার্থিব বস্তুর উপর সেই অপার্থিব আলোকপাত করেন যা আকাশে-বাতাসে কোথাও নেই—আছে কেবল ধ্যানের গহনতায়, তিনিই কবি—রূপের রাজ্যে অরূপের পূজারী তিনি। প্যারসের মর্ম্মরস্তূপ যখন ফিডিয়সের মায়াদণ্ডের স্পর্শে সঞ্জীবিত ও রূপায়িত হয়ে ওঠে তখনই জন্ম হয় কাব্যের। মূক প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণ কখনই কাব্য হ'তে পারে না। এরিস্টট্‌ল্‌-এর 'imitation' আসলে অনুকরণ নয়—অনুকীর্ত্তন বা সঞ্জীবন (expression)। লৌকিককে আদর্শ সম্ভাবনার রাজ্যে নিয়ে গিয়ে শব্দচিত্র দিয়ে তার ব্যঞ্জনামূলক অভিব্যক্তি। শিল্পে বাস্তবতা অথবা অনুকৃতির স্থান নেই। কাব্যে সঙ্গীতে শিল্পে পরিচিতের প্রত্যাশা কেউ করে না। "What we are"-এর 'প্রবেশ নিষেধ' সেখানে ; কবির কল্পরথ ছাড়া সেই অপরূপের রাজ্যে আর কে নিয়ে যেতে পারে ?

এখন বিচার্য্য হচ্ছে—যা একান্ত মনের জিনিষ, যা অলৌকিক, তা লৌকিক রূপ দিয়ে ব্যঞ্জিত হয় কেমন করে ? কবি বা শিল্পী উপলব্ধ ভাবের দ্যোতক এমন একটি প্রতীক কল্পনা করেন, শব্দে-সুরে, রঙে-রেখায় যা তার বাচ্যার্থকে অতিক্রম ক'রে নিগূঢ় ব্যঙ্গার্থের ইঙ্গিত করে অর্থাৎ কবি প্রতীকের সাহায্যে এমন একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেন যা পাঠক বা দর্শকের চিত্তে আঘাত ক'রে কবিচিত্তের অনুরূপ ভাবের উদ্‌বোধ করতে পারে। এই প্রতীককে (image) ধারণ ক'রে আছে আবার ভাষা,—ছন্দোময় ধ্বনিময় অপার্থিব সুর। কবি প্রাতে উঠে দেখলেন আকাশ-বাতাস কেমন যেন উদাস, কেমন অশ্রুভারাতুর—তাঁর মনে হ'ল পাখীদের কলগানে যেন অশ্রু-বাষ্পের রেশ রয়েছে—বিশ্বসঙ্গীতের সঙ্গোপনে কোথায় যেন অনন্ত বিরহের ইঙ্গিত। বহির্বিশ্ব থেকে উদ্দীপিত হয়ে কবি চলে গেলেন কল্পনার রাজ্যে যেখানে তাঁর বিরহ নিখিল-বিরহের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গেল—সমস্ত আবেগ

শান্ত হয়ে গেল। তখন তাঁর চেষ্টা হ'ল এই বিশ্ব-বিরহের ভাবটিকে ভাষারূপ দিয়ে ভক্তের হৃদয়ে জাগিয়ে তুল্‌তে। যে পরিমাণে যে-রচনা ব্যঞ্জনাদ্বারা অতীন্দ্রিয়ের ইঙ্গিত আন্‌তে পারে—ভাষার পথে ভাষাতীতের আভাস দিতে পারে সেই পরিমাণে তা সার্থক, সুন্দর ও দরদীজনের হৃদয়-সংবাদী হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরহের আর্ত্তি এইভাবে প্রকাশ করলেন—

"কোন্ গুণী আজ উদাসপ্রাতে
মীড় দিয়েছে কোন্ বীণাতে গো,
ঘরে যে আর রইতে পারিনে।"

অথবা

"পথের হাওয়ায় কি সুর বাজে,
বাজে আমার বুকের মাঝে,
বাজে বেদনায়—আমার ঘরে থাকাই দায়।"

"ঘরে যে আর রইতে পারিনে," "আমার ঘরে থাকাই দায়"—এই কথাগুলি দিয়ে কবি আমাদের মনোলোকের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছেন, এদের যে বাচ্যার্থ তা'কে বহুগুণে অতিক্রম ক'রে একটি অন্তর্গূঢ় বেদনার ব্যঞ্জনা করেছেন। বিরহব্যাকুলতা, "ঘরে যে আর রইতে পারিনে"—এই সূক্ষ্ম সঙ্কেতটির মধ্যে যেন মূর্চ্ছিত হয়ে উঠেছে। প্রকাশের অর্থ কবিমনের সমগ্র ভাবটির প্রতিলিপি দেওয়া নয়, সহৃদয়জনের রুদ্ধ বাসনাকে বিশেষ একটি প্রতীক দিয়ে আঘাত ক'রে জাগিয়ে তোলা, 'প্রকাশে'র অর্থই হ'ল 'সঞ্চার'। শিল্পসৃষ্টির মধ্যে কবি দেন এমন কিছু যা আমরা কেবল অনুভব করতে পারি, সম্পূর্ণ অনুভূতিটি-কেই প্রকাশ করা কখনই সম্ভব নয়। কবি নিজে কোন একটি অনুবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন সত্য, কিন্তু এটিকে যথাযথভাবে রূপায়িত করা অসম্ভব। সেই জন্য শিল্পীকে ভাবপ্রকাশের জন্য প্রতীকের সাহায্য নিতেই হয়। এই প্রতীকের মধ্যবর্ত্তিতায় লেখক ও পাঠকের মনে অনির্ব্বচনীয়ের বাণীবিনিময় হয়ে যায়। কাব্যের ঈথরপথে ভাবের তড়িত্তরঙ্গ রসজ্ঞের চিত্ততটে পরিবাহিত

হয়ে রসের স্রোতে উথলে ওঠে। কবি যে চারুচিত্র পাঠকের সামনে ধরেন সেটা পূর্ব্বাপর অনুভূতির রশ্মিপাতে সমুজ্জ্বল—আবেগের অশ্রুজলে ব্যাকুল। প্রথমটা মনে হ'তে পারে ভাব ও চিত্র এরা দুটি স্বতন্ত্র বস্তু, কিন্তু আসলে তা নয়। প্রকাশের পূর্ব্বে এই অশরীরী অনুভূতিই কবির মনের পটে রূপের রেখায় আঁকা হয়ে যায়—ভাবময় রূপ রসময় অপরূপতায় মিলিয়ে যায়। কাব্য কেবল রূপ অথবা কেবল সংবেদনা, অথবা ঐ দুয়ের সমষ্টি নয়—শান্ত ও সমাহিত মনে ভাব বা আবেগের অনুধ্যান।

বিভাব ভাবের উদ্দীপক। একটী সুন্দর সুকুমার গোলাপফুল দেখলাম, তার সুষমা ও সৌরভ ইন্দ্রিয়পথে প্রবেশ ক'রে আমার সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয়কে বিবশ ক'রে দিল। এই রকম ক'রে রূপরসশব্দস্পর্শগন্ধ ইন্দ্রিয়পথে প্রবেশ ক'রে আমাদের মনের পটে রং ফিরিয়ে দেয়। তখন আমরা চোখে দেখি না, কানে শুনি না, মন দিয়ে সব দেখি শুনি। বহির্বিশ্ব থেকে যে-সব ইন্দ্রিয়ানুভূতি আমরা পাই মনের মধ্য দিয়েই তা আমাদের প্রাণকে স্পর্শ করে। কবির একটিমাত্র ইন্দ্রিয় আছে, সেটি হ'ল তাঁর মন। তাই তিনি সময়-সময় চোখ দিয়ে শোনেন এবং কান দিয়েও দেখেন। তাই তিনি আকাশকে দেখেন বীণার মতো, আর রবিরশ্মিগুলি তাঁর কাছে সেই বীণার তন্ত্রী। আঘাত যখন লাগ্‌ল, মন যখন জাগ্‌ল, বাঁধন-ভাঙার গান উঠ্‌ল বেজে, তখন পাগলা-ঝোরার সেই উপ্‌চে-পড়া দিশাহারা ধারার মধ্যে আছে কেবল আবেগ—আছে উন্মাদনা, আছে নটরাজের নৃত্যবিক্ষোভ; সেই বিক্ষোভে হয় কায়িক ও মায়িকের বিনাশ, প্রলয়ের পরে জাগে সৃষ্টি, বিরূপকে পাই আমরা অপরূপ রূপে। ছড়িয়ে-পড়া আবেগগুলি যখন শান্ত হয়ে আসে তখনই হয় ভাবের জন্ম। এই ভাবের সঙ্গে আছে 'আবিঃ' অর্থাৎ প্রকাশ (significant expression), আলঙ্কারিকের ভাষায় যাকে বলা হয় 'অনুভাব'। কবির মানস-সরে বিভাবাদির বিচিত্রদলে ফুটে উঠে এই ভাবের পদ্ম। কবি যখন বলেন আমার প্রেম একটি রক্তবর্ণ গোলাপের মত—বীণার তারে ঝঙ্কৃত একটি রাগিণীর মত

তখন এটাকে কবির খেয়াল বা পাগলের প্রলাপ ব'লে উড়িয়ে দেবার কিছুই নেই। আগেই বলেছি কবি দেখেন মন দিয়ে; বর্ণগন্ধ তাঁর মনোলোকে কেবল বর্ণগন্ধমাত্রই নয় তারা এক একটি বিশেষ ভাবের প্রতীক। প্রতীক মনে হলেই ভাবের কথা মনে আসে, ভাব জাগলে প্রতীকও দূরে থাকে না; তাই কবির হৃদয়ে ভাবে ও অনুভাবে এমন মাখামাখি, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের এমন অপূর্ব্ব সঙ্গম।

আর্ট আমাদের সমগ্র অনুভূতির চিত্র এবং সেই অনুভূতি কতকগুলি বস্তুগত ও ভাবগত উপাদানের সমষ্টি। মনে করুন, একটি লাল ফুল দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একটা ইন্দ্রিয়ানুভূতি জাগল। অবশ্য এই ইন্দ্রিয়ানুভূতিও অন্যনিরপেক্ষ নয়; লাল বল্‌তেই মনে হয় এটা শাদা, হল্‌দে, সবুজ বা অন্য কোন রঙ্‌ নয়, লালই। এই রঙ সম্বন্ধে আমাদের যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রতীক হিসাবে তার নাম দেওয়া গেল লাল। কিন্তু লালসম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গোচরতা এবং সংবেদনা তো এক জিনিষ নয়, প্রথমটি দ্বিতীয়টির সামান্য অংশমাত্র। সুতরাং 'লাল' এই সংবেদনা বা অনুভূতির প্রতীক হিসাবে কেবলমাত্র 'লাল' শব্দটি অসম্পূর্ণ।

সমগ্র অনুভূতিটির সংক্রমণের জন্যও এই প্রতীকেরই সাহায্য নিতে হবে, তাছাড়া উপায় নেই; কিন্তু কেবল কথা তো সে কাজের যোগ্য নয়। অনুভূতি ব্যতীত কোন প্রতীকেই তার অখণ্ড রূপটি পাওয়া যায় না,—সেই কারণে তার যতটুকু সঞ্চারযোগ্য নয় ততটুকুর সঙ্কেত করা চলে মাত্র এবং সেই জন্য কথা ছাড়াও ছন্দ এবং সুরের, রেখা ও রঙের আশ্রয় নিতে হয়। কারণ মানুষের মনের উপর এদের একটা অতীন্দ্রিয় প্রভাব আছে। কাব্যের মধ্যে যে-সকল ছন্দ নিরূপিত হয়েছে তার কোনটি গম্ভীর, কোনটি বা চটুল সুরের দ্যোতক। সেই জন্যই আমরা মনে করি নির্ব্বাসিত যক্ষের রসঘন বিরহের ভাবটি মন্দাক্রান্তার মধ্যে যেমন সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হয়েছে অন্য কোন ছন্দেই তেমন হতে পারে না। মানুষের মনোভাবের কোনটাই বেশ সরল

বা অমিশ্র নয়, এবং সেই জন্যই সহজে সঞ্চারযোগ্যও নয়, তাকে ব্যঞ্জনার দ্বারা ইঙ্গিত করতে হয়। শিল্পীর রসরচনায় আমরা যে ব্যঞ্জনা পাই, তা আমাদের মনের তারে অপরূপ রসমূর্চ্ছনা জাগিয়ে দেয়—আমাদের আত্মাকে সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত ক'রে তোলে। যা পেয়েছি তাকে ঠিকমত পাওয়া হয়নি, যা দেখেছি তাকে ঠিকমত দেখা হয়নি, এটা আমাদের স্বতঃই মনে হয়। তাই চারুচিত্রের মধ্যে আমরা অবাক্ বিস্ময়ে দেখি তাকে যা আমাদের মনকে আড়াল ক'রে চোখের দেখা দিয়েই এতকাল ভুলিয়ে রেখেছিল। অপ্রত্যাশিতের সাথে এই যে সাক্ষাৎ—মনের নেপথ্যে অভাবিতের সাথে এই যে রহস্যময় পরম পরিচয় এই তো সৌন্দর্য্য; এর মধ্যে 'কেন' 'কিন্তু' নেই,—এ মূক বিস্ময়ের আত্মবিস্মৃত আনন্দ। শিল্পশৈলী দূতী নয়, পরিচিতের কাছে পরিচিতের সংবাদ বয়ে বেড়ান এর কাজ নয়—জানা হতে অজানার পথে এর নিত্য অভিসার। অজানার সাথে এই মিলনের দৌত্য যে-রচনা যে পরিমাণে করতে পারে শিল্প-হিসাবে সেই রচনা তত সার্থক।

আলঙ্কারিকেরা কাব্যের এই ভাববহন-শক্তিরই নাম দিয়েছেন ব্যঞ্জনা।

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎ-প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু।।

মহাকবিগণের রচনায় বাচ্যার্থের অতিরিক্ত যে প্রতীয়মান অথবা ব্যঙ্গ্যার্থ আছে সেটা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। সুন্দরীর দেহে যেমন হস্তপদাদি অবয়বের অতিরিক্ত একটি অপার্থিব লাবণ্য লীলায়িত হয়, এই ব্যঙ্গ্যার্থও তেমনি তার স্পষ্টার্থকে অতিক্রম ক'রে প্রকাশিত হয়।

শম্বুকবধের পরে অযোধ্যায় ফিরবার পথে শ্রীরামচন্দ্র পূর্ব্বদৃষ্ট দণ্ডকারণ্য দেখে ব'লে উঠলেন—

"এতে ত এব গিরয়ো বিরুবন্ময়ূরা
স্তান্যেব মত্তহরিণানি বনস্থলানি।

আমঞ্জুবঞ্জুললতানি চ তান্যমূনি
নীরন্ধ্রনীলনিচুলানি সরিত্তটানি ॥—উত্তররামচরিত

এই ময়ূরের কেকাধ্বনি-মুখরিত পর্ব্বত, এই মত্তহরিণসুশোভিত বনস্থলী আর ঐ নিবিড়-নীল বেতস-কম্পিত নদীতট। অভিরাম বনপ্রকৃতির এ এক মনোহর বর্ণনা; কিন্তু কেবল বর্ণনার মনোহারিত্বই এর রমণীয়তার একমাত্র কারণ নয়, কবি এই নিসর্গচিত্রের ভিতর দিয়ে এক গভীর করুণার উদ্দীপন করেছেন। এই দৃশ্য দেখে রামচন্দ্রের পূর্ব্বস্মৃতি জেগে উঠেছে—সেই সুখের দিনের কথা মনে পড়েছে যেদিন এই বনভূমিতেই তিনি জনকনন্দিনীর সঙ্গে প্রেমের নন্দন রচনা করেছিলেন। হায়! সেই জীবনাধিকা দেবীপ্রতিমা আজ কোথায়? বাচ্যের অতিরিক্ত এই ধ্বনিটুকু আছে বলেই এই শ্লোকের অপরূপতা!

শিল্পের প্রকাশ মনের একটা সচেতন ক্রিয়া। বস্তুর সঙ্গে সংস্পর্শে ঐন্দ্রিয়জ্ঞান, তার থেকে সংবেদনা এবং কল্পনা-ক্ষেত্রে তার শমতা। এরই নাম অন্তঃপ্রকাশ (inner expression)। এর পরে বহিঃপ্রকাশ, যার বিদেশীয় অভিধা হ'ল technique—দেশীয় নাম রস, অথবা ভাবের আস্বাদ্যমান রূপ। এই রসের উপর খুব জোর দিয়েছেন ভারতীয় রসজ্ঞেরা; তাঁরা স্পষ্টই বলেছেন যে রসসম্পৃক্ত না হ'লে কোন বাক্যই কাব্য হবে না, কেননা নিত্যনৈমিত্তিককে নিয়ে হ'ল বাক্যের কারবার—'fact' বা ঘটনার মানুষের দেওয়া প্রয়োগসিদ্ধ প্রতীক (empirical symbol)। কিন্তু কাব্যের জগৎ—অপরূপ জগৎ, বস্তু-জগতের পূর্ণাঙ্গ প্রতিলিপি নয়; অলোকের মণিকার হলেন কবি; তাঁর অতীন্দ্রিয় লোককে যা ব্যঞ্জিত করে তাই হ'ল রস। Technique বা রস কেবল-রূপ অথবা কেবল-ভাব নয়,—ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্তের অঙ্কুর—দূর দিগ্‌বলয়ে পরিচিত জগতের সাথে কল্পলোকের অপ্রত্যাশিত মিলন। এই মিলন ঘটান শিল্পী,—ধ্বনির তরঙ্গে, ছন্দের হিল্লোলে, বর্ণচ্ছটায় অপরূপ আলিম্পনে। অতীন্দ্রিয় ভাবের সঙ্কেতহিসাবে সব যুগেই ভাস্কর

এবং চিত্রশিল্পীদের মধ্যে কেউ কেউ মানুষের মূর্ত্তিকে বিচিত্ররূপে পরিবর্ত্তিত করেছেন। তাঁরা বলেন বস্তুকে অবিকৃত রেখে বস্তুব্যঞ্জিত অতীন্দ্রিয় সত্তাকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, যেহেতু পরিচিত মূর্ত্তির সঙ্গে পরিচিত ভাবেরই সংযোগ। রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত মূর্ত্তিগুলি এক-একটি অধ্যাত্মভাবের দ্যোতক; সম্ভবতঃ তিনি মনে করেন অবিকৃত মূর্ত্তি সূক্ষ্ম ভাবরূপকে প্রকাশ করতে সমর্থ নয়। এই প্রসঙ্গে মিশরের কারুমূর্ত্তিগুলির,—প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ অজন্তা ও ইলোরার মূর্ত্তিগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা জানি হিন্দুরা দেবদেবীর যে-সকল মূর্ত্তি কল্পনা করেন সেগুলি হুবহু মানুষের মত নয়। তাঁদের ধারণা মানসীর মানুষী-রূপ দিলে তাঁর দেবভাব ক্ষুণ্ণ হয়, প্রতীকপূজা পুতুলপূজায় পরিণত হয়! কিন্তু যাঁরা বস্তুসত্তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে বিষয়ের অতীত ভাবের দ্যোতনা করেন তাঁরা বস্তুর আধ্যাত্মিক মূল্যকে স্বীকার করেন এবং সেইজন্যই তাঁদের শিল্পলিপি সমৃদ্ধতর। এরূপ ব্যঞ্জনা যে অসম্ভব নয় তা বড় বড় রূপদক্ষের শিল্প দেখলেই বোঝা যায়; দৃষ্টান্ত, "ভিনস্ অভ্ মিলো" অথবা "মোনালিসা"। আর কবি বা শিল্পীর মনেও তো এই প্রাকৃত জগৎই অপ্রাকৃত লোকের বাণী বহন করে আনে, তবে প্রাকৃত প্রতীকের সাহায্যে অপ্রাকৃতের দ্যোতনাই বা অসম্ভব হবে কেন?

এই প্রতীক-কল্পনার বৈশিষ্ট্যেই কাব্যও হয়ে পড়ে mystic। যে-কাব্য যে-পরিমাণে বস্তুনিরপেক্ষ ভাবসত্তাকে উপলব্ধি ক'রে বস্তু থেকে পৃথক কোন প্রতীকের সাহায্যে সেই ভাবকে প্রকাশ করার জন্য চেষ্টিত হয়, সেই কাব্য সেই পরিমাণে দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়ে। এই যে 'technique of symbolism', এটা তত বেশী দুরবগাহ হয়—প্রয়োগসিদ্ধ না হ'য়ে এটা যত বেশী স্বেচ্ছানুমত হয়। কতকগুলি ভাবের সঙ্গে বিশেষ কতকগুলি প্রতীকের সংযোগ আছে অর্থাৎ দেখা গিয়েছে সেই সেই বস্তুর-প্রসঙ্গে সেই সেই ভাবের কথা লোকের মনে স্বতঃই উদিত হয়; সুতরাং এই প্রয়োগসিদ্ধ প্রতীকগুলি ব্যবহার করলে পাঠকের বা দ্রষ্টার বুঝবার অসুবিধা হয় কম; কিন্তু symbol-টি যদি শিল্পীর সম্পূর্ণ মনগড়া হয়, তবে তার ব্যঞ্জনা গ্রহণ করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব হয় না। যেমন

'সাদা' এই রঙটার সঙ্গে সরলতা এবং পবিত্রতার সংযোগ প্রত্যেক মানুষের মনে আছে ;—যখনই একটি স্বচ্ছ-সুন্দর শ্বেত-শতদলের চিত্র দেখি বা তার বর্ণনা কাব্যে পাঠ করি তখনই আমাদের মনে নির্ম্মলতার ও পবিত্রতার ভাব উদিত হয়। আকাশে পুঞ্জিত মেঘের উপর রক্তরবির বর্ণচ্ছটাকে মানবমনের অনুরাগের রক্তরাগ হিসাবেই চিরদিন কবিরা দেখে এসেছেন। কিন্তু এই রকম দৃশ্য দেখলে শিল্পী টার্ণারের মনে মৃত্যু ও বিনাশের ভাবই জেগে উঠ্‌ত—নীলাকাশের রক্তরাগের ঐ যে তরঙ্গ ও-যেন আমাদের মর্ম্মকোষ থেকে উচ্ছ্রিত রুধিরধারা ; তাই তিনি "কার্থেজের পতন" চিত্রে ধ্বংসের প্রতীক হিসাবে রক্তাকাশের পরিকল্পনা করেছেন। রহস্যবাদী (mystic) কবিরা তাঁদের রসরচনায় প্রায়ই সেই সমস্ত উপমাদি প্রয়োগ করেন যা তাঁদের বিশেষ মানসিক অবস্থার ফল এবং যার সঙ্গে সাধারণ-মনের পরিচয় অতি সামান্য। রহস্যবাদ আসলে প্রকাশ-শৈলীর বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কেবলমাত্র প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যে রসের কত তারতম্য হয় তা বেশ অনুভব করা যায় যখন আমরা তন্ময় হয়ে কীর্ত্তন-গান শুনি। সাধারণ রাগরাগিণীই কীর্ত্তনের ঢঙে রূপায়িত হ'য়ে অপূর্ব্ব মাধুরী-ধারায় আমাদের চিত্তকে অভিষিক্ত করে। এই symbol-কে বেশী প্রয়োগসিদ্ধ করতে গিয়ে আবার শিল্পশৈলী সময় সময় অত্যন্ত কৃত্রিম হয়ে পড়ে। কবি তখন নিজের ছন্দে কথা ক'ন না, নিজের সুরে গান করেন না, কতকগুলি সনাতন মামুলি উপমার খোলস চাপিয়ে ভাববস্তুকে হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়ান 'রণপা'র উপরে। ভাব সেখানে কল্পনার আকাশে মুক্তপক্ষে ওড়ে না, একহাত উঁচু খড়মের ভারে প্রতি পদেই খুঁড়িয়ে চলে। সূর্য্য অস্ত গেলে কমলের মুখ মলিন হ'ল, চাঁদের জন্য চকোর কেঁদে কেঁদে আকুল হ'ল, নীল সরোবরে কৌমুদীর প্রভায় কুমুদিনীর মুখ হ'ল উজ্জ্বল। হ'ল সবই, কিন্তু পাঠকের মনে তার কোন ক্রিয়া হ'ল না। প্রেমিক-প্রেমিকার ধ্যানতন্ময়তা ও আগ্রহের ভাব কি এতে করে আমাদের মনে একটুও বেশী মুদ্রিত হ'ল ? কিন্তু বিদ্যাপতি (কবি বল্লভ ?) যখন বল্‌লেন,—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

কিংবা কবি বার্ণসের বীণায় যখন বেজে উঠ্‌ল,—

"And I will luve thee still, my dear,
Till all the seas gang dry"—

তখন বুঝলাম প্রেমিক-হৃদয়ের সেই অসাধারণ আকুতি। সে প্রেম কি অসীম যা প্রিয়তমকে জন্মজন্মান্তর ধ'রে বুকে রেখেও তৃপ্ত হয় না—সমস্ত সাগর-বারি নিঃশেষ হয়ে গেলেও যার পিপাসার নিবৃত্তি হয় না!

কাব্যশিল্পের সৌন্দর্য্য অখণ্ড সমগ্রতার সৌন্দর্য্য। কাব্যে ঘটনা এক কাল থেকে আর এক কালে চলে যাচ্ছে—চিত্রে স্থাপত্যে 'দেশে'র প্রসার আমাদের দৃষ্টিকে ব্যাহত করবার চেষ্টা করছে; কিন্তু আমরা যদি খুঁটিনাটির প্রতি পৃথক্ মনোযোগ দিই তবে শিল্প-দৃষ্টি ক্ষুণ্ন হবে, আমরা ব্যাপকতাকে হারাব। এই যে খণ্ডকে অখণ্ডরূপে দেখা, অংশকে পূর্ণরূপে অনুভব করা আমাদের দেশে এর দার্শনিক নাম 'সমূহালম্বন' (synoptic vision)। চোখ পৃথক পৃথক প্রত্যেক পদার্থের উপর পড়ছে বটে কিন্তু প্রতীতি হচ্ছে একটি, অক্ষর ভিন্ন ভিন্ন আছে বটে, দেখছি শব্দ। সেই রকম ভাব (ভাবোপলব্ধির প্রত্যেক ক্রিয়া) এবং রূপ দুটি পৃথক্ বস্তু হ'লেও আমরা সমূহালম্বন-জ্ঞানে তাদের সম্মিলিত রসরূপে প্রতিভাত দেখি।

প্রত্যেক চারুশিল্পের উদ্দেশ্য হ'ল সহৃদয়জনের মনে একটা প্রভাব উৎপন্ন করা—নিজের মনে যে ভাবটি উৎপন্ন হয়েছিল ঠিক সেই ভাবটিকেই জাগিয়ে তোলা, কিন্তু অন্য মাধ্যমের সহায়তায়; যেমন বেটোফেনের "মুন্ লাইট্ সোনাটা"—সুরের ধ্বনি দিয়ে জ্যোৎস্নানিশীথিনীর মায়াটিকে শরীরিণী ক'রে তোলা। ডিকুইন্সি একে বলেছেন "idem in alio"। প্রত্যেক শিল্পরচনাই কল্প-বস্তুহিসাবে নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র জগৎ—এই জগতের বাইরে আর অন্য কিছুই নেই। সুতরাং এখানে বাইরের সঙ্গে মিল খুঁজতে যাওয়া,

কেবল নিষ্ফল নয়, নিতান্ত অসঙ্গত ; কারণ কোন বিষয়-সম্বন্ধে কল্পনা করার অর্থই হ'ল তাকে বস্তুজগৎ থেকে পৃথক্ ক'রে এক স্বতন্ত্র রাজ্যে নিয়ে যাওয়া যেখানে সব জিনিষেরই গতি সেই একের (monad) দিকে,—সব ধারারই অভিসার এক মুক্তিসঙ্গমে। অমরা বাইরের জগতে পাই বিক্ষেপ ও বিচ্ছিন্নতা —ঐন্দ্রিয়জ্ঞানের মূলেই রয়েছে এই পার্থক্য-বোধ। এটা সাদা অর্থাৎ কাল বা লাল বা অন্য কোন রঙ্ নয়। "এটা এ নয়" অথবা "এটা অপরটা থেকে পৃথক্,"—বস্তুজগৎকে দেখবার এই হ'ল চিরন্তন রীতি। শিল্পলোকে সব ভাবকেই,—কারণ সেখানে বস্তু নেই, আছে শুধু বস্তুসম্বন্ধে আমাদের অনুভব— আমরা দেখি এক মহাভাবের প্রকাশরূপে ; তাই সেখানে আছে কেবল সংহতি ও সুষমা, সৌন্দর্য্য ও শান্তি—রূপে-রসে গন্ধে-গানে তাই সেখানে এমন মধুর গলাগলি। "Alio," অর্থাৎ রূপকের সাহায্য নেওয়া অর্থাৎ সুর দিয়ে রঙ অথবা গন্ধ দিয়ে গানকে জাগিয়ে দেওয়ার মানেই হ'ল বিশ্বসৃষ্টির সেই অন্তরতম সঙ্গতিরই ইঙ্গিত করা।

বিখ্যাত ইহুদী মনীষী স্পিনোজা বলেছেন, "Omnis existentia est perfectio," সত্তামাত্রেই সম্পূর্ণ, অথবা যা চিরন্তন তাই সুন্দর। শিল্পের দৃষ্টিতে সকল সত্তাই এক অনাদি সত্যের প্রকাশরূপে প্রতিভাত হয়। শিল্পের আলোকলোকে বিচ্ছিন্নতা ব'লে কিছু নেই, আছে সমীকরণ—ভেদবুদ্ধি নেই, আছে প্রেমের অঞ্জন। যুগে যুগে চারুকলায় দেশকালের অতীত সেই মহাসত্য মূর্ত্ত হয়ে এসেছে, রূপরসশব্দবর্ণগন্ধের পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে কালে কালে কবিকুল অনঘ উপচারে ও অনিন্দ্য ভঙ্গিতে সুন্দরের বন্দনা করে এসেছেন। সেই অনবদ্য বন্দনা-গীতে নিখিলমানবের জীবন নন্দিত।

———

কথা সাহিত্যের কথা

কালেকালে সাহিত্যের কারুরূপের পার্থক্য ঘটিলেও একথা অবিসংবাদিত যে তাহার একটি অখণ্ড অপরিবর্ত্তনীয় স্বরূপ আছে। মানবমনের যে প্রাথমিক হৃদয়বৃত্তির দ্যোতনা সাহিত্য, বিভিন্ন যুগের সাহিত্যিকের কারুকলায় তাহা বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইলেও তাহার মূলে একটি শাশ্বত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত আছে। ক্রৌঞ্চীর বিরহ-দুঃখে আদিকবি বাল্মীকির চিত্ত-উৎসে যে অনির্ব্বচনীয় কারুণ্য উচ্ছ্রিত হইয়াছিল, সেই অপার্থিব বেদনার গানই আজও রস-সাহিত্যের উপজীব্য হইয়া রহিয়াছে। যুগধর্ম্মের প্রভাবে প্রকাশশৈলীর পরিবর্ত্তন অবশ্য-ম্ভাবী; কিন্তু সাহিত্যবস্তুর প্রাণরস যদি সত্যের মধ্যেই নিহিত থাকে, তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে সাহিত্যের রস-রূপের বিকার নাই। উহা স্থির ও নিত্য।

বাহিরের বস্তুপুঞ্জের সংস্পর্শে সাহিত্যের বহীরূপের বহুরূপতা ঘটে। বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে কারুকলার প্রকাশের প্রকারভেদ হয়। কিন্তু যে মৌলিক রসের অভিব্যঞ্জনা সাহিত্য—তাহা যুগ-ধর্ম্মের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া ধ্রুবরূপে বিরাজিত থাকে। রসের উৎসভূমি তো মানুষের মন; সেই মন অথবা আরও সূক্ষ্মরূপে আত্মা, সৃষ্টির সত্যস্বরূপকে উপলব্ধি করিবার জন্য চিরদিনই উৎকন্ঠিত। উপনিষদের ঋষি আত্মদৃষ্টিবলে সেই সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। ইংরাজ কবি ব্লেক এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সেই একই সত্যের উপলব্ধির জন্য আজীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন। স্থান-কালের কি বিপুল ব্যবধান, অথচ আসল বস্তুটির কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! যখন ব্লেকের—

"To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower,

Hold infinity in the palm of your hand

And Eternity in an hour."

পাঠ করি, তখন আমাদের মন কি "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্—" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের উদাত্ত ধ্বনিতে স্পন্দিত হইয়া উঠে না? সুতরাং দেখা যায়, সাহিত্যের জীবনাধার সত্য ব্যতীত কিছুই নহে।

সাহিত্যে বাস্তববাদ, বিস্ময়বাদ, আদর্শবাদ ইত্যাদি বহু 'বাদে'র কথা শুনিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদের লইয়া বাদানুবাদেরও অন্ত নাই। কিন্তু বাস্তবিক ইহারা কি সাহিত্যের মৌলিক অনৈক্যের ইঙ্গিত করে? বাস্তববাদ ও বিস্ময়-বাদের মধ্যে কি সত্যকার কোন বিরোধ আছে? কখনই না। আধারভেদে একই সত্য-বস্তুর আকারভেদ হয় মাত্র। জল যেমন যে-পাত্রে রাখা যায় তাহারই আকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ নীরাকার সত্যবস্তু সমাজ-জীবনের নিজস্ব ছাঁচে গড়িয়া উঠে। সমগ্র পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে আজ বাস্তববাদের প্রভাব। বিষয়াতিরিক্ত কল্পপদার্থের কারবার করেন যে সকল ভাবুক শিল্পী, প্রতীচ্যের সারস্বত সভায় তাঁহাদের "প্রবেশ নিষেধ"; যে-গুণের জন্য একযুগে ইঁহারা নন্দিত হইয়াছিলেন, তাহারই জন্য আজ ইঁহারা নিন্দিত। এই যে দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা ইহার কারণ পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তন। সমাজ ও রাষ্ট্র-নৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য লাভ করিবার জন্য সমগ্র য়ুরোপ আজ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্বার্থসংরক্ষণের এই দুর্নিবার আগ্রহ সমগ্র জাতিকে আত্মকেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছে। তাই রুশীয় সাহিত্যে 'গোর্কি'র 'মাদার্' এর মধ্যে পাই ধনিকের সহিত শ্রমিকের বিরোধ, রাজশক্তির প্রতি গণমনের মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না, যে-"বাদীই" হউন, গ্রন্থকার যদি সত্যকার শিল্পী হন, তবে তাঁহার চিত্রিত আলেখ্যের মধ্যে অলক্ষ্যে তাঁহার গভীর অনুভূতির ছাপ পড়িবেই। ক্ষণিক ও ভঙ্গুর যাহা, দেশকালের মধ্যে সীমিত যাহা, তাহারই মধ্যে নিত্যকালের হৃদয়ের সুরটি বিনাকাজেই বাজিয়া উঠিবে। তাই 'মাদার্' এর মধ্যে একদিকে যেমন পাই জীবনব্যাপী একটি বিপ্লব ও

দ্বন্দ্বের চিত্র, অপরদিকে পাই নিত্যকালের চির-ঈপ্সিত সেই মা'টিকে, যিনি তাঁহার চিত্তের সঞ্চিত সমস্ত মধু নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া মাটিকে করেন খাঁটি সোনা। ফল কথা, শুধু টিঁকিয়া থাকিবার প্রশ্নটাই যেখানে সকলের সেরা প্রশ্ন, সেখানে নির্লিপ্ত রসসৃষ্টির অবকাশ অল্প; তথাপি রূপদক্ষ যদি নিখিলের মর্ম্মরক্তে তাঁহার লেখনী রঞ্জিত করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার রচিত চিত্রে মানবমনের অক্ষয়-রূপটি কিছু-না-কিছু ধরা পড়িবেই। সাহিত্যে যদি কোন 'বাদে'র অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয়, তবে তাহা একমাত্র সত্য বা রসবাদ, অন্য কোন উপাধির স্থান সাহিত্যে নাই।

বাস্তবিক, 'বাস্তববাদ' কাহাকে বলে? চোখে যাহা দেখিতেছি, ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা গ্রহণ করিতেছি, তাহাকে অবিকল সেইরূপই অঙ্কিত করার নাম বাস্তববাদ; এ যেন পাশ্চাত্ত্যদর্শনের 'positivism' বা প্রত্যক্ষবাদেরই নামান্তর। ইহা একদিকে ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, অপর পক্ষে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহকেই চরম সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া তাহাদেরই আলেখ্য-অঙ্কনে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু যে-কোন যুগেই হউক না, প্রথম শ্রেণীর রূপকার বলিয়া যাঁহারা কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনও কি এমন আছেন, যিনি জীবনের পারম্পর্য্যবিহীন ঘটনাবলীর আলোক-চিত্র তুলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, যাঁহার রচিত আলেখ্যে কল্পনার বর্ণসম্পাত বিন্দুমাত্র হয় নাই? আধুনিক কালের যে সকল কথাশিল্পী চরম বস্তুপন্থী বলিয়া বিবেচিত, তাঁহাদের মধ্যে 'হেনরিক্ ইবসেনের' নাম একেবারে পুরোভাগে। তাঁহার রচিত নাটকগুলির আলোচনা করিলে আমরা সহজেই দেখিতে পাই, কি প্রগাঢ় ও বিচিত্র বর্ণরাগে তদীয় চিত্রের পটভূমি রঞ্জিত।

সাধারণ ভাবে কল্পনা বলিতে আমরা বুঝি আশ্চর্য্যজনক অথবা চমকপ্রদ কোন চিন্তা। কিন্তু কল্পনার শোভন প্রকাশ অনৈসর্গিককে স্বাভাবিকের আকারে প্রতীয়মান করায় নহে, অথবা যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, সম্ভাব্যরূপে তাহাকে প্রকাশ করায় মধ্যেও নহে। কল্পনা মানবমনের সেই অনির্ব্বাচ্য

শক্তি, যাহার প্রভাবে শিল্পী তাঁহার হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় অরূপ ভাবকে অপরূপ রূপ-প্রতিমায় আরোপ করেন। আমাদের প্রতিদিনের যে সাধারণ অভিজ্ঞতা তাহার বিপরীত চিন্তার নাম কল্পনা নহে। প্রত্যুত, এই জীবনেরই অনুরূপ আর একটি জীবনের সৃষ্টি করেন শিল্পী; পার্থক্য এইটুকু যে সেই কল্পলোকের অধিবাসিগণ সেই অচিন দেশের নূতন নিয়মই মানিয়া চলেন, স্মৃতিসংহিতার ধার তাঁহারা ধারেন অতি অল্পই। তাই বস্তুজগতে যাহাকে পাপ অথবা দুঃখ মনে করিয়া আমরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি, শিল্পীর সৃষ্ট জগতে হয়তো তাহা ততখানি আশঙ্কার কারণ না হইতেও পারে। কবির নিয়মে চলে কাব্য, সংসারের বাঁধা-ধরা নিয়ম সেখানে খাটে না।

কল্পনার একটা প্রধান দিক বৈষম্যকে পরিহার করিয়া সৃষ্টির অন্তর্লীন ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করা, বহুর মধ্যে সেই একের গান গাহিয়া চলা। সেক্সপীয়রের বিয়োগান্ত অনেক নাটকেই, বিশেষতঃ 'লিয়র' নাটকে, দুইটি ব্যভিচারী রসের সমাবেশ ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। প্রথমতঃ আমরা মনেই করিতে পারি না সূচনাভাগের লঘু, চটুল গতি উত্তরকাণ্ডের প্রকাণ্ড ট্র্যাজেডিতে পরিণত হইতে পারে। অথচ হইয়াছে তাহাই এবং অতি অনায়াসে।

কোন কোন লোকের বুদ্ধি সমগ্রকে পরিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখে। যখন যেটি চোখের সামনে আসিয়া পড়ে, তাহারই আলোচনা আরম্ভ হয়, তন্ন-তন্ন করিয়া সেই সম্বন্ধে খুঁটিনাটি তথ্য-সংগ্রহের চেষ্টা চলিতে থাকে। এরূপ বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধি শিল্পীর নহে। তাঁহার কার্য্য ক্ষুদ্র ও পরিচ্ছিন্ন জীবনকে এক পরিপূর্ণ অখণ্ড জীবনের অংশরূপে উপলব্ধি করা, সৃষ্টির বিরাট পটভূমির উপরে জীবনকে সংহত, সুন্দর ও নবীন করিয়া গড়িয়া তোলা; যে ক্ষুদ্র অনাদৃত ফুলগুলি পথের দুধারে বনভূমিকে অকারণ আকুল করিয়া ফুটিয়া আছে, নিপুণ করে তাহাদের চয়ন করিয়া মালাকারে গ্রন্থন করা। তাজমহলের নির্ম্মাণের বহু পূর্ব্বেই শিল্পীর চিত্তপটে ইহার মনোময় রূপটি অক্ষয় রেখায় অঙ্কিত হইয়া

গিয়াছে। ইহারই আলঙ্কারিক নাম 'অলৌকিক বিভাব'। এক কথায় যে প্রতিভা থাকিলে ভাবুকের মনে কোন অনুভূতি প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বে একেবারে রূপের আকারে ফুটিয়া উঠে, তাহারই নাম কল্পনা বা অলৌকিক বিভাব।

অলঙ্কারিকেরা স্পষ্টই বলিয়াছেন, লৌকিক ভাবগুলি যে পর্য্যন্ত না অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা কাব্যের (সাহিত্যের) বিষয় হইতে পারে না। লৌকিক ও ভাবসত্তা এক বস্তু নহে। কান দিয়া শোনা ও মন দিয়া শোনার মধ্যে পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। সাধারণ অবস্থায় আমরা পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকেই অভ্রান্ত বলিয়া মনে করি, কিন্তু চোখের ছায়াপটের উপর বাহিরের জগতের যে স্থূল ছবি ফুটিয়া উঠে, তাহা যখন আরও তলাইয়া গিয়া মনের নিভৃত নেপথ্যে উপনীত হয়, তখন সে তাহার বাহিরের সমস্ত খোলস খুলিয়া, লইয়া আসে তাহার সরল, সহজ রূপটি। তাই জীবনের দুঃখ-বেদনার মর্ম্মন্তুদ কাহিনীও সঙ্গীতে রূপায়িত হইয়া আমাদের চিত্তবীণায় আনন্দ-রসধারায় ক্ষরিত হয়। লৌকিক লাভ-ক্ষতির মানদণ্ডে এ আনন্দের পরিমাপ হয় না। ইহা লোকোত্তর। প্রয়োজনের অতীত যাহা, তাহাই ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে মহীয়ান, মুক্তির আনন্দে উদ্বেল।

ফল কথা, আমার বক্তব্য কি কাব্যে, কি নাটক-উপন্যাসে খাঁটি 'realism' বা বাস্তবতা বলিয়া কিছুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কল্পনার কমনীয় কিরণে যখন জগৎকে দেখি, তখন তাহার অপরিচিত নূতন রূপ দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া যায়। মনে হয়, এত দিন সংসারকে যে চোখে দেখিয়াছিলাম, যেমন করিয়া তাহাকে বুঝিয়াছিলাম, তাহার সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদকে যে রূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম ইহা ত সেরূপ নহে, এমনটি আর কখনও দেখি নাই। নিখিলের মর্ম্মকোষে যে এত সুধা সঞ্চিত ছিল, তাহা কে জানিত! সত্যই নিছক 'ফোটোগ্রাফি' অথবা 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্' কখনই চারুকলার অঙ্গীভূত হইতে পারে না। হিম-গিরির ভীমকান্ত রূপ দেখিয়া প্রাণে যে ভাবের তরঙ্গ

ফুলিয়া উঠে, আলোকযন্ত্র কি সেই গহনতার কণামাত্র আভাসও দিতে পারে? সংস্থান ও আয়তনের দিক হইতে হয়তো আলোকচিত্রটি হয় নিখুঁত কিন্তু ভাব-উদ্দীপনার দিক হইতে হয় সম্পূর্ণ নিরর্থক। সে কার্য্য করিতে পারে একমাত্র শিল্পী। তথ্যের অবিকৃত অনুলিখনের জন্য নহে, ঘটনাবলীর পারম্পর্য্যের অনুসরণের জন্যও নহে, প্রতীক-নির্ব্বাচনের কৃতিত্বে। কত সংযোগ-বিয়োগ ঘটিয়া যায়, কত আগের জিনিষ পাছে গিয়া পড়ে, পাছের জিনিষ আগে যায়, কত ছোট বড় হইয়া উঠে, বড় ছোট হয়; কিন্তু এত ওলটপালটের মধ্যেও একটী বস্তু অবিকৃত থাকিয়া যায়, তাহা হইল ইহার আত্মরূপ; শুধু অবিকৃত থাকে বলিলেও সব বলা হয় না, কবির কল্পিত এই নূতন সংস্থানের মধ্যে প্রাণবস্তু অনির্ব্বচনীয় রূপে ফুটিয়া উঠে। শিল্প তথ্যের সৌন্দর্য্যময় সত্যে রূপান্তর, জড়বস্তুর নির্জীব প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয় শিল্পে।

অতএব, সাহিত্য যদি শিল্প বলিয়া দাবী করে, তবে তাহা কখনই প্রাণহীন জড়পিণ্ডমাত্র হইতে পারে না। যাহা সচরাচর ঘটিতেছে, তাহারই হুবহু অনুকরণকে সাহিত্য অভিধা দিলে সাহিত্যের মর্য্যাদাহানি হয়। শিল্পী তো শুধু যাহা ঘটিতেছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তুলি হাতে বসিয়া নাই—তথ্যের আনুগত্য করিবার জন্যও তিনি দাসখত লিখিয়া দেন নাই। তাঁর কাজ হইল বস্তুর সংস্পর্শে ভাবের যে-রূপ তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠে, তাহাকে রসের অপরূপতায় মিলাইয়া দেওয়া।

তাই যখন কেহ বলে Zola, Ibsen প্রভৃতি বস্তুপন্থী, তখন সহসা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। সাহিত্যিক কখনই যাহা দেখিলাম তাহাই বলে না, বলে যাহা দেখিলাম তাহা কেমন লাগিল। তাই যখন কোন সাহিত্যিক-সংস্কারক সম্মার্জ্জনী হস্তে সমাজের জঞ্জাল সাফ করিতে লাগিয়া যান, বস্তুপন্থী আখ্যা পাইলেও আমরা জানি আসলে তিনি ঘোরতর আদর্শবাদী। সমাজ অথবা রাষ্ট্র-জীবনে যখন কোন গ্লানি আসিয়া উপস্থিত হয়, অসুন্দরের অশুভ স্পর্শে যখন সংসার শ্রী-ও-হ্রী-ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, যখন

কোন প্রথাকে চিরাগত বলিয়াই নির্ব্বিচারে মানিয়া লওয়া হয়, তখন সেই অসামঞ্জস্য ও আত্মাবমাননা কবিচিত্তকে নির্ম্মমভাবে পীড়িত করে, তখন তাঁহার রচনায় সমাজের ভাবী চিত্র কল্পনার কমনীয় আলিম্পনে অঙ্কিত হইয়া তাঁহার আদর্শ-নিষ্ঠারই ইঙ্গিত করে। Ibsen-এর "Pillars of Society" "Doll's House," "Ghosts" প্রভৃতি সকল নাটকেই যৌন-সম্বন্ধের কৃত্রিমতার প্রতি তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। তাঁহার মতে সমাজের যে অবস্থায় প্রেমের পরম সম্বন্ধ টুটিয়া গেলেও বিবাহের কৃত্রিম বন্ধনকে মানিয়া লওয়া হয়, সে অবস্থা সত্যই ভয়াবহ; তাই তিনি দেখাইয়াছেন, কেমন করিয়া মমতাময়ী সাধ্বী, যে স্বামীর কল্যাণ-কামনায় সহস্র স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, পতির প্রীতির নিমিত্ত যে জীবনের কোন দুঃখকেই দুঃখ বলিয়া মানে নাই, স্বামীর অসুস্থতার সময়ে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য জাল সহি পর্য্যন্ত করিয়া যে অর্থ জুটাইয়া দিয়াছে,—এক কথায়, পতিদেবতার প্রেমনিষ্ঠায় যাহার নির্ভর ছিল স্থির ও গভীর, একদিন সে সহসা বুঝিল, এতদিন সে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিল! কোথায় প্রেম, কোথায় নিষ্ঠা? তাহাদের সে দাম্পত্যজীবন স্বপ্নমায়ার মত মিথ্যা, মরীচিকার মত অলীক। সমাজের শতকরা নিরানব্বইটি স্থলেই যৌনজীবনের প্রতিষ্ঠা এইরূপ 'চোরাবালি'র উপরে, কখন ধ্বসিয়া যায় কে জানে? মনের দিক দিয়া প্রেমকে তলাইয়া বুঝিবার ইচ্ছা বা বুদ্ধি যাহাদের নাই, তাহারা হয়তো দাম্পত্য জীবনের এই মামুলী নীতিকে বেশ সুসহ বলিয়াই মনে করে; কিন্তু যুক্তির সূক্ষ্ম নিক্তি দিয়া যাহারা সমাজ-ব্যবস্থার গুরুত্বের পরিমাপ করে তাহারা বুঝে, যে-ঘর সাজাইয়া তাহারা বসিয়া আছে, তাহার স্থায়িত্ব একতিলও নাই। কিন্তু বুঝিলেও 'টেক্‌স' দিবার ভয়ে তাহারা কথা কহে না। কিন্তু যুগে যুগে, দেশে দেশে জনসমুদ্রের মধ্যে পাগলা ঢেউ দু'একটি জাগিয়া উঠে এবং সংসারের জীর্ণ বাঁধা-তটে আছাড়িয়া পড়িয়া কূলে কূলে ভাঙ্গন লাগাইয়া দেয়। সেই যে দুই একজন দুর্লভ মনুষ্য, যাঁহারা সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করেন

এবং উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করিবার দুঃসাহস রাখেন, তাঁহারা বোধ হয় জীবনে সম্মানের চেয়ে নির্য্যাতনই লাভ করেন অধিক। সাধারণে তাঁহাদের বুঝিতে পারে না, মুষ্টিমেয় যাহারা বুঝিতে পারে তাহারাও না বুঝিবার ভান করে; তবেই দেখা গেল, "বাস্তববাদী" নামে যাঁহারা আখ্যাত তাঁহারাও আমাদের সামনে ধরেন কল্পলোকের সেই মনোজ্ঞ চিত্র, যাহা তাঁহারা রচনা করিয়াছেন "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে"।

তাই বলিয়া শিল্পী ও সংস্কারক এক নহেন, ইহাঁরা দুই পৃথক্ জগতের জীব। শিল্পী ব্যস্ত থাকেন আনন্দলোক-সৃজনে; সংস্কারক চাহেন জাতীয় জীবনের অভ্যুদয়ের পথ মুক্ত করিয়া দিতে। সৃজন-বেদনায় কবিচিত্ত যখন আতুর হইয়া উঠে, তখন সেই ভাবঘন মনে পার্থিব উন্নতি-সাধনের কল্পনাও জাগে না। আইরিশ কবি জর্জ রাসেল (এ. ই.) যেমন অক্লান্ত কর্ম্মী, তেমনি সত্যসন্ধ, ঋষিকল্প কবি। কিন্তু কাজকে তিনি তাঁহার কাব্যে টানিয়া আনেন নাই—বাণীর মেধ্য মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন ভক্তিপূত ভাবকমলের মঞ্জুল অঞ্জলি লইয়া। তাই বলিয়া কলাবিদের কল্পলেখায় কর্ম্মি-মনের কোন ছাপই পড়িবে না, এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। শিল্পরচনার কালে প্রেরণার প্রবাহে তাহা কথঞ্চিৎ গৌণ হইয়া যাইবে, এই পর্য্যন্ত। বাঙ্গালা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের এবং শরৎচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসের মধ্যে সংস্কারক ও শিল্পীর সমন্বয় দেখা যায়।

পূর্ণাঙ্গ কথা-সাহিত্যের প্রথম স্তরে পাই 'Romance', অথবা নিছক গল্প —রোমাঞ্চকর ঘটনাপুঞ্জের পরম্পরা, যাহা আমাদের বিস্মিত ও চকিত করিয়া সমগ্র দেহ-মনে পুলকের শিহরণ বহাইয়া দেয়। Dumas-র 'Three Musketeers,' বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরাণী' প্রভৃতি কতকটা এই জাতীয় গ্রন্থ। ইহাদের মধ্যে আমরা নিগূঢ় মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ, অথবা অপূর্ব্ব চরিত্র-চিত্রণ, কিছুই প্রত্যাশা করি না। যে জগৎ বাহিরে নাই, অথচ আমাদের মনে আছে; যে বেপথু ও বিস্ময় জীবনে পাই নাই, অথচ পাইতে ইচ্ছা

করে; কবি-মনের মুক্ত বাতায়নে বসিয়া সেই অনাস্বাদিতের সহিত দূর হইতে যখন প্রথম দৃষ্টিবিনিময় হয়, তখন একটা অপূর্ব্ব পরিতৃপ্তিতে সমস্ত চিত্ত ভরিয়া যায়, দেহ-পিঞ্জরের পোষা পাখীটি বাঁধন কাটিয়া অসীম নীলিমায় মিলাইতে চাহে।

কিন্তু চিত্তবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই অবাস্তবের রসপিপাসা মিটিয়া যায়, মানুষ ক্রমে কতকপরিমাণে বাস্তবের সীমায় নামিয়া আসে। তখনও চোখে ঘোর লাগিয়া আছে; তাই এই যুগের শিল্পসৃষ্টির ভিতরে জগতের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বাস্তবের ও অবাস্তবের মাঝামাঝি, তাহার মধ্যে আছে পূর্ণাঙ্গ জগতের এক অপরূপ পরিকল্পনা (.Utopia)। বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' ও 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' এইরূপ আদর্শমূলক বাস্তব রচনা; অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে অনৈসর্গিক অথবা অসম্ভাব্য কিছুই নাই—আছে সুসমঞ্জস ও সুসম্পূর্ণ এক আবেগময় মনোজগতের চিত্র।

ইহার অব্যবহিত পরের যুগেই পাই সেই অনবদ্য কথা-সাহিত্য, মাটীর পৃথিবীর সহিত যাহার নাড়ীর যোগ আরও ব্যাপক ও গভীর, যাহার ভিতর বুদ্ধি ও বিচারের তীব্রধারা আসিয়া মিশিয়াছে মানুষের অন্তরের নিগূঢ় সংবেদনার সহিত। ইহাকে নিছক বস্তুজগতের চিত্র বলিয়া মনে করা ভুল, আর তাহা হইতেও পারে না—তবে একথা ঠিক যে, এ যুগের প্রতীচ্য সাহিত্যে বর্ত্তমান জীবনসমস্যার মূল সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এখন রোমান্সের যুগ কাটিয়া গেলেও "Romanticism" এর যুগ বোধ হয় যায় নাই; তাই বাঙ্গালা কথা-সাহিত্যে লক্ষিত হয় অশান্তি ও অধীরতার আবেগ। 'Realism' বা বাস্তববাদ বলিতে পাশ্চাত্ত্য দেশে যাহা বুঝায় তাহার অনুরূপ কিছু আজ পর্য্যন্ত আমাদের কথা-সাহিত্যে দেখা যায় নাই। গোর্কি, আইবানেজ, ডেকোব্রা প্রভৃতির সৃষ্ট জগতে প্রকট জগতের যে উৎকট বীভৎসতা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বর্ত্তমান বিশ্বের রাষ্ট্র ও সমাজের সমালোচনামূলক যে অভিনব আখ্যান বর্ণিত

হইয়াছে, নানা আন্দোলনের প্রতি যে সুতীব্র কটাক্ষপাত করা হইয়াছে, —এক কথায় মানুষের ধীশক্তির যে বিস্ময়কর লীলা-চমক দেখান হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালার কোন শিল্পীর রচনায় কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। "Madonna of the Sleeping Cars" নামধেয় ফরাসী সাহিত্যিক 'ডেকোব্রা' লিখিত একখানি উপন্যাস সম্প্রতি আমার হাতে আসে। বইখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলাম। রুশিয়ায় 'সোভিয়েট' আন্দোলনের নগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম; মতের দিক দিয়া সাম্য-নীতির পরিপোষক ও প্রচারক যাহারা, কি ভীষণ তাহাদের ভেদবুদ্ধি—স্বার্থসাধনের সময় এই সোভিয়েট 'কমরেড্'গণ কি হৃদয়হীন ও নির্ম্মম! হয়তো সোভিয়েট রুশিয়ার এই মূর্ত্তি অতিরঞ্জিত, হয়তো ইহাদের নৃশংসতার যে বীভৎস চিত্র লেখক আঁকিয়াছেন, তাহার অনেক খানিই তাঁহার মনগড়া, তবুও এই গ্রন্থপাঠে আমরা জানিতে পারি, মানুষ আসলে মানুষই, মানুষ-সুলভ দুর্ব্বলতা তাহার থাকিবেই; সে সুখের স্বপ্ন দেখিবে, স্বগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার চেষ্টা করিবে, লোভের বশীভূত হইবে, লাস্যময়ী রূপসীর বিলোল কটাক্ষে সে বাঁধা পড়িবে; অর্থাৎ মানুষের সেই চিরন্তন রসেরই অভিব্যক্তি এখানেও। বাস্তবের উপকরণ এখানে প্রচুর থাকিলেও কল্পনার স্বপ্ন-তন্তু দিয়া ইহা নির্ম্মিত। আবার বলি, অবিমিশ্র বাস্তবতার উপাদানে কোন সাহিত্য কোনদিন সৃষ্ট হইতে পারে না।

জীবন-সমস্যার প্রকৃত আলোচনা বিশেষ না হইলেও অধুনা একটি নূতন শক্তির ক্রিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যে অনুভূত হইতেছে। জীবনের অন্তরতম বস্তুর সহিত একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ, বাঙ্গালা সাহিত্যকে জীবন্ত ও শক্তিমান্ করিয়া তুলিয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি মানুষের মহৎ ও গভীর দুঃখের ছায়াপাতে স্নিগ্ধ ও সুন্দর। সমাজশক্তির বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড অভিযোগ বিদেশীয় সাহিত্যে অহরহঃ শ্রুত হইতেছে, তাঁহার রচনায়ও সেই ধ্বনি পৌঁছিয়াছে। কিন্তু "তিনি সমাজশক্তিকে আঘাত করিয়াছেন তাহার নীতির দিক দিয়া, অর্থনীতির দিক দিয়া নহে" অর্থাৎ তাঁহার গল্প-উপন্যাসে তিনি

সমাজের কোন কঠিন সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করেন নাই—সমাজের জটিল প্রশ্নগুলি তাঁহার সাহিত্যে যে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা নিতান্ত গৌণ। ধনিক ও শ্রমিকের বিরোধ, অভিজাত-সম্প্রদায়ের প্রতি গণমনের বিরূপতা, দেশব্যাপী বেকার-সমস্যা ইত্যাদি তাঁহার রচনায় কতকটা উপেক্ষিতই হইয়াছে, অথচ প্রতীচ্যের কথা-সাহিত্যে এইগুলিই এখন সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য। শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি পড়িয়াছে সমাজের ধর্ম্মমূলক কতকগুলি প্রচলিত সংস্কারের উপর। চরিত্রহীনের সতীশ ও সাবিত্রীর চরিত্রে তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন, সামাজিক বিচারের নিরিখে যাহারা ভ্রষ্ট ও পতিত বলিয়া বিবেচিত তাহাদের মধ্যেও কতখানি সংযম ও সহিষ্ণুতা থাকিতে পারে। শরৎচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থই নায়িকা-প্রধান, সংসারের গণ্ডীর মধ্যে নারীই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী—সেখানে গণতন্ত্র নাই, নারীর বিধান সেখানে অমোঘ। তিনি আরও দেখাইয়াছেন, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দুইটি ভিন্ন মানুষ বাস করে; বাহিরে যে কাজ করিতেছে এবং মনে যে চিন্তা করিতেছে ইহারা একব্যক্তি নহে। তাই পল্লীসমাজে বালবিধবা রমা, রমেশকে দেখিয়াই যাহার মনে কৈশোর প্রণয়ের নিলীয়মান স্মৃতি পুনরায় জাগরূক হইয়া উঠিয়াছিল, মনে মনে যে রমেশকে দেবতার আসনে বসাইয়াছিল, বাহিরে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার প্রতীপতা করিয়া আসিয়াছে। বাহিরের আচরণ দেখিয়া যাহারা মানুষের বিচার করিতে বসে অনেক ক্ষেত্রে তাহারা বিচারের নামে অনাচারকেই প্রশ্রয় দেয়। কবি বার্ন্‌সের ভাষায় বলিতে গেলে,—

"Rank is but the guinea stamp
Man's the gowd for a'that."

কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই অপরাজেয় কথা-শিল্পী কোথাও সমাজবন্ধনকে উপেক্ষা করিয়া স্বৈরাচারকে বরণ করিয়া লন নাই। তাই তিনি সতীশ ও সাবিত্রীর পরস্পর আকর্ষণের ইঙ্গিত যথেষ্ট করিলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের বিবাহ-বন্ধনে বাঁধিয়া দেন নাই; মুমূর্ষ উপেন্দ্রের অন্তিম

উক্তিগুলির মধ্য দিয়া বন্ধনের সুদূর সম্ভাবনাকে পর্য্যন্ত উন্মূলিত করিয়া দিয়াছেন। সাবিত্রীর চরিত্রের যে শালীনতা ও সম্ভ্রমবোধ তাহাকে সহস্র প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাহা জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাহাকে বর্ম্মের মতই ঘিরিয়া ছিল ইহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

ফল কথা, সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই শরৎচন্দ্র ক্ষান্ত হইয়াছেন, সংস্কারকের উচ্চমঞ্চে চড়িয়া তাহাদের আমূল পরিবর্ত্তনের অধিকার দাবী করেন নাই। শিল্পী তিনি, রস-সাহিত্যের রূপকার তিনি, কাজেই তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ তাঁহাকে সেই দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসগুলির পত্রে পত্রে নারী-চিত্তের যে অজস্র মধু ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাহা পান করিয়া আমরা মুগ্ধ ও চরিতার্থ হইয়াছি। "রামের সুমতি" "বিন্দুর ছেলে" প্রভৃতি গল্পে তিনি নারী-চিত্তের যে অমেয় স্নেহের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যে কোন দেশের সাহিত্যেই দুর্লভ। নারীর এই দেবীরূপ তো আমরা সহজে দেখিতে পাই না—তিনি দেখাইয়া আমাদের ধন্য করিয়া দিয়াছেন। এখনও কি বলিব, তিনি বাস্তববাদী—এখনও কি মানিব না যে সাহিত্যমাত্রই আদর্শধর্ম্মী?

বাঙ্‌লার এ যুগের উপন্যাস-সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'। বাস্তবের সহিত কল্পনার এমন গলাগলি আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। একটি সম্পূর্ণ নূতন সুর, নূতন প্রকাশ, জগচ্ছবিকে নিরীক্ষণ করিবার একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র ভঙ্গি ইহাদের আদ্যন্ত অনুস্যূত। 'অপু'র বাল্যলীলা, তাহার বেচারী দিদির অশ্রুকরুণ কাহিনী এমন অসীম মমতার সহিত হৃদয়ের রক্ত-রেখায় লেখা হইয়াছে যে তাহার তুলনা, শুধু বঙ্গসাহিত্যে কেন, বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ। প্রকৃতির সহিত মানুষের অন্তরের এরূপ নিবিড় অন্তরঙ্গতা এক কালিদাসের 'শকুন্তলা' ভিন্ন অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না। অথচ অপুর জীবন-

সংগ্রামের রক্তাক্ত কাহিনী বাস্তবতার দিক দিয়াও কাহারও নীচে নয়। রচনার ঢঙ্টি রোমাঁরলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফের' অনুরূপ হইলেও লেখকের দরদ ও দৃষ্টি তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। দুঃখের বিষয় ভারতের এই স্বকীয় ধারার অনুবর্ত্তন কেহ করিল না।

বর্ত্তমানে একদল তরুণ সাহিত্যিক বাস্তবতার নামে যৌন-বিকারের যে নগ্ন ও নিরাবরণ চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয় মানুষ বুঝি আবার সেই আদিম বর্ব্বরতার যুগে ফিরিয়া গিয়াছে। স্বীকার করি, মানুষের ভিতরের সেই বর্ব্বর জীবটি মাঝে মাঝে তাহার বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বসে, কিন্তু একথাও কি অস্বীকার্য্য যে ইন্দ্রিয়জয়েই মানুষের মনুষ্যত্ব—স্মরণাতীত কাল হইতে মানুষ তাহার অন্তরের এই পশুপ্রকৃতির সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে? বিলাতীর অনুকরণে 'flirtation' পর্য্যন্ত না হয় সহ্য হয়, কিন্তু এমন একটা সময় আসে, যখন শক্ত করিয়া দাঁড়ি টানিয়া না দিলে মানুষের কথাশিল্প পশুত্বের মনো-বিজ্ঞানে পরিণত হয়। কবিগুরু কালিদাসের শকুন্তলায় দেখি ইন্দ্রিয়জয়ে অসমর্থ হইয়া এই গ্রন্থের নায়ক-নায়িকা অনুশোচনার কি তীব্র তুষানলে দগ্ধ হইতেছিলেন—কেমন করিয়া তাঁহারা দীর্ঘ দুরূহ তপস্যার অন্তে ইন্দ্রিয় -জয়ের পর শাশ্বত মিলনের অধিকারী হইলেন। কালিদাসকে 'old fool' এর দলে ফেলিলেও পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ কথাগ্রন্থের আলোচনা করিয়া দেখান যাইতে পারে যে সাহিত্য পুলিশ-আদালতের মামলার তালিকামাত্র নহে, জীবনের পরম-মুহূর্ত্তে সযত্নে চয়িত ভাবপ্রসূনের মঞ্জুল মালিকা। য়ুরোপীয় সাহিত্যে সমস্যা ও সংস্কার আজ বিপুলাকার ধারণ করিয়াছে; কোথায় গেল শিল্পের জন্য শিল্প, কোথায় গেল আদর্শবাদ! শুধু অন্তহীন আন্দোলনই (endless agitation) রহিয়া গেল, নির্ব্বিকল্প শান্তি (tranquillity) সভয়ে দূরে পলাইল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে য়ুরোপে যৌন-কামনাই ছিল কথাসাহিত্যের প্রধান উপজীব্য; কতকগুলি শক্তিহীন ও রুচিহীন লেখকের

কবলে পড়িয়া সাহিত্যের মেধ্য মন্দির অশুচি ও পূতিগন্ধে-পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রকৃত মনীষী যাঁহারা তাঁহারা এই কামবৃত্তির উদ্দামতা ও দুর্ব্বারতার চিত্র আঁকিয়াছেন সত্য, কিন্তু একটি সহজ ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহারা শ্লথরশ্মি কামপশুর মুখের বল্গা টানিয়া ধরিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আনাতোলের "থেইস্" গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্যে এই কামায়ন-সাহিত্যের প্রচার যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে—জাতির অর্থ ও রাষ্ট্রসমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে সাহিত্যের প্রাণবস্তু,—তদপেক্ষা উচ্চতর কোন চিন্তা যেন সাহিত্যের আসরে আসন পাইবার যোগ্যই নহে। মার্কিণ লেখক Upton Sinclair-এর 'Oil', 'Metropolis' প্রভৃতি গ্রন্থ এই শ্রেণীর। ইহাদের মধ্যে জীবনদ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতের, সমাজের বিচিত্র সমস্যার চিত্র যে পরিমাণে আছে, শুদ্ধ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রেরণা ততখানি আছে বলিয়া মনে হয় না। রেমার্কের 'All Quiet' গ্রন্থে বিগত য়ুরোপীয় যুদ্ধের ভয়াবহ চিত্র যেরূপ নগ্নভাবে উদ্‌ঘাটিত করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে আমাদের অন্তরাত্মা বেদনায় বিহ্বল হইয়া যায়। আহত, আর্ত্ত সৈনিকটি 'দেহরক্ষা' করিলে ঐ বুট-জোড়াটি তাহার হস্তগত হইবে সেই আশায় বন্ধু প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার বন্ধুর মৃত্যু কামনা করিতেছে, এই মর্ম্মান্তিক করুণ কাহিনী যখন পাঠ করি, তখন মনুষ্য-জীবনের প্রতি একটা বিরাট ধিক্কারে কি আমাদের চিত্ত ভরিয়া উঠে না? বলা আবশ্যক, ইহাও বাস্তব চিত্র নয়—সৈনিক-হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে যে তিক্ত-অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহারই কল্পনানুরঞ্জিত আলেখ্য। কলাবিৎ যখন শিল্পের শাশ্বত আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বস্তুপুঞ্জের বেদীমূলে সৌন্দর্য্য ও সুষমাকে বলি দেন—তথ্য যখন অতিমাত্র স্ফীত হইয়া সত্য-বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, কলাসাহিত্যের ইতিহাসে সে এক ভয়ানক দুর্দ্দিন। আজ আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে সমাজ-সমস্যা অত্যন্ত উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিলেও সাহিত্যে তাহার রেখাপাত হইয়াছে অল্পই।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের হিসাবে এখনও আমরা রহিয়াছি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে; তাই এখনও এ দেশে 'কামায়ন' সাহিত্যেরই প্রচার ও পুষ্টি হইতেছে প্রচুর। যে-সকল পবিত্র সম্বন্ধ-বন্ধন এতদিন হিন্দুর গৃহাশ্রমকে দেবায়তনের পবিত্রতা দান করিয়াছিল, তাহাদের নিলীয়মান জ্যোতির শেষ-রশ্মিগুলিও একে একে কোথায় মিলাইয়া গেল! চিরাচরিত রীতির পরিপন্থী বলিয়াই যে ইহাদের নিন্দা করিতেছি তাহা নহে, সমাজ-শৃঙ্খলার বিপ্লব সূচনা করিতেছে বলিয়াও ইহাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই; অপবাদ দিতেছি এই বলিয়া যে, কোন বিরাট গঠনকল্পনা এই প্রচেষ্টার পশ্চাতে নাই, আছে কেবল গুরুপাক ফ্রয়েডিয়ান মনোবিজ্ঞানের বিকৃত উদ্গার। 'Libido' 'Oedipus' প্রভৃতি গূঢ়ৈষা (complex) ইহাতে আছে সত্য, কিন্তু নাই সেই সহজ প্রাণরস, যাহা নিত্যকালের মানুষকে যুগপৎ আনন্দ ও বেদনায় বেপমান করিয়া তুলে। সাহিত্যে জীবনকে প্রচুর ও প্রগাঢ়ভাবে ফিরিয়া পাইতে হইলে শুধু যৌবনের অবাধ উদ্দামতার চিত্র অঙ্কিত করিলেই যথেষ্ট হইবে না, জীবন-উৎসের মুখগুলি সব খুলিয়া দিয়া জীবনের ঊষরতার উপর দিয়া রসের প্রবাহ বহাইয়া দিতে হইবে; সেখানে প্রেম থাকিবে, প্রশ্ন থাকিবে, সর্ব্বোপরি থাকিবে কল্পনার সেই অপরূপ বিস্তার, যাহা মর্ত্ত্যকে অমৃতের দিকে লইয়া যায়, ধূলিময়ী ধরণীকে স্বর্গের স্নিগ্ধ সুষমায় মণ্ডিত করিয়া তুলে।

কাব্য ও বস্তুতন্ত্রতা

দার্শনিক বেন্থাম বলেছেন কাব্য এবং সত্যের মধ্যে একটী স্বাভাবিক বিরোধ আছে, অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে আমরা যে জিনিস পাই তার পনের আনাই কাল্পনিক, সত্যের অংশ তার মধ্যে থাকে খুব অল্প। গোয়ালার দুধ নামে পরিচিত শ্বেতাভ জলীয় পদার্থের মত তাতে সারবস্তু বড়ই কম, জলের ভাগই অধিক। কোথাকার সামান্য একটুখানি ঘটনাকে অবলম্বন করে তার ওপর কল্পনার আল্পনা এঁকে এমন ক'রেই সেটাকে কবি প্রকাশ করেন যে আসল বস্তুটীকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। এমন যে জিনিস যা মানুষের কোন প্রয়োজনেই লাগে না—যা কেবল শব্দের সুষমায় এবং ছন্দের হিল্লোলে আমাদের মনকে ভুলিয়ে কোন্ এক অপরূপ রূপ-কথার রাজ্যে নিয়ে যায়—সেটাকে আমাদের অবসর-সময়ের খেলার সামগ্রী ব'লেই গণ্য করা উচিত, তার বেশী মূল্য তার নেই। অনেকে আবার কাব্যকে কল্পনাবিলাসীর বিকৃত-মস্তিষ্কের প্রলাপ ব'লেও মনে করেন। তাঁদের মতে এমন সব ভাব কাব্যের ভিতরে স্থান পায় যা মানুষ প্রকৃতিস্থ অবস্থায় কখনই বরদাস্ত কর্‌তে পারে না। তৃতীয় একদল লোকের বিশ্বাস যে কাব্যের সঙ্গে দুর্নীতির রীতিমত সম্বন্ধ আছে এবং একটু-আধটু অশ্লীলতার ইঙ্গিত অন্তত না থাক্‌লে কাব্য-নাটক ভাল জমে না। লোকে যে কাব্য-চর্চ্চা করে তার প্রধান কারণই হ'চ্ছে যে তা'তে ক'রে মানুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তির তৃপ্তি কতক-পরিমাণে সাধিত হ'তে পারে। মানুষের ষড়্‌রিপুর মধ্যে প্রথমটীর চেয়ে প্রবল আর কোন্‌টী আছে? অতএব শৃঙ্গাররসের সমাবেশ যে কাব্যে যত বেশি সে কাব্য আমাদের তত হৃদ্য হয়।

প্রথমে প্রথমদলের আপত্তির অলোচনা করা যাক্। তাঁদের প্রধান অভিযোগ এই যে কাব্য জিনিষটা আগা-গোড়াই ধোঁয়া, সারবস্তু তার ভিতর

কিছুই নেই। কাব্য কল্পনানুরঞ্জিত মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁরা চান জাগতিক কল্যাণের কষ্টিপাথরে সাহিত্যের দর যাচাই ক'রতে। টাকা-আনা-পাই ছাড়িয়ে তাঁদের বুদ্ধি এগোয় না। সুতরাং যার মধ্যে সত্যের আভাস অথবা উদরপূর্ত্তির উপায় পাওয়া যায় না বস্তুপন্থীরা সে জিনিসের কোন প্রয়োজন আছে ব'লেই স্বীকার করেন না। বিচার্য্য এই যে সারবস্তু ব'ল্‌তে বোঝায় কি ? দেহটাই যদি মানুষের সব হ'ত, মন ব'লে যদি কোন বালাই তার না থাকৃত, তাহ'লেও হয় তো বলা যেতে পারত যে সারবস্তু তাই যা মানুষের দেহ-যন্ত্রটাকে লাবণ্যযুক্ত করে, আর ভোগ-বিলাসের যাবতীয় আস্‌বাব্ তার সামনে এনে ধরে দেয়। কিন্তু বড়বাড়ী আর জুড়িগাড়ী হলেই তো মানুষের মনের শূন্যতাটা ভরে ওঠেনা। সেই যে আকাশ-পাতালব্যাপী বিরাট্ শূন্যতা, যেখানে মানুষ "যাহা চায় তাহা ভুল ক'রে চায়, যাহা পায় তাহা চায় না," অর্থনীতিকের নির্দ্দেশিত কোন পন্থাই তো সেই মহামরুতে শান্তির স্নিগ্ধচ্ছায়া-টাকে ঘনিয়ে আন্‌তে পারে না। প্রত্যক্ষবাদী জন্ স্টুয়ার্ট মিল্‌কেও তাই এক-সময়ে ব'ল্‌তে হয়েছিল যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্য তাঁকে জীবনে যে নির্বৃতির আস্বাদ দিয়েছে, পৃথিবীর আর কোন কিছুই তা পারে নি। সুতরাং ধোঁয়ারও মূল্য আছে সন্দেহ নেই! দ্বিতীয় কথা, সাহিত্যে উদরপূর্ত্তির উপায় বর্ণিত না থাক্‌লেও সত্যের আভাস তাতে আছে প্রচুর ; সত্যের সহিত সাহিত্যের মূলত কোনই বিরোধ নেই। প্রত্যুত, সাহিত্য ও সত্য সমার্থবাচক। সত্য কি জিনিস ? যা ঘটে তাই কি কেবল সত্য ? কবিচিত্তের গোমুখীমুখে যে সত্য-সুরধুনীর উদ্ভব হয় তার পুণ্য-প্রবাহে স্নান ক'রে কি কোটি কোটি নরনারী শুচি ও নির্ম্মল হয় না ? শিল্পী ক্লডের আঁকা নিসর্গ-চিত্রগুলিতে মানুষ, গোরু, গাছপালা প্রভৃতির ছবিগুলি ঠিক স্বাভাবিক-ভাবে চিত্রিত হয় নি ব'লে কে কবে অভিযোগ ক'রেছে ? কবির কাব্যে ইতিহাসের ঘটনানুবর্ত্তিতার সন্ধান ক'রতে গেলে অবশ্যই হতাশ হ'তে হ'বে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হলপ্-পড়া সাক্ষীর মত সত্যকথা কবি বলেন না। যখন তিনি "আইআগো"র দুরভিসন্ধি,

"ওথেলো'র ঈর্ষ্যা ও সন্দেহ অথবা 'দেস্‌দিমোনা'র হত্যার কথা বিবৃত করেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য থাকে মানব-মনের প্রাথমিক বৃত্তিগুলিকে আমাদের মনের সামনে ধ'রে দেওয়া। আর ইতিহাসেই কি আমরা ঘটনাপুঞ্জের অবিকৃত আলেখ্য পাই? সার্‌ ওয়াল্‌টার র‍্যালে যখন পৃথিবীর ইতিহাস সঙ্কলন কর্‌ছিলেন তখন একদিন ঠিক তাঁর জানালার নীচে তাঁর চোখের সামনে একটা ভীষণ মারপিট্‌ হ'য়ে গেল। ব্যাপারটার প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ ক'রতে গিয়ে তিনি দেখ্‌লেন যে কোন দু'জন লোকই ঠিক এককথা বলে না। সেইদিন তিনি প্রথম উপলব্ধি ক'রলেন যে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সত্যের নামে কত অসংখ্য মিথ্যা নির্ব্বিবাদে চ'লে যাচ্ছে। নিজের চোখে যা দেখা গেল তারই সম্বন্ধে যখন এত গোলযোগ, তখন দু'হাজার বছর আগেকার কোন ঘটনার অকপট ইতিহাস লিখতে যাওয়া কি বিড়ম্বনা!

কাব্য কি? অন্তঃপ্রেরণাবলে কবি মনোজগতে জীব-জগতের যে বস্তুনিরপেক্ষ ভাবমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করেন তারই অভিব্যক্তি হয় কাব্যে। বস্তুর বহীরূপের সঙ্গে তা অবিকল মেলে না, অথচ আমরা মনে-প্রাণে জানি তার মত সত্য জগতে আর কিছুই নেই। প্রেমিকচূড়ামণি চণ্ডীদাস যখন শ্রীহরি-বিরহে রাধার মনোভাব বর্ণন ক'রতে গিয়ে প্রিয়বিরহে তাঁর নিজের মনের অবস্থা একটী একটী ক'রে রাধার ওপর আরোপ করেছেন তখন তাঁর অমূল্য পদগুলি কি সত্যের দিক্‌ দিয়ে অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে? তাঁর প্রেমগদ্‌গদ কণ্ঠের অশ্রুকোমল কমনীয় রাগিণী যখন শুনি, তন্ময়চিত্তে যখন পাঠ করি—

"আনের পরাণ আনের অন্তরে আমার পরাণ তুমি।
তিল আধ তাই নয়নে না হেরি মরণ বাসি যে আমি।"

তখন বিরহি-হৃদয়ের এই মর্ম্মন্তুদ উচ্ছ্বাস আমাদের প্রাণের তারে যে মূর্চ্ছনা ঝঙ্কৃত করে তার চেয়ে গভীরতর সত্য আর কি আছে? সত্য ও তথ্য এক জিনিস নয়। বাহিরে যা ঘটে তাই তথ্য, অন্তরের নিভৃত নিত্য-লোকেই সত্যের স্বরূপ বিম্বিত হয়। কাব্য ইতিহাস বা ঘটনাপুঞ্জের সমষ্টি

নয়; বিজ্ঞান অথবা প্রাকৃতিক কার্য্যসমূহের অন্তর্নিহিত কারণসূত্রের অনুসন্ধানও নয়। সত্যদর্শী কবির চিত্তদর্পণেই অলোকের আলোক প্রতিফলিত হয়। সত্য সর্ব্বকালেই সত্য, শাশ্বত ও অপরিবর্ত্তনীয়। বিজ্ঞান কালে কালে পরিবর্ত্তমান। গতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিউটনের যে সকল প্রাথমিক সূত্র এতদিন পর্য্যন্ত অভ্রান্ত ব'লেই মান্য হয়ে আস্‌ছিল, আইন্‌স্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের আবিষ্কারের পরেও কি তাদের সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই বলা চলে? আমাদের প্রাচীন সভ্যতার কতটুকু পাই আমরা খাঁটি ইতিহাসের মধ্যে? ব্যাস-বাল্মীকির কাব্যে ভারতের অতীত সভ্যতার যে চিত্র অঙ্কিত র'য়েছে তা থেকেই আমরা কি আমাদের পুরান দিনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ পরিচয় পাই না? হোমরের কাব্যে গ্রীসের আদিম সভ্যতার যে নিদর্শন প্রতিফলিত হ'য়েছে সেই দেশ-সম্বন্ধে লিখিত কোন্ ইতিহাস তার চেয়ে বড় সত্যের ইঙ্গিত ক'রতে পেরেছে? বেকন্ ব'লেছেন, কবি প্রকৃতির বাইরের রূপটীকে অন্তরস্থ কামনার আলোকে রঙীন ক'রে নেন; যা বিশ্বের সকল লোকের মধ্যে সকল কালেই সমভাবে বর্ত্তমান আছে এমন্ সব সর্ব্বজনীন সত্যের আভাস দেয় কাব্য; মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গের অমৃত-রসে আমাদের সঞ্জীবিত রাখে, দুঃখকে সুসহ করে, সঙ্কটকে মধুময় করে, আমাদের মনের সাম্‌নে উন্মুক্ত ক'রে দেয় আনন্দের চির-নন্দন! কবি-কঙ্কণের চণ্ডী কাব্যে সেই সময়কার বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরকরনার নানাবিভাগের যে চমৎকার চলচ্চিত্র পাওয়া যায় তার সামান্য একটু নমুনা হিসাবে এইখানে "কালকেতুর অঙ্গুরী ভাঙ্গাইতে বণিকালয়ে গমন" অধ্যায়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মধ্যে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, যে অপূর্ব্ব লিপিকুশলতা, মানবমনের সঙ্গে যে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের অভিব্যক্তি দেখা যায় তা ইতিহাসে দুর্লভ। মনীষী এরিস্টট্‌ল্ বলেন, ইতিহাসের চেয়ে কাব্যে দার্শনিকতা অনেক বেশী; বিশ্বজনীন সত্য নিয়ে হ'ল কাব্যের কারবার, ঘটনা-বিশেষের প্রতিলিপির নাম ইতিহাস। সুতরাং কাব্য যে অনাবশ্যক এ মত কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।

এখন দ্বিতীয় অভিযোগটীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক্ ; বাস্তবিক কাব্য কি বিকারগ্রস্তের প্রলাপ ? রামায়ণের মধ্যে দশানন রাবণের কথা আছে, মহাভারতে হিড়িম্বা-ঘটোৎকচের কাহিনী আছে, গ্রীকপুরাণে 'সেণ্টর' প্রভৃতির অলৌকিক আখ্যায়িকা আছে সত্য ; কিন্তু যার একটীমাত্র দেহে দশমল্লের বীর্য্যের সমাবেশ হয়েছিল, অত্যাচার ও উৎপীড়ন ক'রেছিল যে শত হস্তে, যে উদগ্র পাশব-শক্তির প্রতীক ছিল এই নরদুর্লভ অবয়ব, সেই রাবণকে না দেখে যদি আমরা কেবল তার হাত-পাগুলোই দেখি তা-হলে কবি এবং কাব্যের ওপর অবিচার করা হ'বে সন্দেহ নেই। এই মনোবৃত্তি অনেকটা শিশু-মনোবৃত্তির অনুরূপ ; কথামালার গল্প শুনতে শুনতে শিশুরা যেমন জিজ্ঞাসা ক'রে বসে, "বাবা, শেয়ালে কি কথা কইতে পারে ?" "আচ্ছা, মানুষ আকাশে ওড়ে কি করে ?" এই সকল লোকের আপত্তিও কতকটা সেই ধরণের। প্রোক্লাসের মতে প্লেটো যে তাঁর গণতন্ত্র থেকে কাব্যকে নির্ব্বাসিত ক'রেছিলেন তার কারণ এ নয় যে কাব্যকলা সম্বন্ধে তাঁর বাস্তবিক কোন অশ্রদ্ধা ছিল ; আশঙ্কা ছিল পাছে তরুণ-সম্প্রদায় একে ভুল বোঝে এবং রূপক ও বাস্তবের প্রভেদ নির্ণয় করতে অসমর্থ হয় ; আসলে কিন্তু তিনি ললিত-কলার মধ্যে খাঁটি কাব্যকে সকলের উপরে আসন দিতেন। "দুই আর দুএ চার" পর্য্যন্ত যাদের দৌড়—এই রকম গাণিতিক-বুদ্ধি-সর্ব্বস্ব লোকের পক্ষে

> **She plays me like a lute, what tune she will,**
> **No string in me but trembles at her touch ; (Masefield)**

অর্থাৎ……

> বীণার মত আমায় ল'য়ে করে কেবল খেলা,
> বাজায় নানান্ সুর !
> সব ক'টী তার কাঁপে আমার পেয়ে পরশ তারই,
> সুখে হৃদয় ভরপুর !

এই রকম কমনীয় মাধুর্য্যের উপলব্ধি হওয়া সহজ নয়। বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির নিত্য-নবীন কান্তি তাদের চোখে ধরা পড়ে না—পত্রের মর্ম্মরে, নৃত্য-

পরা তটিনীর কলগানে, উপলখণ্ডের অন্তরালে অনন্ত উপদেশের ইঙ্গিত তারা পায় না। বস্তুতঃই তারা অনুকম্পার পাত্র।

কাব্যের বিরুদ্ধে সব-চেয়ে বড় অভিযোগ এই যে কাব্য দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়—এমন কি কাব্যের প্রধান অঙ্গই হ'ল অশ্লীলতা। একথা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। কোন কোন কাব্যে অশ্লীলতা-দোষ থাকতে পারে; তাই বলে কাব্য-মাত্রই দুর্নীতি-দূষিত এরূপ মন্তব্য সমীচীন নয়। "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" নাটকের উপরই কালিদাসের কবিযশঃ প্রতিষ্ঠিত, ঋতুসংহারের উপর নয়; রামপ্রসাদের খ্যাতি তাঁর ভাবগভীর শ্যামাসঙ্গীতগুলির জন্য, বিদ্যাসুন্দরের জন্য নয়; ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর বিশেষ পরিচিত হ'লেও তাঁর কবি-গৌরব কামাত্মক বর্ণনাগুলির মধ্যে কখনই নিহিত নেই। সেক্সপীয়রের 'ওথেলো', 'হ্যাম্‌লেট্' ছেড়ে 'ভিনাস্ ও এডোনিস্' কে কবে পড়ে? অবশ্য স্থায়িভাবের উপজীব্য রসটীকে ফুটিয়ে তুলতে হ'লে সেই ভাবের খুঁটিনাটিগুলিরও উল্লেখ অনেক সময়ে অপরিহার্য্য হ'য়ে পড়ে—কিন্তু সত্যকার শিল্পী যিনি তিনি কখনই এমনভাবে সেগুলির প্রকাশ করেন না যা'তে সেইগুলির উপরই বিশেষ ক'রে আমাদের দৃষ্টি পড়ে এবং সমগ্রের সংহতি ও সুষমার দিক্ থেকে আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হই। গ্রীসের মর্ম্মর-মূর্ত্তিগুলি অধিকাংশই নিরাবরণ, তাই ব'লে আমাদের দৃষ্টি কি খণ্ডের দিকেই আকৃষ্ট হয়, না নারী-বা-নর-রূপের অখণ্ড সুষমাই আমাদের মুগ্ধ করে? বিদ্যাপতি প্রভৃতির পদে অনেকে নীতিবিগর্হিত ভাবের সন্ধান পান; কিন্তু বিশেষ ক'রে সেই 'স্খলিত' পংক্তি-গুলির লোভেই কি আমরা তাঁদের কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত হই, না তাঁদের কবি-প্রতিভার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে—এমন কিছু অনির্ব্বচনীয়তা আছে যার জন্যে এই সকল প্রেমিক কবির লীলানিকুঞ্জে প্রবেশ ক'র্‌তে আমরা বাধ্য হই? দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির বর্ণনাপ্রসঙ্গে বিদ্যাপতি লিখেছেন;—

কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।
চরণ-চপলগতি লোচন লেল।

অব সবখনে রহু আঁচরে হাত।
লাজে সখীগণে না পুছয়ে বাত।
শৈশব যৌবন উপজল বাদ।
*　　*　　*
কেও ন মানয়ে জয় অবসাদ।
*　　*　　*
দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন।
আবে মদন বঢ়ায়ল দীঠ।
শৈশব সকলি চমকি দেল পীঠ ॥ ইত্যাদি

রাধারাণীর এই যে অপরূপ রূপবর্ণনা, এ এমন সজীব, এমন প্রাণময়ী যে প'ড়তে প'ড়তে মনে হয় যেন সেই মুকুলিকা দেবীরূপিণী তরুণী আমাদের চোখের সামনে চপল-মন্থর চরণে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 'পয়োধর', 'নিতম্ব' প্রভৃতি দু একটা শব্দ আছে ব'লে বাস্তবিকই আমাদের চিত্তে কোন বিক্ষোভ উপস্থিত হয় কি ? 'যৌবনের অঙ্কুর কিছু কিছু উৎপন্ন হ'ল। বালিকা-সুলভ চরণ-চাঞ্চল্য দূর হ'ল, কিন্তু তার বদলে দেখা দিল যুবতী-জনোচিত অপাঙ্গের চঞ্চলতা।' প্রথম দুটি চরণেই যখন এই অপূর্ব্ব সুন্দরভাবের ইঙ্গিত পাই তখন কবির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা কি স্বতঃই নত হয় না। তবে পাপকে মধুর ও লোভনীয় করবার জন্যই যেখানে আপত্তিজনক শব্দ ও ভাবের অবতারণা সেখানে সমর্থন করবার কিছুই নেই এবং সেই শ্রেণীর সাহিত্য চিরকালের সিংহাসনে স্থান পেয়েছে বা পাবে এমন বিশ্বাসও আমাদের নেই।

শিল্পের উদ্দেশ্য আনন্দ দেওয়া—সু অথবা কু, কোনরূপ নীতিপ্রচার করা নয়, আজকালকার অনেক বিশিষ্ট সমালোচকই এ কথা ব'লে থাকেন। তাঁরা "শিল্পের জন্যই শিল্প" এই মতবাদের ব্যাখ্যাতা! এ বিষয়ে কিন্তু কোন পূর্ব্বতন পাশ্চাত্ত্য মনীষী একটি বড় সুন্দর কথা ব'লেছেন। তাঁর মতে কাব্যের চরম

উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষা দান, কিন্তু সেই শিক্ষা দেওয়া চাই আনন্দের মধ্য দিয়ে। ডাঃ জন্‌সনের মতে ইউরিপিডিসের প্রত্যেক কথাই এক-একটি উপদেশ এবং সেক্সপীয়রের সমগ্র গ্রন্থাবলী অনুসন্ধান করলে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সূত্রসম্বলিত একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হতে পারে। অথচ ইউরিপিডিস্ অথবা সেক্সপীয়রের কাব্য আলোচনা করলে প্রথমেই কিছু তার নীতির দিকটা আমাদের চোখে পড়ে না। আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে যে শিক্ষা তা আমাদের যত হৃদয়গ্রাহী হয়, কাটা-ছাঁটা নীরস নীতিকথা কখনো সেরূপ হয় না। কাব্য অজ্ঞাতসারে আমাদের আত্মাকে ঊর্দ্ধলোকের দিকে নিয়ে যায়, ধূলিমলিন ধরণীর কলুষস্পর্শ থেকে আমাদের শুদ্ধ ও শাশ্বত শান্তির রাজ্যে পৌঁছে দেয়। কাব্যের মধ্যে নীতোপদেশ থাকা উচিত কি না সে প্রশ্ন অনাবশ্যক। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে কাব্যের গহন অতলতায় অবগাহন করে নীতির মাণিক্য যে অনেকে আহরণ করে থাকেন সে-বিষয়ে সংশয় নেই। বস্তু-তন্ত্রতার দিক থেকে এ হিসাবেও কাব্যের মূল্য খানিকটা আছে।

আমরা জানি, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনস্বী এবং ওজঃশালী পুরুষেরাও কাব্যের যথোচিত সমাদর ক'রে গিয়েছেন। মাসিদনপতি সিকন্দর শিবিরে অবস্থানকালেও সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে মূল্যবান রজত-পেটিকায় হোমরের কাব্য-গ্রন্থ রাখতেন এবং রাত্রিতে উপাধানের নীচে রেখে শয়ন করতেন। কোয়েবেক্ যুদ্ধের পূর্ব্বদিন সায়াহ্নেও জেনারেল উল্‌ফ্ গ্রের 'এলিজি'র আবৃত্তি শুনে বলেছিলেন, "ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার চেয়ে এইরূপ কবিতার রচয়িতা হওয়ার সৌভাগ্যকে আমি অধিকতর বরণীয় মনে করি।" অথচ যোদ্ধা-হিসাবে উভয়েরই খ্যাতি ছিল বিপুল ও সুদূর-প্রসারী। কবি-প্রতিভার রক্তচরণে জগজ্জয়ী বীরের এই যে আযচিত শ্রদ্ধাঞ্জলি, কাব্যের উপযোগিতা-সম্বন্ধে এর চেয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হ'তে পারে?

রহস্যবাদ ও রবীন্দ্রনাথ

মানুষের চারিদিকেই বস্তু-জগতের কঠিন বন্ধন। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের স্বর্ণ-পিঞ্জরে সে এমন করে' বাঁধা পড়ে গেছে যে একে বাধা বলে' আর সে মনেই করে না। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রচুর আয়োজন তার ভোগ-লিপ্সাকে দিয়েছে বাড়িয়ে, তার আত্মচেতনাকে রেখেছে মুমূর্ষু করে'। ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে ইন্দ্রিয়জনিত সুখকেই সে চরম সুখ বলে' ভুল করেছে,—তার সকল চেষ্টা তাই, দিনের পর দিন, ঘুরেছে কেবল এই সংকীর্ণ পরিধিরই চারিপাশে,—জুগিয়েছে তার লালসার বহ্ন্যুৎসবে ভোগতৃপ্তির নব নব ইন্ধন। অমৃতলোকের অধিবাসী মানুষ তার শাশ্বত স্বাধীনতাকে ভুলে পরাধীনতার নিগড়ে দিয়েছে ধরা। অথচ এর অনৈসর্গিকতার দিকটা তার চোখেই পড়ে না; এমনি হয়। খাঁচার পাখী এমনি করে'ই একদিন আকাশকে ভোলে; উড়ে-চলাই যার স্বভাব, শৃঙ্খলিত-চরণে সন্তর্পণ-পদ-বিন্যাসই হয় তার অভ্যাস। মানুষের অমর আত্মা আজ শৃঙ্খলিত,—তার স্বচ্ছ, নির্মুক্ত দৃষ্টি আজ ভোগ-সুখের আবিলতায় আচ্ছন্ন। দুদিনের খেলাঘরে চিরদিনের মানুষ একি আত্মবঞ্চনার খেলায় উন্মত্ত!

তবুও এই আত্মবিস্মৃত মানুষের মাঝেই মাঝে মাঝে এমন দু'চারজন যুগ-মানবের আবির্ভাব হয় যাঁদের চোখের সামনে থেকে স্বার্থের কালো পরদাখানি গেছে খসে'—যাঁদের অনুভূতির স্বচ্ছ দর্পণে বিম্বিত হ'য়েছে দূরলোকের দুর্লক্ষ্য আলোক। *

এই সসীম বস্তু-লোকের মধ্যে থেকেও তাঁরা অনুভব করেছেন সীমাহীনের

---

* Great men are, as it were, 'inspired texts' of the great book of revelation, perpetually interpreting and unfolding in various ways the god-like to man.—Carlyle

বৈদ্যুত স্পন্দন। সেই নিগূঢ় তরঙ্গ-কম্পনে তাঁদের অন্তরাত্মা হ'য়েছে উদ্বেল—সেই দুর্বার আবেগ গৈরিক স্রাবের মত যুগে যুগে মানুষকে দিয়েছে আত্ম-চেতনার অগ্নি-বাণী!

প্রাচ্যের ঋষিরা প্রথম দেখেছিলেন বহুর মধ্যে একের রূপ—রূপের মাঝে অরূপের লীলা। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—এ বেদেরই বাণী (অথর্ববেদ ৯।৫।১০)। উপনিষদ্ পুনঃপুন ব'লেছেন 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' *সেই আত্মতত্ত্ব-লাভের গোপন রহস্য নিহিত আছে বহির্বিশ্বকে স্থূল জ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে না দেখে, ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে দেখার মধ্যে। ⁜ আমরা চোখ দিয়ে যা দেখি, মন দিয়ে তার মর্মগ্রহণ করি; কিন্তু মনেরও গভীরে যে আত্ম-চৈতন্য বিরাজিত আছে তার দেখাই ঠিক দেখা—সে-দেখায় কোন আড়াল নেই, কোন সংস্কারের বাধা নেই;—তাই বিশ্ব-রহস্যের স্বরূপটী উদ্‌ঘাটিত হয় তার সামনে, থাকে না কোন সংশয়ের আবরণ। এই আত্মাই জ্ঞাতা অথবা দ্রষ্টা এবং তিনি যা দেখেন তাই দর্শন। এই দিব্যদর্শন যাঁর হ'য়েছে তিনিই জানেন জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বরূপত অভিন্ন। তবে এই ভিন্নতা-বোধের হেতু কি? ইন্দ্রিয়ানুরক্তি অথবা অবিদ্যা মাঝখানে থেকে এই অলোক-দৃষ্টিকে করেছে আবৃত। তাই বিষয়-বাসনায় উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে আমরা প্রেয়ের পিছনে ছুটে বেড়াই, সত্য ও শ্রেয়ের সহজ পথ ছেড়ে মিথ্যার গোলকধাঁধায় ঘুরে মরি (কঠ ১।২।২, নৈঃ ৯১)। দিব্যলোকের রহস্যদ্বার খুলে যায় তখনই যখন আমরা অসংশয় শ্রদ্ধার পথে করি সত্যের সন্ধান। এ বড় মজার

* তৈত্তিরীয় ২ বল্লী।

⁜ ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞান-প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥
মুণ্ডক ১।৩।৮

পথ, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের সাধনা—জ্ঞানের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসের নয়। এই শ্রদ্ধাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মর্মরস। *

বেদান্ত-ভাষ্যে কিন্তু আচার্য শংকর এই বস্তু-বিশ্বকে মায়া এবং ব্রহ্মানুভূতির অন্তরায় বলে' বর্ণন করেছেন। তাঁর মতে অন্ধকার-পথে চল্‌তে সাম্‌নে রজ্জুখণ্ড দেখে সহসা সাপ বলে' যেমন আমাদের ভ্রম হয়, তেমনি মায়াধীন জীবও এই অসত্য, অনিত্য জগৎকে সত্য ও শাশ্বত বলে' ভুল করে। উপনিষদ্‌ এবং তৎপূর্ববর্ত্তী সাহিত্যে মায়া এবং অবিদ্যা শব্দের প্রয়োগ আছে প্রচুর, কিন্তু শব্দদুটী শংকরধৃত অর্থে গৃহীত হ'তে পারে কিনা এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। ঋগ্‌বেদের মধ্যেই বহুস্থলে 'মায়া' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সায়ণ প্রায় সর্বত্রই শব্দটিকে 'অলৌকিক ইচ্ছাশক্তি' অর্থে গ্রহণ করেছেন। প্রশ্নোপনিষদের ১।১৬ শ্লোকে †'মায়া' শব্দটি স্পষ্টতই বঞ্চনা অর্থে প্রযুক্ত হ'য়েছে। বৃহদারণ্যকের ২।৫।১৯ শ্লোকে শব্দটির অবিসংবাদিত অর্থ 'সৃজনী শক্তি'। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তিনটি শ্লোকে (১।১০, ৪।৯ ও ১০) প্রসঙ্গক্রমে পাঁচবার মায়া এবং মায়ী শব্দের উল্লেখ আছে; শব্দটির তাৎপর্য সম্বন্ধে এইখানেই সামান্য একটু খট্‌কা বাধে। 'ভূয়শ্চান্তে বিশ্ব-মায়া-নিবৃত্তিঃ' এবং 'যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ' ইত্যাদি পংক্তিতে সন্দেহ হয় বুঝি বা শংকর-ধৃত অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হ'য়েছে। পরবর্ত্তী শ্লোকেই কিন্তু আমাদের এই সংশয়ের নিরসন হয়।

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ। ৪।১০ শ্বেত উঃ

মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলে' জান্‌বে। তাঁরই মূর্ত্তিসমূহের

---

* আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসংগোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥ ভ. র.

† তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো
ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চেতি ॥

দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত ; * অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে রূপের যে বিচিত্র প্রকাশ আমরা দেখি সেই বৈচিত্র্যের মূলে আছেন মায়াধীশ মহেশ্বর। সুতরাং মায়া অর্থাৎ প্রকৃতি আত্মানুভূতির অন্তরায় ত নয়ই, বরং তার প্রকৃষ্ট আঙ্গিক। কিন্তু বহির্বস্তু যাঁর দৃষ্টিতে ব্রহ্মনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তারূপে প্রতিভাত তিনি অবিদ্যার বশীভূত। 'মীয়তে অনয়েতি মায়া'—দেশকাল অথবা নিমিত্তের দ্বারা পরিমিত অর্থাৎ খণ্ডিত ক'রে দেখাই মায়া। উপনিষদ্ বলেছেন, অবিদ্যার উপাসক এইরূপ ব্যক্তি ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। † 'ভূমা কি' নারদের এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মবিত্তম সনৎকুমার বলেছেন, 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যদ্ বিজানাতি তদল্পম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্, অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্।' যখন আমরা 'ধাম্না স্বেন' অর্থাৎ সংশয়রহিত বুদ্ধির আলোকে কুহকমুক্ত হ'য়ে যা কিছু দেখি, শুনি বা জানি তাকেই পরমাত্মার দ্বারা অধিষ্ঠিতরূপে অনুভব করি তখনই আমরা ভূমা অর্থাৎ অমৃতকে লাভ করি ; আর যখন আমাদের দর্শন, শ্রবণ এবং জ্ঞান ব্রহ্মনিরপেক্ষ ও বিচ্ছিন্ন হয় তখনই আমরা ক্ষুদ্র ও ক্ষণিকের উপাসনায় নিরত হ'য়ে মরণকে বরণ করি। ‡ এই অল্পাশ্রয়ীরাই অবিদ্যার দাস। সুতরাং অবিদ্যার অর্থ দৃষ্টির অপূর্ণতা, শঙ্কর-ব্যাখ্যাত মায়া বা প্রপঞ্চ নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-স্মৃতিতে বলেছেন, 'একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোক-রশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ, বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম।'

উপনিষদে অথবা বেদান্তসূত্রের মূলবচনে মায়াবাদের স্বীকৃতি আছে কি না এ নিয়ে সুধীগণের মধ্যে বাদানুবাদের অন্ত নেই। ডাঃ থিব তাঁর

---

* যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ
স্বভাবতো দেব একং স্বমাবৃণোৎ। শ্বেত ৬।১০

† ছান্দোগ্য ৭ম প্রপাঠক ‡ নৈবেদ্য—১৭

বেদান্তসূত্রের অনুবাদের ভূমিকায় বলেছেন,—প্রাচীন উপনিষদ্ অথবা বেদান্ত-সূত্রে জীবজগতের অনিত্যতা আদৌ কল্পিত হয় নি। সুতরাং সূত্রোক্ত সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণার মধ্যে যে ব্যবধান প্রতীয়মান হয়, তার নিরসনকল্পে পরবর্তী কালে আচার্যপাদ শঙ্করকর্তৃক এই মায়াবাদ উদ্‌ভাবিত হ'য়েছিল। বস্তুত, সবিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম দু'টি পৃথক্ সত্তা নয়—আমরা দুটি পৃথক্ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে কখনও তাঁর উপরে করি উপাধির আরোপ, আবার সমাহিত অবস্থায় কখনও বা তাঁকে গুণাতীত চিন্মাত্ররূপে অনুভব করি। উপনিষদেও ব্রহ্মের দুটি বিভাবই উপদিষ্ট হ'য়েছে—'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে' (বৃহদারণ্যক ২।৩।১), 'এতদ্ বৈ সত্যকাম পরম্ অপরঞ্চ ব্রহ্ম' (প্রশ্নোপনিষদ্ ৫।২)। নির্গুণ ব্রহ্মকে নিয়ে প্রেমিকের কোন কাজ নেই। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরও গুণাতীত নন; তিনি 'সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ (ছান্দোগ্য ৩।১৪।২), তাঁকে তিনি কাছে পান, ভালবাসেন, সঙ্গোপনে তাঁর সঙ্গে তাঁর কান্নাহাসির কত ছায়া-আলোর খেলা চলে। উপনিষদের যে যে অংশে এই সবিশেষ ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আছে, সেই সকল অংশই তাঁকে বিশেষরূপে অনুপ্রাণিত ক'রেছে।

আচার্য শংকরের মায়াবাদ ব্যাখ্যার পরে দাক্ষিণাত্যে আর একটি মতবাদ মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়েছিল; এর নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, আচার্য রামানুজ এর প্রবর্তক। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্যগণ প্রায় সকলেই এই মতবাদের পোষক। এই মতানুসারে ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ এবং সর্বকল্যাণময়। জীবাত্মা সকল ব্রহ্মের অংশ, জগৎ ব্রহ্মের শক্তির বিকাশ, সুতরাং সত্য। জীবাত্মা ও জগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন হ'য়েও ভিন্ন নয়। প্রদীপ্ত পাবকের সঙ্গে বিস্ফুলিঙ্গের যে সম্বন্ধ, ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধও সেইরূপ।* প্রভা থেকে যেমন প্রভাকর

* যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি। মুণ্ডক ২।১।১

বড়, জীব থেকেও তেমনি ঈশ্বর অনেক মহৎ। বৃক্ষ যেমন বৃক্ষরূপে এক, কিন্তু শাখারূপে নানা, ব্রহ্মও তেমনি ব্রহ্মস্বরূপে এক, আবার জগদ্রূপে নানা।

বস্তুত, উপনিষদের বহ্বায়তক্ষেত্র সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদের দুটি সমান্তরাল ধারায় তুল্যরূপে উপপ্লুত। কখনও ব্রহ্ম নির্বিশেষ—'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' (কঠ ১।৩।১৫), আবার কখনও বা তিনি 'মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ' 'প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ,' 'রসো বৈ সঃ'।* সেই ভূমাই রস অথবা একমাত্র আস্বাদের বস্তু। জ্ঞানভক্তিহীন অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না—প্রেমের পরম মূল্যে তাঁকে পেতে হয়। 'যে দেবতা অনলে, যিনি সলিলে, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে,—এককথায়, যিনি বিশ্বভুবনে অনুপ্রবিষ্ট' সেই দেবতাকে ঋষি বারবার তাঁর নমস্কার জানিয়েছেন। শ্বেত ২।১৭, নৈ ৫৭।

শংকরপন্থী অদ্বয়বাদীর মতে যে বস্তু-জগৎ প্রপঞ্চমাত্র এবং ব্রহ্মানুভূতির ঘোর অন্তরায় উপনিষদের ঋষি সেই দৃশ্যমান প্রকৃতিকে তার স্থূল মায়িক সত্তা থেকে পৃথক করে' আনন্দ-ঘন রসরূপে উপলব্ধি করেছেন। সমগ্র বিশ্ব তাঁর চোখে সেই অজ্ঞাত জ্যোতির দ্বারা অনুবিদ্ধ—'তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি' (কঠ ২।২।১৫)।

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ভাগবত ১১।২।৪৫

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ প্রকাশে। চৈ চরিতামৃত।

*রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। (তৈত্তিরীয় দ্বিতীয় বল্লী)

তোমারে বলেছে যারা পুত্র হ'তে প্রিয়,
বিত্ত হ'তে প্রিয়তর, যা কিছু আত্মীয়
সব হ'তে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে,
আত্মার অন্তরতর,—তাঁদের চরণে
পাতিয়া রাখিতে চাহি হৃদয় আমার। নৈ ৭৯

"হে রাজন্, যিনি চেতন ও অচেতন সর্বভূতে অধিষ্ঠিত আত্মাকে শ্রীভগবানের আবির্ভাবরূপে উপলব্ধি করেন এবং যিনি স্বচিত্তে স্ফুরিত শ্রীভগবানে ভূতসকলকে দর্শন করেন তিনি ভাগবতোত্তম।" নিমির প্রতি হরিযোগেন্দ্রের এই উক্তিতে আমরা শ্রৌত বাণীরই প্রতিধ্বনি পাই। আবার এরই ভাষারূপ দেখি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর কৃষ্ণের স্ফুরণ॥

ধ্যানী কবি কোলরিজের 'Frost at Midnight' শীর্ষক কবিতার মধ্যেও আমরা অনুরূপ সুরেরই ঝংকার শুনি,

'So shalt thou see and hear
The lovely shapes and sounds intelligible
Of that eternal language, which thy God
Utters who from eternity doth teach
Himself in all and all things in himself.'

সুতরাং সৃষ্টিকে স্রষ্টা থেকে পৃথক করে' দেখ্‌লে চল্‌বে না—জগৎকে মায়া বলে' উড়িয়ে দিলে ভুল হবে। এই সংসারকে আত্ম-সাধনার পরিপন্থী মনে করে' যিনি দুর্গম গিরি-গুহায় ধ্যান-সমাধির দ্বারা নিঃশ্রেয়স-লাভে উৎসুক তিনি ভ্রান্ত। 'সগুণ ঈশ্বরের ও অক্ষর ব্রহ্মের উপাসক, এই দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?' শুশ্রূষু অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলেছেন—

'ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥" গীতা ১২।২

অর্থাৎ 'যাঁরা আমাতে মন নিবেশিত করে' এবং সর্ব্বদা আমাতে সংযুক্ত হ'য়ে পরম শ্রদ্ধার সহিত আমার সগুণ স্বরূপের উপাসনা করেন তাঁরাই আমার

অভিমত এবং যোগবিত্তম।' কিন্তু এই ব্রতসাধনার জন্য চাই নিষ্কাম কর্মের অনুশীলন, ভগবচ্চরণে একান্ত শরণাগতি। রবীন্দ্রনাথও ভক্তিকম্পিত-কণ্ঠে বলেছেন,

'বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।'
—গীতাঞ্জলি।

নৈষ্কর্ম্যের সাধনা তাঁর নয়; তাই তিনি বলেছেন, 'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।' 'কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হ'য়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে।' সংক্ষেপে এই হ'ল কবির জীবন-দর্শন। এই ভারতের পুণ্য তপোবন থেকেই একদিন আসক্তিহীন কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ উদ্‌গীত হ'য়েছিল। 'ভক্তেরে শিখালে তুমি যোগযুক্তচিতে সর্ব্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।*যে কর্মবৃত্তিগুলি আমাদের সহজাত, তাদের অস্বীকার না করে অঙ্গীকার করে' নেওয়াতেই মানুষের মনুষ্যত্ব। কারণ সেগুলিকে বাদ দিলে জীবনকে খণ্ডিত করা হয়—তার সংহত বিকাশ বাধা পায়। তাই শ্রুতির উপদেশ—'ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর' 'নিরূপিত কর্ম সম্পাদন করে' শতায়ু হবার কামনা কর, কারণ এই নিস্পৃহ কর্মানুষ্ঠান মানুষকে সংসারে লিপ্ত করে না। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। (ঈশ ২)

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।।' ঈশ ১১

অর্থাৎ যে লোক জানে যে বিদ্যা ও অবিদ্যার অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের একত্র অনুষ্ঠান হ'তে পারে সে অবিদ্যার দ্বারা মর্ত্যভাব অতিক্রম করে' বিদ্যা দ্বারা দেবভাব লাভ করে। কুরুক্ষেত্রের পুণ্য সমরাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রণ-বিরক্ত পার্থকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব'লেছেন,—

আপূর্য্যমাণমচল-প্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।।

---

* যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।। গীতা—৯।২৭

'যেমন নদীজল অচলপ্রতিষ্ঠ, পরিপূর্ণ সমুদ্রকে বিচলিত না করেই তার মধ্যে প্রবেশ করে তেমনি ভোগাদি যে ব্যক্তিকে কখনও বিচলিত করে না সেই প্রকৃত শান্তির অধিকারী হয়। ভোগলিপ্সু এই সুখ হ'তে বঞ্চিত।' জীবন যুগপৎ ধ্যান ও কর্ম্ম, স্থিতি এবং গতি, চলার মাঝে মাঝে বিরাম; শুধু থেমে-থাকাই তার ধর্ম্ম নয়। তাই গীতার মধ্যে আমরা পাই এই দুয়ের অপূর্ব সমুচ্চয়। রবীন্দ্রনাথও বৈষ্ণবের অনুভূতিময়, ভাবগদ্‌গদ ভক্তির চেয়ে এই বীর্যগর্ভ ভক্তিকেই উচ্চতর আসন দিয়েছেন। (নৈবেদ্য ৪৫)

পাশ্চাত্ত্যে প্লেটোর দর্শনের মধ্যেই আমরা সত্যোপলব্ধির প্রথম ইঙ্গিত পাই। তাঁর দৃষ্টিতে এই রূপ-জগৎ মায়া নয়। এ শুধু আছে তাই নয়, এ ভাবের সমকালীন—এ চিরন্তন। অসত্তার গর্ভ থেকে প্রসূত হ'লেও সৃষ্টি অসত্য নয়, ভাব-সত্যের কল্যাণময় অভিপ্রকাশ। অনাদি, অবিকৃত আদর্শ এই ভাব, বিষয়াদি এর অসম্পূর্ণ অনুকৃতি। প্লেটো আরও বলেছেন, রূপ-সৌন্দর্য্যের সোপান বেয়েই আমরা অরূপ-সৌন্দর্যের অমরাবতীতে উত্তীর্ণ হই। তাঁর মতে এই উপলব্ধি এক হ'তে দুয়ে এবং দুই হ'তে ক্রমে বহুতে বিসারিত হয়; এই বহুরূপের অনুবোধ আমাদের জীবনের অভ্যাসগুলিকে একটি শৃঙ্খলার সৌন্দর্যে গেঁথে তোলে—রূপ তার কায়া থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে অমূর্ত ভাবের মায়ায় মনকে ভ'রে রাখে, বস্তুরূপে বহুতে সঞ্চারিত হ'য়ে ভাব-রূপে আবার ফিরে আসে একে। এই একীভূত ভাব-সৌন্দর্যকে তিনি তাঁর 'সিম্‌পোজিয়ামে' বলেছেন '**Beauty absolute**'। এই মতবাদ পরবর্তী কালে প্লোটিনাসের দ্বারা সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়ে রহস্যতত্ত্বের প্রকৃত মর্মোদ্‌ঘাটন করেছে। প্লোটিনাসের মতে ঈশ্বর কোন বাহ্যবস্তু নয়, তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা। * কোন বিশেষ স্থানে তিনি

---

*একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ কঠ ২।২।১২

নেই ; যখনই আমাদের অন্তর উন্মুখ হয় তাঁকে পাবার জন্যে, তখনই আমরা সেই চৈতন্যময়ের স্পর্শ অনুভব করি আমাদের মর্মতন্ত্রীতে। জীবনের দ্বন্দ্ব অথবা অন্তবিপ্লবের মূলে আছে অপ্রত্যয়। জীবের অন্তরবিহারী এই আত্মার অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস সুদৃঢ় নয়। যত সংশয়, ততই বিরোধ। প্রেমের প্রশান্তি ও গভীরতার মধ্যেই জানা যায় সেই পরম-সত্তাকে—বহির্বিশ্বের বিরোধ ও বিক্ষেপের মধ্যে নয়। এই বিশ্ব-ব্যাপার একটি বিরাট ও জটিল যন্ত্রের মত, এর কেন্দ্রস্থলে পরমাত্মার অধিষ্ঠান ; তাঁর হৃৎপদ্ম থেকেই হ'য়েছে সমুদয় সান্ত বস্তুর উদ্ভব, এবং অন্তে তারা সেইখানেই যাবে ফিরে। এই প্রাণ-উৎস একবার তার শক্তিকে বহুধা বিভক্ত করে, অবার অবিভাজ্য একত্বে হয় লীন। প্লোটিনাসের মতে 'একের' অভিপ্রকাশ ত্রিবিধ ; অতি-মন (over-mind), মন ও আত্মা। অতি-মন অর্থে চিন্ময় সত্তা, মন সেই চিন্ময়ের ভাব-বিগ্রহ, আত্মা চৈতন্যরূপে সৃষ্টির অণুপরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট। অতি-মনের মত আত্মারও কোন বস্তু-সত্তা নেই, তবে বস্তু-জগতের উপর এর প্রভাব বিক্ষিপ্ত হয়। জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সংযোগ-তন্তুটি যোজনা করে এই আত্মা। সর্বেশ্বরবাদের ভিত্তির উপর স্থাপিত হ'লেও এর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে আত্মা রূপ-লোকের স্রষ্টা হ'য়েও সৃষ্টি-সীমার মধ্যে নিজেকে নিঃস্ব করেন নি—বিশ্ব-পরিদৃশ্যের বাহিরে তাঁর একটি বিশ্বাতিগ তুরীয় সত্তা আছে। এই অধ্যাত্ম-চেতনার উদ্‌বোধের জন্য আবশ্যক চিত্ত-শুদ্ধি, বিষয়-সাধনায় চিত্তের নির্লিপ্ততা, অধ্যাত্ম আস্বাদের তীব্র অধিস্পৃহা এবং সর্বশেষে কর্ম, চিন্তা ও চেতনাকে সমীকৃত করে' একটি কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিফলিত করা। এই প্রজ্ঞান বা প্রতিবোধের (illuminative life) পরে আসে জীব-ব্রহ্মের একাত্মতা বা অভেদ-দর্শন (Unitive life)। * Reasoning soul অথবা

* "It is absolute knowledge founded on the identity of the mind knowing with the object known"—Vaughan's 'Hours with the Mystics.' P 64.

তর্কবুদ্ধির দ্বারা এই একাত্মতার উপলব্ধি হয় না, intellectual soul অথবা ধ্যানদৃষ্টির দ্বারাই এই দিব্যদর্শন সম্ভব হয়।

ব্যক্তি-মনের সহিত বিশ্ব-মনের এই যে আত্মীয়তা, ধ্যান-লোকে অমূর্তের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার এই যে আনন্দ—এ'ই পরবর্তী যুগের সমগ্র য়ুরোপীয় রহস্য-সাহিত্যের মর্মস্নায়ু। প্লোটিনাসের এই অধ্যাত্মবাদের দ্বারা পরবর্তী যুগের খৃষ্টধর্ম বিশেষ প্রভাবিত হ'য়েছিল। এর পর যখন প্রাচ্য অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে খৃষ্টীয় মতবাদের মিশ্রণ হ'ল তখন তার থেকে উদ্ভূত হ'ল এক অভিনব দার্শনিক তত্ত্ব। গ্রীকদের সুস্পষ্ট প্রবণতা ছিল প্রদীপ্ত বাস্তবতার দিকে; প্লেটোর মধ্যেও আমরা বাস্তব সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে দিব্য সৌন্দর্যের আস্বাদের কথাই পাই। অপিচ, প্রাচ্য অধ্যাত্ম-দর্শনে, বিশেষত ভারতীয় অদ্বৈতবাদে, বস্তু-নিরপেক্ষ, বিশুদ্ধ আত্মোপ-লব্ধির তত্ত্বই পাওয়া যায়; সেখানে রূপ অরূপের প্রতীক নয়, বরং তার প্রতীপ। এই সাধনা অন্তর্মুখী; ভারতীয় সাধক "ধ্যান-যোগে এই দেহেই আত্মার দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন' (ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা)। খৃষ্টানধর্ম অবতারবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পরমপিতা ঈশ্বর সেখানে আপনাকে মর্ত্য মানব-রূপে প্রকাশিত করেছেন; সুতরাং মানুষের দেহ, তার প্রেম, তার বিবিধ সম্বন্ধগুলি খৃষ্ট-ভক্তের চোখে নিরতিশয় পবিত্র ও সুন্দর। তাই পাশ্চাত্ত্যের মিস্‌টিক্ সাধনা কেবল অন্তর্দৃষ্টি নয়, মানবীয় সম্বন্ধের প্রতীকতা ও পবিত্রতার উপরও বিশেষ জোর দিয়েছে। বলা বাহুল্য, এই প্রণালীর চিন্তা ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রেও বিরল নয়; ভক্তিবাদী রামানন্দ এবং সাধক-কবি কবীর মানুষকেই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশরূপে স্বীকার করেছেন। এই ভক্তিবাদ ক্রমশ সারা ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছে। বাঙ্‌লাদেশের কবিদের মধ্যে জয়দেবই প্রথম এই প্রেমতত্ত্বের মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁ'র অমরকাব্য গীত-গোবিন্দে মানবীয় প্রেমসম্বন্ধের মধ্য দিয়ে ঐশী উপলব্ধির অনুপম আলেখ্য অংকন ক'রেছেন। মহাপ্রভুর সহিত রামানন্দরায়ের সংলাপে * পরকীয়া-প্রেম-সাধনাই সাধন-মার্গের

* এই পরকীয় প্রেমতত্ত্বের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঋগ্‌বেদের একটি বচনে: 'যোষা জার

শ্রেষ্ঠ স্তর ব'লে স্বীকৃত হ'য়েছে। উজ্জ্বলনীলমণির মতে "অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ।' শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ রতির মধ্যে" একমাত্র মধুরেই লীলার পূর্ণ মাধুরী পরিস্ফুট। শান্ত-রতি জ্ঞানমিশ্রা, সুতরাং মমতাগন্ধবর্জিত। নির্গুণ ব্রহ্মানুভূতি যখন সগুণ ঈশ্বরানুভূতিতে পর্যবসিত হ'য়ে ভক্তির ভূমি স্পর্শ করে তখন সেই পরানুরক্তিকে 'শান্ত' নাম দেওয়া হয়। বস্তুত, শমভাব-প্রধান অনুভূতি আদৌ রতি নামে অভিহিত হ'তে পারে কিনা সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। প্রেমধর্ম স্বরূপত আবেগোত্থ; চিন্ময় পরব্রহ্ম যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর্লোকে আনন্দময় বিগ্রহরূপে অনুভূত ও আকারিত না হন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁ'র প্রতি মমত্ববুদ্ধি আস্‌তে পারে না। তাই শান্তরতিকে প্রেমসাধনার নিম্নতম স্তর ব'লে নির্দেশ করা হ'য়েছে। "দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্র-সহযোগে হরি-লীলাকথা গান ক'র্‌লে ব্রহ্মানুভবী সনকেরও শরীরে কম্প উপস্থিত হ'লো।" শান্তরতিপ্রসঙ্গে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে শ্রীশুকদেবরচিত এই শ্লোকটি উদাহৃত হ'য়েছে। কিন্তু এই আবেগকম্প তো শমভাবের বিপরীত, সমাহিতচিত্তের ভাবস্থৈর্য বিচলিত না হ'লে তো বেপথুর উৎপত্তি সম্ভব নয়। অভেদ ব্রহ্মানুভূতিতে দ্বৈতের স্থান কোথায়? অথচ ভক্তির অর্থই হচ্ছে বিভাগ। লীলা-রসাস্বাদের জন্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত ক'র্‌লেন ;—এই ভক্তের অর্থাৎ সাধকের সাধ্যের প্রতি যে ঐকান্তিক অভিরতি তা'রই নাম ভক্তি। অতএব সাধ্য-সাধকের দ্বৈতকে অঙ্গীকার ক'রে না নিলে ভক্তির কোন অর্থই হয় না। ব্রহ্মবিদের অদ্বৈতানুভূতির আনন্দকে ভক্তি আখ্যা দেওয়া সঙ্গত নয়। বস্তুত, নৈরপেক্ষ্য অর্থাৎ ফলাসক্তিত্যাগই বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রে পরমনিঃশ্রেয়স ব'লে

মিব প্রিয়ম্' (৯।৩২।৫), অর্থাৎ পরকীয়া নায়িকা তার উপপতির প্রতি যেমন আসক্ত হয়, হে সোম, শব্দসকলও তেমনি তোমাকে স্তব করে।

পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার নাহি অন্যত্র প্রকাশ। চৈ. চ.

রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা
ধর্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ।উ. নী.

কীর্তিত হ'য়েছে। 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' না হ'লে কৃষ্ণ-পরিশীলনের অধিকারী হওয়া যায় না। 'প্রোজ্ঝিত'-পদের প্র-উপসর্গের দ্বারা মোক্ষাভিসন্ধি পর্যন্ত নিরস্ত হ'য়েছে। প্রকৃত প্রেম-সাধকের দৃষ্টিতে ভক্তিই ভক্তির চরম অভিপ্রায়, অন্যতর লক্ষ্য এর নেই। উপলক্ষ্য এবং লক্ষ্য, সাধন ও ফল দু'ই ভক্তি; ফলীভূত এই ভক্তিই পরম-পুমর্থ—'ভক্তিরেব ভূয়সী'।

শ্রীদামাদির সখ্য, নন্দ-যশোদার বাৎসল্য সত্যই অপূর্ব, কিন্তু তা'র মধ্যেও 'আত্মেন্দ্রিয়প্রীত-বাঞ্ছা', স্বর্ণে শ্যামিকার মত, কিছুটা মিশ্রিত থাকাতে এই রতিকে 'কেবলা' বলা চলে না। রুক্মিণী-সত্যভামা প্রভৃতি স্বকীয়া নায়িকার প্রেমকে বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে সমঞ্জসা-রতির অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে। সমঞ্জসার বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ সান্দ্রতা অর্থাৎ নিবিড়তার উল্লেখ ক'রেও তা'কে 'ক্বচিদ্-ভেদিতসম্ভোগতৃষ্ণা' এই লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত ক'রেছেন। সমঞ্জসা-রতিতে সম্ভোগেচ্ছা স্বভাবতই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির সহিত একীভূত হ'য়ে থাকলেও, কদাচিৎ পৃথগ্‌ভাবেও পরিলক্ষিত হয়। তা'ছাড়া পত্নীত্বাভিমানহেতু সময় সময় রতির স্থিতিরও বৈলক্ষণ্য ঘটে। পত্নীভাবের উল্লেখে লোকধর্মাপেক্ষিতাই সূচিত হ'য়েছে; অর্থাৎ সহজ প্রাণধর্ম ও লোকধর্মের দ্বন্দ্বে রতির অচল-আসনও বিচলিত হয় এই কথাই এখানে বিবক্ষিত। শ্রীরাধাদি ব্রজবধূদের প্রেমের মধ্যে কিন্তু আত্মসুখাভিসন্ধি বিন্দুমাত্রও নেই।* তাঁরা চেয়েছিলেন কৃষ্ণকে মনে-প্রাণে, অন্তরের সমস্ত আবেগ দিয়ে, প্রতিদানের অপেক্ষা রাখেন নি—অপ্রমেয় প্রেমের প্রেরণায় লৌকিক লজ্জাভয়ে দিয়েছিলেন জলাঞ্জলি। শ্রীরাধা 'কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।' এরই নাম সমর্থা রতি—কারণ কেবল-কৃষ্ণ-সুখ-সাধনই এর একমাত্র লক্ষ্য।†

---

* তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেবং দয়িতং প্রেষ্ঠম্ আত্মানং মনসা গতাঃ।
(উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি) —শ্রীমদ্‌ভাগবতে ১০।৪৬।৩৪

† 'কেবলকৃষ্ণসুখতাৎপর্যরতিঃ পরাঙ্গনাময়ী সমর্থা।' উ. নী.

কি করিলুঁ কিনা হৈল কেন বা সে বাড়াইলুঁ
কি শেল হানিয়া গেল বুকে।
জাতি-কুল-শীল-শিরে বজর পড়িল সই
কানুরে দেখিয়া চোখে চোখে।
রসের মূরতি সে দেখিলে না রহে দে
বাতাসে পাষাণ হয় পাণি।
বলরাম দাস বলে সে অঙ্গ পরশ হ'লে
প্রাণ লৈয়া কি হয় কি জানি।

প্রেমের জন্যই এই প্রেম—প্রেমই এর পথ ও লক্ষ্য। 'উজ্জ্বলনীলমণি'-কার প্রেমার সংজ্ঞা নির্দেশ কর'তে গিয়ে ব'লেছেন,

'সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্‌ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ॥

ধ্বংসের (সহস্র) কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নায়ক-নায়িকার যে পারস্পরিক ভাববন্ধন, অর্থাৎ 'তুমি আমার প্রেয়সী, তুমি আমার প্রেয়ান্' এইরূপ অনুলাপ কিছুতেই প্রপথ বা প্রনষ্ট না হয়, তাকেই প্রকৃত প্রেম আখ্যা দেওয়া যায়। 'যেহেতু সকল দেহীর পক্ষেই আত্মা প্রিয়তম, সেই হেতু স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই জগৎ সেই আত্ম-বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট।* সকল আত্মার আত্মা যিনি সেই কৃষ্ণও জগৎ-কল্যাণের জন্য মায়ার দ্বারা দেহি-রূপ ধারণ করেছেন। সুতরাং গোপীগণের প্রেম-সাধনার মধ্যে দেখি পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার অহেতুক আবেগ ও উৎকণ্ঠা,—বৈরাগ্যদীপ্ত, অনন্যচিত্ত সাধিকার আরতি-প্রদীপের অকম্প জ্যোতি!

---

* যস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহী ভবতি মায়য়া॥
—শ্রীমদ্‌ভাগবতে ১০।১৪।৫২

প্লেটো এবং তাঁর অনুগামী শিষ্য এরিস্টটল্ উভয়েই ঈশ্বরকে প্রকৃতির বহু ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছিলেন। এদিকে স্টোয়িক্ সম্প্রদায় তাঁকে এই জগতের মধ্যেই দিয়েছিলেন মিলিয়ে এবং এই প্রত্যক্ষ জগৎকেই মেনেছিলেন ঈশ্বর বলে'। Neo-Platonist-রা এই দুই মতের একটা সংশ্লেষ আনতে চেষ্টা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা ঐশী সত্তা এবং শক্তির মধ্যে একটা পার্থক্য কল্পনা করলেন। সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মির মত এই ঐশী শক্তি প্রকৃতিরূপে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু উৎস থেকে এরা যতই দূরে সরে' যায় ততই এদের অসম্পূর্ণতা বাড়্তে থাকে এবং পরিশেষে এরা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পদার্থে রূপান্তরিত হয়।* কিন্তু এই শক্তির বিকিরণ সত্ত্বেও ঐশী সত্তা অবিকৃত ও অব্যাহতই থাকে। এই সংশ্লেষের প্রয়াস বিশেষ সফল হ'য়েছে মনে হয় না; তবে এ কথা স্বীকার করা হ'য়েছে যে এই ভাবে উৎপন্ন প্রত্যেক বস্তুরই উৎস-মুখে ফিরে যাবার এবং তার সঙ্গে একীভূত হবার একটা অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকে। কাজেই ব্যষ্টিরূপ সৃষ্টির কোন শাশ্বত প্রকাশ নয়, বিবর্তনচক্রের একটি পর্য্যায়মাত্র।

পারসীক সুফীগণের মধ্যেও এই অতীন্দ্রিয় সাধনার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ স্থলেই রূপকসাহিত্যের কল্পনাবিলাসেই হ'য়েছে তার অভিব্যক্তি। ইস্লামের কঠোর একেশ্বরবাদ ও আনুষ্ঠানিকতার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ারূপেই এর উদ্ভব হ'য়েছিল। খৃষ্টীয় নবম শতকের পরবর্তী কালের পারসীক সাহিত্য একটি স্বাভাবিক সর্বানুভূতির আনন্দে উদ্বেল। কোন কোন সুফী সাধক প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে কোরানের মধ্যেই এই

---

* "Workings of the One and Good as they become more and more separate from their source, the individual spheres become more and more imperfect and change suddenly into the dark evil opposite matter."—History of Philosophy by Windelband. Pp 244-245.

প্রেমধর্মের অংকুর নিহিত আছে। কিন্তু এই উক্তি তেমন যুক্তিসহ মনে হয় না। প্রথম কথা, কোরানের মতে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ, কাজেই এই দুয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ ব্যক্তিসম্বন্ধ কিছুতেই স্থাপিত হ'তে পারে না। দ্বিতীয়ত, ইস্‌লামের ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ প্রভু, মানুষ তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্যের দ্বারা অভিভূত কিংকর। অপরপক্ষে, সুফীর ভগবান্ তার একান্ত আপনার, তার প্রিয়তম দয়িত,—তাঁর সঙ্গে তার নিবিড়-মধুর প্রেমের সম্পর্ক। অবশ্য, একথা স্বীকার্য যে কোরান্ জীবের প্রতি ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরের প্রতি জীবের প্রেমের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন, কিন্তু যে ভাবে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করা হ'য়েছে সেখানে, তা থেকে অনুমান করা কঠিন হয় যে সুফী সন্তগণের প্রেম-ধর্মের ধারণা কোরান্ থেকেই উদ্ভূত। সূচনায়, সুফীবাদের উপর কোরানের প্রভাব হয়তো বা কিছু ছিল, কারণ হিজরার দ্বিতীয় শতকে প্রাচীনতম সুফীবাদের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তার সঙ্গে পরবর্তী কালের সুফীবাদের কোনই মিল হয় না। প্রাচীন তন্ত্রে প্রীতির স্থান অধিকার করেছে ভীতি; মানুষের অন্তর্লীন অপরাধশীলতাকে সেখানে অসংশয়ে বিশ্বাস করা হ'য়েছে এবং এই পাপ-মুক্তির জন্যই জীবনের যা-কিছু আয়োজন। চরম কৃচ্ছ্র-সাধনই এর একমাত্র উপায়; তাই দেখা যায় যে 'তোয়াক্কুল্'-মতবাদী সুফীরা স্বেচ্ছায় ঔষধ, এমন কি আহার্য-গ্রহণেও পরাঙ্মুখ। যদিও এই আবেগ-ধর্মের প্রধান প্রেরণা ছিল ভয়, তবুও প্রেমের সুষমা এর সঙ্গে কিছুটা মিশ্রিত ছিল না এমন নয়। ক্রমবর্ধমান হেলেনীয় প্রভাবের (Neo-platonism-এর) সঙ্গে সঙ্গে এই সুফীবাদও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হ'য়ে গেল, ভয়ের ধর্ম প্রেমের ধর্মে চরিতার্থ হ'ল! 'ঈশ্বর এক' এই জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, প্রকাশ ও প্রমাণের মধ্য দিয়ে তাঁর অস্তিত্বে প্রতীতিও শেষ কথা নয়, জীব-শিবের একাত্ম-দর্শনই সুফীবাদের পরমোৎকর্ষ।

এই মতানুসারে ঈশ্বরই একমাত্র সত্যবস্তু এবং তিনিই নিখিল সৌন্দর্য ও কল্যাণের আকর। জগতে যা কিছু শুভ ও সুন্দর সে সকলই তাঁর অসীম

মহিমার দ্বারা বিদ্যোতিত এবং 'তিনি ছাড়া আর যা-কিছু' (মা সিওয়া আল্লাহ্) তাদের সার্থকতাও শুধু এই কারণেই; অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায় যিনি 'সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি'—সকলকে আবৃত করে' বিদ্যমান, সেই বিভুকে বাদ দিয়ে জাগতিক কোন পদার্থেরই কোন যথার্থ সত্তা নেই। যে সাধক এই অলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জগৎকে দেখেন, বিশ্ব-রহস্যের প্রকৃত মর্মজ্ঞ তিনিই। এই প্রজ্ঞান একটা অপার্থিব রশ্মির মত অন্তরকে করে আলোকিত, দেখিয়ে দেয় তাকে দূর অলকার পুষ্পিত বীথি-পথ। বসোরার সাধনোদ্যানের সুরভিতম গোলাপ, উপাসিকা রাবেয়া, আল্লার চরণে বারবার এই মিনতি জানিয়েছেন যে চিরন্তন সৌন্দর্যের যে-স্বপ্নাঞ্জন তাঁর নয়নে লেগেছে তার আবেশ যেন কোনদিন তাঁর মন হ'তে মুছে না যায়! বুদ্ধির আলোক দিয়ে এই অলোক-দর্শন সম্ভব হয় না—প্রেমের দীপ্র দৃষ্টি দিয়েই একে দেখা যায়। জীবনে নিজেকে যেটুকু হারাই, হৃদয়ের ধনকে ততটুকুই পাই আপন করে'—সংসার থেকে আত্মার বিচ্ছেদ যত পূর্ণ হয়, ঈপ্সিতের মিলনের মুহূর্তটিও হয় ততই নিকট। জাগতিক মোহ-পাশ ও স্থূল দেহাভিমান থেকে জীব যখন একান্ত মুক্ত হয় তখনই সে পায় অমৃতের আনন্দময় অধিকার। এই অবস্থার নাম 'ফনা ফিল্লা'। এই অবস্থায় সাধকের মন লৌকিক হর্ষ-বিষাদ ও ক্ষুদ্র লাভ-ক্ষতির বহু উর্ধ্বে স্থাপিত হয় এবং সেই শাশ্বত দয়িতের প্রতি অনাবিল প্রেমে হয় পূর্ণ। জীবন্মুক্ত ভক্ত ব্যক্তিগত সব স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে আল্লার সহিত একাত্ম হ'য়ে যান। ইস্‌লামের তুরীয় তত্ত্ব সাধ্য ও সাধকের মধ্যে যে দুঃসাধ্য ব্যবধান কল্পনা করে, তা অতিক্রান্ত হ'তে পারে শুধু ঐশী করুণার বলে। ভগবৎকরুণায় গভীর নির্ভর ও স্থির প্রত্যয়ের পুলকে মানুষের অন্তরাত্মা হয় স্পন্দিত—জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের সব পার্থক্য ঘুচে গিয়ে শুধু একত্বের অনির্বচনীয় আনন্দ থাকে জেগে। সুফী সাধনায় এই স্তরের নাম 'ওয়াসেল'; এই অবস্থায় পৌঁছলে 'অন্ অল্ হক্' বা 'অহং ব্রহ্ম' এই উপলব্ধি হয়। অত্তার-রচিত 'মন্‌তিকুত্-তয়ের' অথবা 'পাখীদের সংলাপ' কাব্যে

এই অদ্বয়তত্ত্বটি চমৎকার কবিত্বময় রূপ লাভ করেছে। বিঘ্নসংকুল, বিচিত্র পথ অতিবাহন করে' পাখীরা অর্থাৎ সুফী তীর্থযাত্রীর দল যখন এসে পৌঁছল তাদের কাম্য-লোকে, তখন কৃত পাপ-পুণ্যের সমস্ত চিহ্ন তাদের মন থেকে মুছে গেল এবং সত্য-জ্যোতির সান্নিধ্যে তাদের অন্তরাত্মা উদ্ভাসিত হ'য়ে গেল দিব্য দীপ্তিতে। বিস্ময়ে অবাক্ হ'য়ে তারা দেখ্‌ল যে তাদের এবং সেই সত্য-স্বরূপের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই, তারাই তিনি এবং তিনিই তারা—অবিকল এক।

বৈষ্ণব সাধক অথবা মরমী কবিগণ কিন্তু এই অদ্বয়ের আনন্দে তৃপ্ত হন না, তাঁরা চান সুচির বিরহের অশ্রু-পিছল পথে প্রিয়তমের ক্ষণিক দর্শন। মিলন-লগ্নে স্পন্দমান দুটি বুকের মাঝখানে মৃদু মারুতের ব্যবধানটুকুও তাঁরা সইতে পারেন না; কিন্তু এই সম্ভোগ সম্পূর্ণ না হ'তেই কোথা হ'তে বিরহের মেঘ আসে ঘনিয়ে—অমৃত-স্নাত অন্তরের সেই দীপ্ত মুহূর্তটি যেন কার অলক্ষ্য ফুৎকারে যায় নিভে।* আবার সুরু হয় দীর্ঘ বিরহের পালা। আমার মনে

* বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে এরই নাম 'প্রেম-বৈচিত্ত্য'। উজ্জ্বলনীলমণি এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এইরূপ,—

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥

প্রিয়ের সান্নিধ্যসত্ত্বেও প্রেমাতিশয্যবশে বিচ্ছেদ-বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন যে ব্যাকুলতা তার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য।

"রোদতি রাধা শ্যাম করি' কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর॥"

—গোবিন্দ দাস

সুপ্রসিদ্ধ মরমী কবি জামীর একটি গীতি-কবিতার নিম্নলিখিত অংশটি এই প্রসঙ্গে তুলনীয়:—

যাহার সৌন্দর্য হেরি জগতের সকল প্রকাশে
সহস্র পবিত্র আত্মা নিশিদিন রহে তার পাশে!
বিবশ বংশীর মত বেদনায় উঠে গুমরিয়া
তাহারি বিরহ-শোকে অহরহ এ আমার হিয়া।
অকারণে কেন আর্তি, তার সাথে কোথা বা বিচ্ছেদ?
মিলনে বিরহ-বুদ্ধি, এ রহস্য কে করিবে ভেদ?

(ব্রাউনের 'Persian Literature' গ্রন্থে উদ্ধৃত ইংরাজী গদ্য অনুবাদ হইতে।

হয় সুফী সাধন-তত্ত্বে অভেদ-দর্শনের আদর্শ থাক্‌লেও রুমী, সাদী, হাফিজ প্রভৃতি কবিগণ কখনই এই রসের পিপাসু ছিলেন না, মহাজনগণের মতই তাঁদেরও প্রেমাভিসার বিরহের অশ্রুচিহ্নিত পথে।* তাই তাঁদের কাব্যেও পাই বিরহ-মিলনের ছায়া-আলোর লুকোচুরি—'কান্না-হাসির দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা।'

†সিন্ধুর অলোক সাধকগণ চিরাচরিত রীতির অনুবর্তন আদৌ পছন্দ করতেন না, ধর্ম-বিষয়ে গোঁড়ামি ও ভণ্ডামি ছিল এঁদের অসহ্য। সৃষ্টির ভিতরে সৌন্দর্যের যে অনাহত ধারা প্রবাহিত তার উপলব্ধিই ছিল এঁদের সাধনার অনন্য লক্ষ্য। এই সূক্ষ্ম সংবেদনার নামই প্রেম। এই প্রেম ইন্দ্রিয় সাধনার দ্বারা লাভ করা যায় না; সাধক চরণদাস বলেন, 'ইন্দ্রিয়ের বশীভূত যে সে আনন্দকে পায় না,' এ 'ইশ্‌ক্ মিজাজী' বা ঝুটা প্রেম নয়, খাঁটি প্রেম বা 'ইশ্‌ক্ হকীকী'। এ প্রেমে সৌন্দর্যকে কামনা থেকে মুক্ত ক'রে ধ্যান-লোকে তুলে ধ'রতে হয়; তাই লতিফ্‌ বলেন, 'কামনার দৃষ্টিতে দেখ্‌লে প্রিয়তমকে পাবে না, কারণ তাঁর সৌন্দর্য তো ইন্দ্রিয়গোচর নয়; ডুবুরি যেমন সাগরের অন্ধকার অতলতায় মুক্তার সন্ধান করে তেমনি বিশ্বরহস্যের পারাবারে ডুব দিয়ে তাঁকে পেতে হবে। সারা জীবন ধ'রে লতিফ্‌ প্রেমের বেদনার গানই গেয়েছেন, ব'লেছেন, 'লীলাময়ের রহস্য বোঝা ভার। কখন এসে দেখি তাঁর দ্বার রুদ্ধ, কখন দেখি তিনি বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; কখন আসি, প্রবেশ পাই না, কখন বা তিনি আপনি এসে নিয়ে যান একেবারে ভিতরে'। এইসুফী সাধকরা 'বৈধী-মার্গ' অনুসরণ করেন না, প্রেমের প্রেরণা ছাড়া অন্য কোন কর্তৃত্বই এঁরা স্বীকার করেন না। লতিফ্‌ ব'লেছেন, 'পাপ-পুণ্যের মধ্যে ঈশ্বরকে জানা যায় না। লোকে পাপমুক্তি কামনা করে; আমার প্রিয়তম আমার প্রতি বিরূপ হ'য়েছিলেন আমি

* 'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সংভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।' উ. নী.

†দ্রঃ শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের প্রবন্ধ—বিশ্বভারতী পত্রিকা।

পুণ্যাচরণে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলাম বলে'।' প্রেমের সাধক এঁরা, প্রেমই এঁদের একমাত্র লক্ষ্য। হিন্দু অথবা মুসলমান কোন নামেই এঁরা নিজেদের পরিচয় দিতেন না, কারণ এঁরা বিশ্বাস করতেন সত্য এক, প্রেমাস্পদ এক, নাম নিয়ে কেন তবে এই নিষ্ফল কলহ? ধর্ম-নীতির কঠিন শাসনের মধ্যে এঁদের প্রাণ উঠেছিল হাঁপিয়ে, তাই তাঁরা চেয়েছিলেন অপ্রাকৃত প্রেমের মধ্যে আত্মার একান্ত মুক্তি।

তবেই দেখা গেল, এই সত্য-সন্ধানের জন্য সাধক কবিরা মোটামুটি তিনটি নির্দিষ্ট পথ ধরে' চলেন। যাঁরা ঈশ্বরকে এই জীবলোক থেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন একটি তুরীয় সত্তারূপে অনুভব করেন, তাঁরা দূর, দুর্গম সাধনার পথে সেই 'সুদূরের ধন'কে চান পেতে,—এই প্রত্যক্ষ, অভিব্যক্ত জগতের মরু-মায়া ছেড়ে ধ্রুবতারার দেশে দেন পাড়ি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও এই পথের ডাকের কথা, সুদূরের অভিসারের কথা নানা কবিতায় নানা আকারে পাই। দ্বিতীয়ত, একদল মরমী সাধকের নিকট ভগবান দূরের বস্তু নয়, পরমাত্মীয়—ঈপ্সিততম তিনি। তাঁরা নিজের ও অখিলাত্মার মধ্যে কোন ব্যবধান অনুভব করেন না। ঐশী সত্তা তাঁদের দৃষ্টিতে কেবল দূরের দীপকমাত্র নয়—হৃদয়ের নিভৃত পূজাগৃহে সন্ধ্যারতির পঞ্চ-শিখা! একান্ত অন্তরঙ্গ এই সাধনা; দয়িতের সহিত এই যে প্রেম, এর চেয়ে মহত্তর ও গভীরতর কিছু কল্পনাও করা যায় না। বিশেষ করে' খৃষ্টীয় মরমী ও বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিগণ তাঁদের রচনায় পার্থিব প্রেমের প্রতীকের সাহায্যে অপার্থিব প্রেমের ব্যঞ্জনা করেছেন। কারণ উভয় সম্প্রদায়ই জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেম-সঙ্গমকে প্রায় একই-পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছেন। অবশ্য কল্পনা ও প্রকাশের প্রকারে পার্থক্য যথেষ্ট, কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে আলোচ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-কবিতার মধ্যে এই সুপরিচিত দৃষ্টি-ভঙ্গিও অনেকস্থলেই পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, যাঁরা জীবকে, জগৎকে, জগতের ক্ষুদ্রতম প্রকাশটিকেও বিশ্বজীবনের 'বৈদ্যুতি' দ্বারা পূর্ণ মনে করেন। উপনিষদ্ জগতের সমুদয়

পদার্থকে এই অধ্যাত্মদৃষ্টির দ্বারা দেখবার উপদেশ দিয়েছেন। 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'—সেই পরমাত্মরূপী আমিই জগৎ, আমার সত্তাই জগতের সত্তা, তা ছাড়া আর পৃথক সত্তা নেই। এই সর্বাত্মদর্শনই রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম কাব্যের প্রধান সুর। কার্লাইলের মত তিনিও বিশ্বাস করেন স্বতন্ত্র প্রকাশরূপে জীব-জগতের কোন অস্তিত্বই নেই—জগতের ক্ষুদ্রতম বস্তুটিও একটি দিব্যভাবের প্রতীক এবং সুগভীর অর্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত।* সুতরাং দৃষ্টি যার মুক্ত সে তুচ্ছতম বস্তুর বাতায়ন-পথেও অসীমের দর্শন লাভ করে। নৈবেদ্যের 'একাধারে তুমিই আকাশ, তুমিই নীড়' কবিতাটিতে কবি বলেছেন, 'হে সুন্দর, এই সংসার তোমারই রচিত কল্প-নীড়, এখানে তোমার সুনিবিড় প্রেম কত গন্ধে, কত গানে চারিদিকে আমাকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে। কিন্তু তুমি তো কেবল নীড় নও, তুমি 'আত্মার আকাশ'—তার 'অপার সঞ্চার-ক্ষেত্র'। তাই নীড় ছেড়ে সেই গন্ধ-গীতিহীন, আদিঅন্তহীন পরম স্তব্ধতার মধ্যে আমাদের সমাহিত হ'তে হবে।' 'সেই অগম্য অচিন্ত্যের পানে আমাদের চিত্ত-বাতায়ন রাত্রিদিন রাখ্‌তে হবে উন্মুক্ত।' বস্তু-জগতে বাষ্পের যেমন কোন নির্দিষ্ট আয়তন নেই, আধারের আকার-অনুসারে তার আয়তন প্রসৃত অথবা সংকুচিত হয় তেমনি সেই ভাবময় চিদ্‌বস্তুও রূপ-লোকে হন সংকুচিত, আবার রূপের বাহিরে তাঁর অন্তহীন প্রসার। উপনিষদ্‌ ও গীতার অমৃত-উৎস থেকেই তিনি পেয়েছেন এই মনোজ্ঞ দৃষ্টি-ভঙ্গি, যদিও নিও-প্লেটনিস্ট্‌রাও এই দার্শনিক মত-বাদই প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। গীতায় ভগবান স্বয়ং বলেছেন, 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' (১০।৪২)। আশ্চর্যের বিষয়

---

* 'Rightly viewed, no meanest object is insignificant: all objects are as windows through which the philosophic eye looks into Infinitude itself.........Matter exists spiritually to represent some idea and body it forth'—Sartor Resartus : Book I Ch XI

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাশিত তিনটি পথের কোনটিই বাদ দেন নি,—বাঙ্‌লার কাব্য-কলার মধ্যে এই ত্রিবিধ ভঙ্গি একাধারে আর কখনও দেখা যায় নি। উপনিষদের উদার শিক্ষা এবং বৈষ্ণব ও সুফীকাব্যের রমণীয় প্রভাব তাঁর কাব্যলক্ষ্মীকে তাই একটি সম্মিলিত নূতন কান্তি দিয়েছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অসীমকে দেখেছেন সীমার বৈচিত্র্যের মধ্যে, অব্যক্তকে দেখেছেন ব্যক্তের রূপ-লোকে। তাঁর জীবন-স্মৃতিতে তিনি নিজেই বলেছেন, "আমার তো মনে হয় আমার কাব্য-রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম :—'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'।" তর্কবুদ্ধির বন্ধুর পথে করেন নি তিনি শুভ-সাধনার অভিযাত্রা, কূটস্থ সত্যকে দেখেছেন নিজেরই মধ্যে। স্থূলবুদ্ধির প্রত্যন্ত সীমায় বহির্বিষয়ের মত দেখেন নি তিনি পরম-পুরুষকে, আনন্দঘন আত্মার কেন্দ্রস্থলে পেয়েছেন তাঁর দুর্লভ দর্শন। এই আত্মদৃষ্টিই মানুষের একমাত্র আলোক—ধ্রুবলোকের অভ্রান্ত পথ-প্রদর্শক। সাধারণ বুদ্ধি মানুষকে প্রবর্তিত করে বিশ্লেষণের পথে, দৃশ্যমান বিশ্বের বস্তু-পুঞ্জের মধ্যে বিরোধ কল্পনা করে' লাভ করে বস্তু-বিষয়ের স্থূল জ্ঞান। এই বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা মানুষকে দিয়েছে প্রাকৃতিক কর্মসমূহের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ক্রম অথবা সামান্য নিয়ম। সুতরাং প্রাকৃতিক রহস্যের মর্মোদ্‌ভেদে এর ব্যাবহারিক উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই বুদ্ধি-লব্ধ জ্ঞান আমাদের পরম সত্যের নিত্যলোকে পৌঁছে দিতে পারে না। তাকে পাবার একমাত্র উপায় আত্মদর্শন। অসীম শক্তিশালী রঞ্জনরশ্মির মত এই প্রজ্ঞালোক (কাণ্টের pure reason) বস্তু-বিশ্বের আবরণ ভেদ করে' চলে' যায় তার অন্তরতম কেন্দ্রে এবং আবিষ্কার করে বিশ্ব-রহস্যের সেই অনাদি উৎস যেখানে উপনীত হ'লে সব বিরোধের হয় অবসান। বুদ্ধি বলে, "তুমি আমি পৃথক, মানুষ আর পশু এক নয়, শীতলতা আর উত্তাপ স্বতন্ত্র শক্তি।"

মানুষের অন্তরাত্মা এতে সায় দেয় না, এই বিরোধমূলক বিচারের বিরুদ্ধে জানায় তার পরম প্রতিবাদ;—বলে, "কই, আমি তো কোন পার্থক্য দেখি না। তুমি আমি কি সত্যই পৃথক্? উত্তাপের স্বাভাবিক পরিণতিই তো শীতলতা, জীবনের চরম পরিণামই তো মৃত্যু।" তাই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুখ ও দুঃখ, আলোক ও অন্ধকার, জীবন ও মৃত্যু অন্যোন্যবিরোধী নয়, তারা পরস্পরের পূরক। রবীন্দ্রনাথের মত শেলীও বিশ্বাস করেন মৃত্যু একটা আবরণের উন্মোচনমাত্র যা' আমাদের সত্যলোকের কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে নিত্য জীবনের অধিকারী করে। তাই কবি-কণ্ঠে বেজে ওঠে:—

এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন, কালহীন আদি-জ্যোতি
শাশ্বত প্রকাশ-পারাবার
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যা-স্নান,
যেথায় নক্ষত্র যত—মহাকায় বুদ্বুদের মত
উঠিতেছে, ফুটিতেছে,
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি
চৈতন্য-সাগর-তীর্থ-পথে! (রোগ-শয্যায়—২০)

অথবা

Dust to the dust! but the pure spirit shall flow
Back to the burning fountain whence it came.
A portion of the eternal which must glow
Through time and change.

কিংবা

Life, like a dome of many-coloured glass
Stains the white radiance of Eternity
Until death tramples it to fragments.—Die
If thou wouldst be with that which thou dost seek!

—Shelley, Adonais. Pp 191,183

তবে কেন এই ভেদবুদ্ধি—কেন এই বৃথা বিমর্শ ও বিশ্লেষণ? এই বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতিকে দেখ সেই একেরই প্রকাশ-রূপে, এই বর্ণগন্ধময়ী ধরণীর অনাহত লীলায় প্রত্যক্ষ কর সেই জগৎ-সবিতার বিরল মাধুরী!

"The gravitation[6] and the filial bond
Of Nature that connect him with the world" The Prelude.

Mrs. Browning কি মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন এই মধুর ভাবটি তাঁর 'অরোরা লে' শীর্ষক কবিতায়!—

"There's not a flower of spring,
That dies in June; but vaunts itself allied
By issue and symbol, by significance
And correspondence, to that spirit-world
Outside the limits of our space and time,
Whereto we are bound."

উপনিষদ্ বলেছেন,

'বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥'

একই বায়ু যেমন জগতে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ ভাব প্রাপ্ত হ'য়েছে, তেমনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক হ'য়েও প্রত্যেক দেহানুসারে তদনুরূপ হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছেন; অথচ তিনি স্বরূপত অবিকৃতই আছেন।

মোটের উপর, প্রতীয়মান বৈষম্যের মধ্যে এক ও নিত্যের উপলব্ধিই মরমী কবির কাব্যের মর্মকথা। এ সম্বন্ধে Neo-Platonic সম্প্রদায়, সুফী কবি এবং ভারতীয় মরমী সাধকের মধ্যে বিন্দুমাত্রও বিরোধ নেই। উপনিষদ্ এবং * ভগবদ্‌গীতায় পরিবর্তমান বিশ্ব-জীবনের অভ্যন্তরে এক অপরিবর্তনীয়

---

* সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ গীতা ১৮।২০

অতীন্দ্রিয় সত্তার উপলব্ধির কথাই নানাস্থানে নানাভাবে পাওয়া যায়। যে পরিবেষের মধ্যে আমরা আছি তা' ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু এই ধ্বংসশীল নির্মোকের অভ্যন্তরে যে আত্মসত্তা বিরাজিত আছে তার বিনাশ নেই। দার্শনিক জেম্‌স্‌ বলেছেন, "জীবনে সংকটময় বিপ্লবের মুহূর্তে মাঝে মাঝে আমি আমার অন্তরতম লোকে এক অজ্ঞাতশক্তির স্পর্শ অনুভব করি। এই অনুবোধ খুব স্পষ্ট এবং প্রখর না হ'লেও আমি নিশ্চয় জানি সেই করুণ-স্নিগ্ধ স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হ'লে আমার জীবনের সমস্ত সঙ্গীত যাবে থেমে।" এই অলোকের ছোঁওয়া মানুষকে দেয় আত্ম-সংবিৎ—দেয় তার মুক্তি-পথের অবিতথ ইঙ্গিত, যুক্তিবাদের সংকীর্ণতা থেকে আহ্বান করে প্রেমের অনন্ত ব্যাপ্তির মধ্যে। স্বার্থপরিশূন্য প্রেমের সেই নিত্যতীর্থে সব একাকার হ'য়ে যায়; পর আপন হয়, দুর নিকট হয়, প্রেমার প্রসন্ন জ্যোৎস্নায় ধুয়ে মুছে যায় সব বিসংবাদ, সকল গ্লানি!

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের—

'আঁধার আসিতে রজনীর দীপ
জ্বেলেছিনু যতগুলি—
নিবাও, রে মন, আজি সে নিবাও
সকল দুয়ার খুলি'।
আজি মোর ঘরে জানি না কখন
প্রভাত করেছে খবির কিরণ,
মাটির প্রদীপে নাই প্রয়োজন,
ধূলায় হোক্ সে ধূলি।' নৈ ১৫।

অথবা, 'পরশমণির প্রদীপ তোমার
অচপল তার জ্যোতি,
সোনা করে' নিক্ পলকে আমার
সব কলংক কালো।

আমি যত দীপ জ্বালি, শুধু তার
জ্বালা আর শুধু কালী,
আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে
তোমারি কিরণ ঢালো!' নৈ ২।

এবং ব্রাউনিং ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি স্মরণীয় :—

"Were knowledge all thy faculty, then God
Must be ignored : love gains Him by first leap."
A Pillar at Sebzevar : Browning.

"Thro' love, thro' hope, and faith's transcendent dower,
We feel that we are greater than we know."
After-thought: Wordsworth.

"অণুর চেয়েও অণু যিনি, আবার মহতের চেয়েও মহৎ সেই আত্মা প্রাণিগণের হৃদয়-গুহায় নিত্য অধিষ্ঠিত।" কঠোপনিষদের এই বাণীটি আমরা অনেকেই অনেকবার শুনেছি, কিন্তু এর মর্মকথাটি কি সত্যই আমাদের উপলব্ধি হ'য়েছে? না হওয়াই সম্ভব; কারণ প্রেমের যে স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে, জীবনকে দেখ্‌লে তার অন্তরতম রূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়, সেই 'পরশ-মণির প্রদীপ' কই আমাদের অন্তরে—কই সেই আলো কবি কোলরিজ্‌ যাকে বলেছেন, 'Heaven's light on earth—Truth's brightest beam'? মরমী কবি ব্লেকের সেই প্রসিদ্ধ উক্তি—

"To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour."

কেবল কথার কথা নয়, কবির ধ্যান-মুকুরে প্রতিফলিত সত্যের শাশ্বত রূপ। ধ্যানী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সেই নিত্যরূপটি ধরা পড়েছে, তাই তিনি গেয়ে উঠেছেন,

'সকল গগন বসুন্ধরা
বন্ধুতে মোর আছে ভরা,
এই কথাটি দেবে ধরা জীবনে
আমার গভীর জীবনে।' গীতালি ২

আধুনিক জড়বিজ্ঞানের আণবিক মতবাদও বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে না। সে যা হোক্, অতীত ভারতের মরমী ঋষিরা যে-পথ ধরে' তাঁদের কল্প-স্বপ্নকে করেছিলেন সফল, সীমার মাঝেই দেখেছিলেন অসীমের অবভাস, ঋষি-দর্শিত সেই দিব্যপথ ধরে'ই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন তাঁর অধ্যাত্মসাধনার পরম প্রেরণা। প্রেমের সেই চির-বহমান বিচিত্র ধারা নানা কবির কারুকৃতির মধ্যে পেয়েছে নব নব রূপাভিব্যক্তি। কবীর, নানক মীরাবাঈ, দাদূ প্রভৃতি উত্তর ভারতের বহু কবি ও সাধক এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি পূর্বসূরিগণের মতই রবীন্দ্রনাথও সেই ভূমানন্দের উত্তর-সাধক। আদর্শগত কোন মৌলিক পার্থক্য এঁদের নেই। সেই একাত্মদর্শন, সেই বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের উপলব্ধি, সেই 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্,' সেই প্রেম, সেই আর্তি ও প্রপত্তি, সেই বিরহ-মিলনের মেঘ-রৌদ্রের লীলা! সবই সেই, প্রভেদ যা কিছু আঙ্গিকের।

অবাঙ্‌মনসগোচর যিনি তাঁকে মানুষ পায় বটে, কিন্তু দ্রবীভূত অন্তরের সান্দ্র আনন্দকে, সেই অনির্বচনীয় রসোল্লাসকে সে প্রকাশ করবে কোন ভাষায়? শুধু অনুভূতির আনন্দ নিয়ে যিনি বিভোর থাকেন তিনি সাধক অথবা ঋষি, কবি ন'ন। অন্তর্গূঢ় অনুভূতিকে আস্বাদ্যমান রূপ দেওয়াই তো কবির কাজ। ভাবময় সত্যবস্তু যখন সৌন্দর্যময় অপরূপতা লাভ করে তখনই সৃষ্ট হয় সত্যকার সাহিত্য। কিন্তু আত্মদর্শনের এই রূপ-চিত্র সকলের কাছে বেশ সুস্পষ্ট মনে হয় না, কারণ প্রত্যেক মানুষ তার নিজের সৃষ্ট এক স্বতন্ত্র জগতে বাস করে—তার বুদ্ধির বহির্দ্বারে সতর্ক প্রহরীরা অবাঞ্ছিত আগন্তুকের প্রবেশ-প্রতিরোধের জন্য সর্বদা উপস্থিত। রূঢ়-কঠোর স্বার্থের

জগৎ সেটা; সেখানে কল্পনার স্বপ্ন-পথে অসীমের দৌত্য ফিরে আসে প্রতিহত হ'য়ে বিজ্ঞজনোচিত অবজ্ঞায়। কূপের মধ্যে বাস করে যে, বৃহৎ বিশ্বের বার্তা শুনে সে হাসে অবিশ্বাসের হাসি। তবুও নিরাশ হবার কারণ নেই; প্রত্যেকেরই হৃদয়-গুহায় নিহিত আছেন সেই গহ্বরেষ্ঠ প্রাণ-পুরুষ—কাজেই আত্মানুভূতির সম্ভাবনা প্রত্যেক জীবের মধ্যেই বর্তমান। ভোগের ভিতরে যখন আসে অতৃপ্তির অবসাদ—বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যখন সত্যই হ'য়ে দাঁড়ায় বোঝার মত, তখন মানুষ শুন্‌তে চায় তার হৃদয়-স্পন্দনের সঙ্গে 'পীতমের' পদ-ধ্বনি। তাই কবি গেয়ে ওঠেন, 'তোরা শুনিস্ নি কি, শুনিস্ নি তার পায়ের ধ্বনি, সে যে আসে আসে আসে'। এই যে প্রত্যয়, একে অলীক বা অবাস্তব বলে' উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। ব্যাবহারিক জগতের জ্ঞান-সঞ্চয়ের জন্য যেমন পেয়েছি আমরা মেধা ও ধী, অতীন্দ্রিয় জগতের নিগূঢ় উপলব্ধির জন্য তেমনি পেয়েছি এই প্রতিবোধ।* কবির ভাষায়—

"বাক্যের ঝড়, তর্কের ধূলি
অন্ধ বুদ্ধি ফিরিছে আকুলি,'
প্রত্যয় আছে আপনার মাঝে
নাহি তার কোন নাশ।" নৈ ১১

এই দৃষ্টি যার উন্মুক্ত, 'সৃষ্টির অচিন্ত্য রহস্য তার কাছে খোলা পুঁথির মতই সহজ ও সুস্পষ্ট'†—সেই পায় অসীম অমৃত-পারাবারে সুখ-সন্তরণের অধিকার।

---

* বেদে একে 'পুরন্ধি' বলা হ'য়েছে। ১।১১৬।৭
বোধ হয় একমাত্র লোকায়ত মত ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় মতই সত্যানুসন্ধানে বোধির অধিকারকে অস্বীকার করে নি।

† "He saw thro' life and death, thro' good and ill,
He saw thro' his own soul,
The marvel of the ever-lasting will
An open scroll
Before him lay."—Tennyson.

বস্তু-জগৎ অবলুপ্ত হ'য়ে যায় তার সাম্‌নে থেকে, বিরহের ব্যাকুলতা ঘনিয়ে আসে প্রাণে। তখন কবির কণ্ঠে বেজে ওঠে,—

'তন্‌মন ব্যাপ্যো প্রেম, মানো মতবারী হৈ।
সখিয়াঁ মিলি দুই চারী, বাবরী সী ভঈ ন্যারী ॥
চন্দকো চকোর চাহৈ, দীপক পতঙ্গ দাহৈ।
জল বিনা মীন জৈসে, তৈসে প্রীত প্যারী হৈ ॥"—মীরাবাঈ

'প্রেমামৃতে আমার মনঃপ্রাণ পূর্ণ হ'য়ে গেছে, যেন আমি কিসের নেশায় হ'য়েছি মাতাল। আমার এই অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখে বন্ধুজন মনে করে আমি উন্মাদ। যে-প্রেমের আবেগে চাঁদের পিপাসায় চকোর হয় পাগল, বহ্নি-মুখে পতঙ্গ যায় ছুটে, ডাঙার মাছ জলের বিরহে হয় কাতর,—সেই অপ্রমেয় প্রেমের চেয়ে প্রিয়তর আর কি আছে?' অথবা—

আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে।
সুধাধারে আপনারে
তুমি আরো আরো—আরো কর দান। গীতিমাল্য ২৮

অথবা,

চরণ ধরিতে দিও গো আমারে
নিও না, নিও না সরায়ে।
জীবন-মরণ সুখ-দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে। গীতিমাল্য ১০৪

বহুরূপা প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে এক অখণ্ড ও অব্যক্ত রূপের স্বীকৃতি আমরা রবীন্দ্রনাথের মত কবীরের রচনাতেও পাই। বিশ্ব-কবি যেখানে গেয়েছেন,

কত বর্ণে, কত গন্ধে
কত গানে, কত ছন্দে

অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়-পুর।

কবীর সেখানে বলেছেন,—

বহুরংগী প্যারা সব্‌সে ন্যারা
সব হি মে এক ভেখ হৈ জী।

এবং এই আত্মানুভূতির জন্য ভাবের যে বিভোরতা আবশ্যক সে সম্বন্ধেও উভয়েই একমত। প্রিয়তমের প্রেমে যখন হৃদয় হয় অনুলিপ্ত, তখন মনে হয় বিশ্ব-সংসার সেই অনুরাগের রঙে হয়েছে রঙীন। জৈব-ক্ষুধা-দিয়ে-গড়া মানুষের কামনাময় রূপ যখন তার সীমা ছাড়িয়ে অসীম জ্যোতিঃসমুদ্রে যায় হারিয়ে, তখন রূপ ও অপরূপের সেই শুভসঙ্গমে জীবনের রূঢ় বাস্তবতার পরে নেমে আসে নববসন্তের নিগূঢ় আনন্দ। তাই কবি-বীণায় বেজে ওঠে,—

উলটি সমানা আপমে প্রকটী জোতি অনন্ত
সোহব সেবক এক সংগ খেলেঁ সদা বসন্ত। (কবীর)

সদা বসন্ত হোত তেহি ঠাঁউ
সংশয়-রহিত অমরপুর গাঁউ,
তহবাঁ জরা-মরণ নহিঁ হোঈ
কর বিনোদ-ক্রীড়া সব কোঈ। (কবীর)

অথবা

এই তোমারি পরশ-রাগে চিত্ত হ'লো রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা রইলো প্রাণে সঞ্চিত। গীতিমাল্য

কিংবা

তোরা আমার যাবার বেলাতে জয়ধ্বনি কর।
ভোরের আকাশ রাঙা হ'লো রে পথ হ'লো সুন্দর। ঐ

কিংবা

মিলাবো নয়ন তব নয়নের সাথে,

মিলাবো এ হাত তব দক্ষিণ হাতে,—
প্রিয়তম হে জাগো, জাগো, জাগো।
হৃদয়-পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে,—
প্রিয়তম হে জাগো, জাগো, জাগো। গীতাঞ্জলি ৫০

এই যে সীমা ও অসীমের, রূপ ও অপরূপের মিলনের রাজ্য, কবীর যার নাম দিয়েছেন 'নিঃলোক,' সেখানে এক স্থির প্রশান্তি নিত্য বিরাজিত—সেখানে অনুদিন ঝংকৃত হয় এক অপার্থিব রাগিণী যার প্রতিধ্বনি জাগে কেবল আমাদের অন্তরের অন্তর্দেশে। আবার সেই প্রতিধ্বনি অজস্রধারায় বিশ্বের সমুদয় সুষমায় ছড়িয়ে পড়ে' সেই আনন্দ-লোকেই যায় ফিরে। এক থেকে অনেকে, রূপ থেকে অপরূপে, সংহতি থেকে ব্যাপ্তিতে সুরের এই যে যাওয়া-আসা এর আর বিরাম নেই। এই অনাহত সঙ্গীতের কথা, রূপ থেকে ভাবে এবং ভাব থেকে রূপে মানবাত্মার অভিসারের কথা রবীন্দ্র-কাব্যে সহস্র বর্ণচ্ছটায় বিচ্ছুরিত হ'য়েছে। কবীরও শুনেছেন সেই 'অনহদ নাদ,' 'শব্দের আঘাত লেগেছে তাঁর মনে*—সারা দেহ হ'য়েছে বিদ্ধ,' জীবন-বীণার তারে তারে পেয়েছেন তিনি শুভ-সুন্দরের রভস-স্পর্শ। কিন্তু অরূপের পূজারী রবীন্দ্রনাথ রূপের সৌন্দর্যকেও স্বতন্ত্রভাবে স্বীকার করেছেন—রূপের ভাণ্ডার থেকে বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য লুণ্ঠন করে' নিয়ে তিনি চেয়েছেন অরূপের মাঝে লীন হ'তে।

বারবার তুমি আপনার হাতে
স্বাদে, গন্ধে ও গানে
বাহির হইতে পরশ করেছ
অন্তর-মাঝখানে। নৈ ৭

এই তাঁর অধ্যাত্মদর্শনের মর্মবাণী! 'রূপ-সাগরে' তিনি ডুব দিয়েছেন

* 'শব্দ কী চোট্ লগী মেয়ে মনমে' বেধ গয়া তন্ সারা।'—কবীর

'অরূপ রতন আশা করে'। কবীরের দৃষ্টিতে কিন্তু রূপ-রস-গন্ধাদির কোন পৃথক্ সত্তা নেই—ধ্যানের অলৌকিক লোকে এরা এদের রূপ ও সংজ্ঞা হারিয়ে এক আবেগ-ঘন আনন্দে পরিণত হ'য়েছে। লীলাময়ী প্রকৃতির রঙ্গশালায়, ছায়া-পটে ছবির মত, ক্ষণে ক্ষণে যে রূপ-মাধুরী ফুটে ওঠে, তা থেকে তিনি তাঁর প্রেরণা পান নি—তাঁর আবেগের উৎস অন্তরের নিভৃত নেপথ্যে। এইখানে রুমীর সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য আছে। ইংরেজ কবি ব্লেকও প্রকৃতিকে অরূপানুভূতির অন্তরায় বলে' মনে করতেন। অথচ, নির্ঝরিণীর কলধ্বনি, দূর আকাশের একটি পথিক তারা, বিজনতার-মাঝে-ফোটা একটি নিঃসঙ্গ কুসুম কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রাণে যে অনির্বচনীয় আনন্দের শিহরণ তুলত তার আবেশে আজও পাঠকের চিত্ত ভাব-রসে অনুষিক্ত হয়। এবং এই-খানেই তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল। তিনি তাঁর সমগ্র চৈতন্য দিয়ে এই আনন্দ-সুধা পান করেছেন এবং পাঠককেও সেই পরম-প্রসাদ থেকে বঞ্চিত করেন নি। কবির ভাষায়—

> "Thus pleasure is spread through the earth
> In stray gifts to be claimed by whoever shall find,
> Thus a rich loving-kindness, redundantly kind,
> Moves all nature to gladness and mirth."
>
> —Stray Pleasures.

> "বিশ্ব-রূপের খেলাঘরে কতই গেলাম খেলে,
> অপরূপকে দেখে গেলাম দুটি নয়ন মেলে।"

এই দর্শন আত্মিক (subjective)। কবি-মনের তন্ত্রীতে যে আনন্দের সুর অনুদিন ঝংকৃত হচ্ছে—বিশ্বব্যাপী প্রাণ-সত্তার যে প্রতীতি তিনি লাভ করেছেন, প্রকৃতির প্রতিটি প্রকাশের' মধ্যে দেখেন তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান। এই আনন্দময় রূপ-কল্পনাই রহস্যবাদী কবির প্রাণধর্ম।

সেই প্রাণ-রূপী আত্মা সর্বভূতে বিরাজিত আছেন, এই বিজ্ঞানই

"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্"। কঠ ৬।২

যথেষ্ট নয়—মরমী কবির অন্তর এতে পরিতৃপ্ত হয় না। জানা আর পাওয়া তো এক কথা নয়। আত্মার আত্মা যিনি, আত্মীয়রূপে তাঁকে নিবিড় করে পাওয়ার জন্য চিত্ত স্বতই উৎকণ্ঠিত হয়—জীবনের সব অতৃপ্তি ও অবসাদ দূর হ'য়ে যায় যখন আমাদের অন্তরে লাগে সেই প্রাণ-রূপী বিভুর জীবন্ত স্পর্শ। সেই চৈতন্যময় শুধু আছেন তাই নয়, আনন্দরূপে তিনি ছড়িয়ে আছেন সর্বত্র। আকাশে হাসি আছে, বাতাসে বাঁশী আছে, পুষ্পে বর্ণ ও গন্ধ আছে, কিন্তু এদের অন্তরের যে নিগূঢ় আনন্দ তাকে আস্বাদ করতে হ'লে চাই একটি সূক্ষ্ম সংবেদনা, এরই অন্য নাম প্রেম। প্রেমের চরিতার্থতা তো জানায় নয়, আরাধ্যকে নিবিড় করে' বুকের মাঝে পাওয়ায়। কিন্তু এই নিগূঢ় অনুভূতি—রস-সম্ভোগের এই আনন্দ তো চিরস্থায়ী হয় না, চকিতে দেখা দিয়ে এ ক্ষণপ্রভার মতই যায় মিলিয়ে, রেখে যায় অন্তরে অতৃপ্তির সুতীব্র দাহ—ফিরে পাবার উদগ্র আগ্রহ! রবীন্দ্রনাথও চেয়েছেন এই প্রেম দিয়েই তাঁকে পেতে—ভালবাসার মায়া-পাশে সেই 'অ-ধর'কে ধরতে। তাই যখনই এই আনন্দের অনুভূতি অন্তর্হিত হ'য়েছে, আর্তকণ্ঠে তিনি গেয়ে উঠেছেন,—

> 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
> কেন ভোরের আকাশ ভরে' দিলে এমন গানে গানে?'

কল্প-মায়াকে কায়ার মধ্যে পাওয়াই হ'ল প্রেমের পরম সাধনা, শুধু ভাব নিয়ে তার মন ভরে না; তাই চলে রূপের মাঝে অরূপের অন্তহীন অন্বেষণ। আবার যে ভাব-সুষমা অণু-পরমাণুতে আকীর্ণ, তাকে একটিমাত্র বিগ্রহের মধ্যে পাবার ইচ্ছাও হ'ল এই প্রেমেরই সহজ ধর্ম। তাই বৈষ্ণবের রস-লীলায় দেখি সেই চিন্ময় ব্রহ্মকে আনন্দময় কৃষ্ণ-বিগ্রহের মধ্যে। অমূর্ত 'এক'কে মূর্ত 'একে'র মধ্যে উপলব্ধি করাই হ'ল বৈষ্ণবের জীবন-সাধনা। অমূর্ত চিন্ময় একের উপলব্ধি—ব্রহ্ম-রূপেই ব্রহ্মের সহিত মিলন-সাধনা বৈদান্তিকের, বৈষ্ণবের নয়।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু একটু স্বতন্ত্র। তিনি এককে দেখেছেন বহুর ভিতরে, আবার বহুকে দেখেছেন সেই একেরই আনন্দময় প্রকাশ-রূপে। অখণ্ড আনন্দকে একটি ক্ষুদ্র বিগ্রহে আরোপিত করে' তাঁর চিত্ত তৃপ্তি পায় নি; তাই তিনি খুঁজেছেন সেই আনন্দরূপী ব্রহ্মকে চিজ্জড়াত্মক সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে। ফলকথা, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত তাঁর কাব্যেও আমরা পাই সেই সর্বময় আনন্দের বার্তা—'Of joy in widest commonalty spread'. কিন্তু আনন্দের এই তীব্র অনুভব ক্ষণিক ও চঞ্চল হ'লেও প্রেম ধ্রুব ও অচপল, তাই বিরহ বা অদর্শনে তার ক্ষয় হয় না, হয় তার দীপ্ততর উন্মেষ! বিরহের এই যে ছলনা, বাসনাকে উদ্দীপ্ত করে' পলকের ছোঁওয়া দিয়ে দূরে সরে' যাওয়া—দূর ও নিকটের এই লুকোচুরিই লীলা-রসকে সজীব করে' রাখে। দূর আছে বলে'ই নিকটের ক্ষণ-স্পর্শ হয় এত মধুর ও মূল্যবান্‌, দূর থেকে দেখি বলে'ই দেখার বস্তুকে মনে হয় এত মনোহর! প্রেমের অমৃত-দীপটিকে আগ্রহের স্নেহ-রসে জ্বালিয়ে রাখে এই বিরহ (দূরত্ব)। এই 'পেয়ে-হারানর' ভিতরে যে গভীর দুঃখ আছে ভাবি-মিলনের সুখ-সম্ভাবনায় তার সঙ্গে মিশে থাকে একটি গভীর-তর আনন্দ;—উজ্জ্বল-ভাষ্যের ভাষায়—"অত্র দুঃখে সুখধর্ম এবানুভূয়তে নতু দুঃখধর্মঃ"।* বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রে এরই পারিভাষিক নাম 'বৈয়গ্র' অর্থাৎ উৎকণ্ঠা। বস্তুত, দুঃখরাতের অঝোর অশ্রুই এই কঠিন প্রেমের মুখ্য শৃঙ্গার।* তাই রবীন্দ্রনাথ মিলনের আনন্দের চেয়ে বিরহের দহনকেই চেয়েছেন বেশি করে'। 'আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো'—এ তাঁর অন্তরের কথা। দুঃখের নিবিড় নিশীথ-রাত্রে 'শ্রাবণ-ঘন গহন মোহে' তিনি

---

* দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে॥ উ. নী.

"There is no bond of love without a separation, no enjoyment without the grief of losing it."—Schlegel, Lectures on Dramatic Art and Literature.

পেয়েছেন 'ব্যথা-পথের পথিককে'। বিচ্ছেদে-বেদনায় পূর্ণ তাঁর মিলনের পাত্রটি; বেদনার আলোকে তিনি বন্ধুকে দেখেছেন দ্যুলোকে-ভূলোকে পরিব্যাপ্ত—দেখেছেন ধরার ধূলার পরে স্বর্গ-সৃষ্টির দিব্য স্বপ্ন! প্রাণের ঠাকুরের কাছে এই মিনতি তিনি জানিয়েছেন বারবার, যেন তাঁর পূজার জন্য রক্ত-শতদলের যে অর্ঘ তিনি সাজিয়ে রেখেছেন তা সুন্দর ও সার্থক হ'য়ে ওঠে। এমনি করে' কত ভাবে, কত ছন্দে করেছেন তিনি আনন্দময়ের বন্দনা। ফল-কথা, অনুরাগের আবেগে দুর্লভের দুরাশায় দুর্গমের পথে তাঁর অভিসার। এই পথ-চলার তো বিরাম নেই,—দুর্যোগের ঘন তমিস্রায় বংকিম সংকীর্ণ পথে চকিত তড়িদালোকে করেছেন তিনি তীর্থ-যাত্রা। এত দুঃখের পরেও হয়তো ক্ষণিকের দেখা পেয়েছেন, না হয় ফিরে এসেছেন ব্যর্থতার অশ্রুসম্ভার নিয়ে। আবার কত দীর্ঘ অতন্দ্র রাত্রি কেটেছে তাঁরই পথ চেয়ে, কখন শুধু এই পথ-চাওয়াতেই পেয়েছেন আনন্দ, আবার সহসা যখন মিলেছে সুন্দরের বাঞ্ছিত দর্শন তখনই জেনেছেন 'ধন্য এ জাগরণ, ধন্য এ ক্রন্দন, ধন্য রে ধন্য'। কবি গোবিন্দদাসও এই অভিসারোৎকণ্ঠার চিত্রটি কি মর্মস্পর্শী ভাষায় অংকিত করেছেন!

গগনহিঁ নিমগন দিনমণি-কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন-রাতি॥
ঐছন জলদ করল আঁধিয়ার।
নিয়ড়হিঁ কোই লখই নাহি পার॥
চলু গজ-গামিনী হরি-অভিসার।
গমন নিরংকুশ আরতি বিথার॥
চৌদিগে অথির পবন তরুদোল।
জগ ভরি শীকর-নিকর-হিলোল॥
চলইতে গোরী নগর-পুর-বাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কবাট॥

যব ধনি কুঞ্জে মিলল হরি-পাশ।
দূরহুঁ দূরে রহু গোবিন্দ-দাস ॥

উপরের এই উক্তি থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে দুঃখের সুরই রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুর। ঠিক বিপরীত; তিনি বুঝেছেন বড় সুখকে পেতে হ'লে চাই বড় রকমের আত্মদান—অনায়াস আরামের নিশ্চিন্ততার মধ্যে তাকে পাওয়া যায় না, মর্মশোণিতের রক্তাঞ্জলির বিনিময়ে তাকে পেতে হয়। হয়তো যে মিলন-মধুটুকু পাই তা ক্ষণিক, কিন্তু সেই ক্ষণিকের পাওয়াই আজীবনের চাওয়াকে তোলে ভরে'—দুঃখরাত্রির সকল অশ্রুজলকে করে সফল। তাই আসলে আনন্দ-বাদই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা-ভূমি—প্রেম-রসায়নে দুঃখের সুখে রূপান্তরই তাঁর স্বরসপ্তকের কেন্দ্রগত সুর। তাঁরকাব্য-রূপায়ণের সর্বাঙ্গে একটি সুগভীর প্রত্যয়ের আনন্দ জলধনুর বর্ণ-সৌন্দর্যে ঝল্‌মল্ ক'রছে।

সংস্কৃত কবি বলেছেন, সংগম ও বিরহ এই দুয়ের মধ্যে যদি কেউ আমাকে একটিমাত্র বেছে নিতে বলে তবে আমি বিরহকেই চাই, কারণ মিলনে তো তাঁকে পাই এককরূপে, আর বিরহে তাঁরই সত্তা হয় ত্রিভুবনময় পরিব্যাপ্ত। তাই তিনি বিরহকেই কামনা করেছেন মনে-প্রাণে। এই ভাবটিকেই চণ্ডী-দাস চমৎকার প্রকাশ করেছেন তাঁর ব্যঞ্জনাময় ভঙ্গিতে; 'দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'—এই পংক্তিটিতে দেখি নায়ক-নায়িকা পরস্পর আশ্লেষ-বদ্ধ হ'য়েও প্রত্যাসন্ন বিরহের সম্ভাবনায় হ'য়েছে আকুল।* রবীন্দ্র-নাথের 'তুমি যদি না দেখা দাও, কর আমায় হেলা, কেমন করে' কাট্‌বে আমার এমন বাদল-বেলা?' অথবা বিদ্যাপতির 'তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুরিক পাঁতিয়া, বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোঁয়ায়বি হরি বিনু দিন-রাতিয়াঁ।' যখন শুনি তখন কি এদের বেদনাময় ইঙ্গিত আমাদের মনকে দূর বিরহের অশ্রু-লোকে নিয়ে যায় না? বিরহের বিলাস এ নয়—দুঃসহ তপস্যার দীপ্র হোম-শিখা!

* প্রেমবৈচিত্ত্য

তা' ছাড়া, কবির মনের গভীরে একটী যাযাবর কত পথে-প্রান্তরে নিরন্তর তাঁকে বেদুইনের মত ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। পথ-চলার জন্যেই এই চলা, এর অন্য কোন লক্ষ্য নেই—'পথে চলাই সেই তো তোমার পাওয়া'। তাই কবি বলেছেন,—

ভাবি নাইক কেন কিসের লাগি'
ছুটে চলে এলেম পথের পরে।
নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সুখ,
বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুক,
প্রতিপদেই অন্তর উৎসুক
অজানা কোন্ নিরুদ্দেশের তরে।

কাজের তাগিদে যে ঘরপানে ছুটেছে স্বভাবতই সে পথ সংক্ষেপ করতে চায়—পথের সৌন্দর্যে তার নেশা লাগে না। কিন্তু ঘর ছেড়ে যে পথে বেরিয়েছে পথেরই মায়ায়, সে তার মাধুর্যের প্রত্যেক বিন্দুটি পর্যন্ত আস্বাদ করে' চলতে চায়। একই মন কখন হয় ঘরমুখী, আবার কখন হয় ঘর-ছাড়া; কখন সে চায় ধূসর সন্ধ্যায় ক্লান্ত কপোতের মত কুলায়ে ফিরে যেতে, কখন বা চায় চঞ্চলা বন-হরিণীর মত ধরণীর বিপুল ব্যাপ্তির মধ্যে ছন্দো-হিল্লোলে ছুটে বেড়াতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যও এই ঘর-ছাড়া ও ঘরে-ফেরার গান; এর সঙ্গে মিশে আছে কত না-পাওয়ার বেদনা, কত ফিরে-পাওয়ার আনন্দ—কত ঘরে-ফেরার ব্যাকুলতা, কত পথ-চলার উল্লাস! রবীন্দ্রনাথের চোখে ঘর ও বাহির, সুখ ও দুঃখ, জীবন ও মৃত্যু কিছুই চরম বা অন্যনিরপেক্ষ নয়। আপাতদৃষ্টিতে যাদের বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন মনে করি আসলে তারা পরস্পরের পূরক। কাজেই কবির দৃষ্টি অথবা সৃষ্টি-তত্ত্বকে অধিবিদ্যার কোন পরিচিত কোঠায় ফেলা সত্যিই একটু কঠিন হ'য়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবি ও দার্শনিক তাঁদের ধ্যান ও জ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে যুগপৎ বর্তমান। দার্শনিক তুলছেন সমস্যা, ফেলছেন ছায়া, কবি তাঁর ধ্যান-

দৃষ্টির সন্ধানী আলো ফেলে সংশয়ের কুহেলি-জাল কাটিয়ে দেখছেন বিশ্বাসের ধ্রুব দীপ্তি। সুখ-দুঃখ-বিচিত্র জীবন-পথে এই বিসর্পিত অভিসারের চিত্রই কবির কাব্যে অলকস্তরের বর্ণসুষমায় রঞ্জিত হ'য়ে আছে।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের মত রবীন্দ্র-কাব্যেও শান্ত-দাস্যাদি সব রসের দ্যোতনা আছে; কিন্তু বৈষ্ণব-কাব্যে যেমন বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের মধ্য দিয়ে মূলত উজ্জ্বল রসেরই আস্বাদ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সেরূপ নয়; তাঁর কাব্যে আমরা শান্ত-দাস্য ও সখ্য-রস-দ্যোতক পদেরই অধিক সাক্ষাৎ পাই। কবি তাঁর অন্তরাবেগ প্রকাশের জন্য কোন বিশেষ বিগ্রহের পরিকল্পনা করেন নি; ভক্ত ও ভগবানের প্রেম-সম্বন্ধকে সুফী অথবা বৈষ্ণব কবিদের মত 'আশিক ও মাশুক' অথবা রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিলাসরূপে অংকিত করেন নি; তাই পদাবলী অথবা সুফী সাহিত্যে অপ্রাকৃত প্রেমের বিকৃত ব্যাখ্যার যে অবকাশ আছে রবীন্দ্রকাব্যে তার বিন্দুমাত্রও নেই। তাই একদিকে যেমন এই সাহিত্য প্রকাশের মহত্ত্বের দিক দিয়ে অতুলনীয়, ভাবাবেগের তীক্ষ্ণতার দিক দিয়ে তেমনি উল্লিখিত সাহিত্য-দুটির অনেক নীচে। ভাব-গদ্‌গদকণ্ঠে যখন পড়ি—

'আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন;
আজকে জীবন-সমর্পণের গান
গাবো নীরব অবসরে!'

তখন হৃদয়ে অলক্ষ্যের দোলা হয়ত লাগে; কিন্তু যখন শুনি,—

'ধনি ধনি রমণী-জনম ধনি তোর!
সব জন 'কানু কানু' করি ঝুরয়ে
সো তুয়া ভাবে বিভোর।'

তখন রক্তমাংসের একটা জীবন্ত স্পর্শে সমস্ত চৈতন্য হয় পুলক-বিহ্বল।

কবি ভগবানকে কখন সম্বোধন করেছেন 'রাজা', 'রাজার দুলাল', 'প্রভু', "ত্রিভুবনেশ্বর' অভিধায় (দাস্য), কখন 'পরাণসখা', 'খেলার সাথী', 'বন্ধু' নামে

(সখ্য), কখন বা 'পথিক', 'বিদেশী', 'কাণ্ডারী' অথবা শুধু 'তুমি' বলে। উজ্জ্বলরসের পদ রবীন্দ্রনাথের রচনায় খুবই কম ; মধুর কবিতাবলীতে যেখানে ভগবান কল্পিত হ'য়েছেন 'প্রিয়তম'-রূপে সেখানেও দূরত্বের বাধা একেবারে ঘোচে নি—হৃদয়ে হৃদয় একাকার হ'য়ে যায় নি মিলিয়ে। দূরের দেবতা নিকটে এসেছেন বাহুবন্ধনে ধরা দিতে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সংকোচের সূক্ষ্ম জালিকাখানি যায় নি সরে'—যেন বিদ্যুদ্‌গর্ভ দুটি উন্মুখ হৃদয় ভাবোচ্ছ্বাসের একটি অনুকূল দমকা হাওয়ার অপেক্ষায় পরস্পরের পানে অনিমেষ দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে !

বৈষ্ণবকবির প্রেমিকযুগলের কিন্তু সামান্য 'হারে'র ব্যবধানটুকুও সয় না ;* তাদের 'পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি' ; তাদের 'প্রতি অঙ্গের জন্য প্রতি অঙ্গ কেঁদে হয় সারা,' 'লক্ষ লক্ষ যুগ ধ'রে হৃদয়ে হৃদয় রেখে'ও তাদের তৃপ্তি হয় না। রাধা ভুলে গিয়েছেন যে কৃষ্ণ সর্বৈশ্বর্যময় ভগবান, প্রেমের আতিশয্যে তিনি মনে করেন কৃষ্ণ তাঁর একান্ত আপন। সমানে সমানেই হয় ভালবাসা, প্রভুর সঙ্গে কি প্রেম চলে! ভাবাবেগের উচ্চতম স্তরে আরাধ্যের সঙ্গে শ্রীরাধা একীভূত হ'য়ে গিয়েছেন, 'না সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি।'—এই আবেশময় সুর, প্রেমরসায়নে দুয়ের একে পরিণতি রবীন্দ্রকাব্যে কোথাও নাই। গীতাঞ্জলির 'তাই তোমার করুণা আমার পর, তুমি তাই এসেছ নীচে। আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।'—প্রভৃতি পদ আমাদের মনের পটে কোন গভীর রেখা আঁকে না, শ্রুতি-পথেই প্রতিহত হ'য়ে আসে ফিরে। ত্রিভুবনের ঈশ্বর যিনি তাঁকে আমার কোন প্রয়োজন নেই, তিনি তো সকলের ; আমি আমার হৃৎপদ্মাসনে গহন বিজনে বসাতে চাই আমার হৃদয়েশ্বরকে।

'ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি না মানে ব্রজ-জন॥

---

* 'চির চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥'—বিদ্যাপতি।

কেহ তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদূখলে বান্ধে।
কেহ সখাজ্ঞানে জিনি চড়ে তাঁর কান্ধে॥'

এই হ'ল ব্রজলীলারসের চরম তাৎপর্য! অবশ্য 'এস হৃদয়ে এস, হৃদিবল্লভ, হৃদয়েশ' প্রভৃতি চরণও ক্বচিৎ পাওয়া যায় তাঁর কাব্য-মঞ্জুষায়, তবে সেখানেও মাধুর্য-রস তেমন দানা বাঁধে নি। 'নয়নে নয়ন মিলান,' 'হাতে হাত-রাখা,' বড় জোর 'ঘুমের মাঝে কাছে এসে বসা,' 'মালার পরশ লাগা' পর্যন্ত তিনি এগিয়েছেন, বুকে বুক রাখ্‌তে বুঝি তাঁর শালীনতায় বেধেছে। তাই সেই নির্বাধ নৈকট্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করা কিছুতেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। সময় সময় আবার ঈশ্বরকে মাতা, পিতা অথবা বন্ধুরূপে কল্‌পনা করায় বিশ্ব-রূপকে খণ্ডিত করা হ'য়েছে মনে করে' কবি যেন নিজের কাছেই নিজে কুণ্ঠিত হ'য়েছেন। উপনিষদের শিক্ষা তাঁর মনকে মূর্তি-কল্‌পনার বিরোধী ক'রেছে, তাই তিনি বৈষ্ণব কবিদের রসোল্লাসের তুরীয় স্তরে উঠতে পারেন নি; তাঁর কাব্যের পটভূমি ব্যাপ্তিতে বিশাল, কিন্তু আবেগের অন্তর্মুখতায় তেমন প্রখর নয়। প্রকাশ-শৈলীর এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যই রবীন্দ্র-কাব্যকে পদাবলী সাহিত্য থেকে পৃথক করে' রেখেছে। দুটি অতি-পরিচিত মানুষের সম্বন্ধের মধ্যে প্রেম যেমন দানা বাঁধে, অজ্ঞাত ভাব-বিগ্রহের মধ্যে কখনই তেমন সম্ভব নয়। লৌকিক রূপ-প্রতিমায় আরোপিত না হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট সাহিত্য আমাদের কাছে কিছু অস্পষ্ট ও দুর্বোধ, —যেন স্তোক-জ্যোৎস্না যামিনীর গহন মায়া। অন্যথা, আবেগের তীব্রতা ও প্রকাশের স্বচ্ছতাই পদাবলীর মুখ্য সম্পদ্‌।

তা ছাড়া, অনেকসময়েই রবীন্দ্রনাথ ভগবানের রুদ্র-রূপের দ্বারা অভিভূত হ'য়েছেন। রুদ্রের যে প্রচণ্ড-মনোহর রূপ উপনিষদের ঋষিদের মনে যুগপৎ ভয় ও ভক্তিভাবের সঞ্চার করেছিল রবীন্দ্রনাথও সেই প্রকাণ্ড সৌন্দর্যের দ্বারা অভিভূত হ'য়েছেন। 'বিশ্বতশ্চক্ষুঃ, বিশ্বতোমুখ' যিনি, বৈষ্ণবকবিদের মত তাঁকে কেবল ছোট করে'—আপনার জন করে' দেখে তাঁর চিত্ত তৃপ্তি

মানে নি, তাই তাঁর রূপের বৈপুল্যে সম্মোহিত কবি বারবার ভয়মিশ্র ভক্তি নিবেদন করেছেন তাঁর চরণে। শ্রুতি উদাত্ত-গম্ভীরস্বরে বারংবার বলেছেন "সর্বজীবের বৃহৎ শরণ' তিনি, ('সর্বস্য শরণং বৃহৎ') 'তাঁর ভয়ে অগ্নি ও সূর্য তাপ বিকিরণ করে, তাঁর ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও মৃত্যু যথানিয়মে নিজ নিজ কাজ করে' চলে', 'মহান্ অগ্র্য পুরুষ, উদ্যতবজ্র মহদ্ভয়' তিনি। তাই ঋষি-কণ্ঠে প্রার্থনা-বাণী ধ্বনিত হ'য়েছে—'হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন দক্ষিণ মুখের দ্বারা আমাকে নিত্য পালন কর!' (শ্বেত ৪।২১) রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় এই ভাবটিই সুন্দর রূপ পেয়েছে। বৈষ্ণব-কাব্যে কিন্তু কোথাও এই সুর—গঙ্গোত্রী-নিঃসৃত জাহ্নবীর এই জয়ধ্বনি নেই, সেখানে আছে মঞ্জীর-চরণা তটিনীর মঞ্জুল শিঞ্জন! নীচের উদ্ধরণগুলি থেকেই সুরের এই পার্থক্যটি প্রতীয়মান হবে :—

রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি এসেছে দুয়ার ভেদিয়া।
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎ-বাণ স্বপ্নের জাল ছেদিয়া। (সুপ্রভাত)
* * * এই শুধু জানি মনে
সুন্দর সে, মহান্ সে, মহাভয়ংকর,
বিচিত্র সে, অজ্ঞেয় সে, মম মনোহর। নৈ ৮৮
তব প্রেমে ধন্য তুমি করেছ আমারে
প্রিয়তম, তবু শুধু মাধুর্য-মাঝারে
চাহিনা নিমগ্ন করে' রাখিতে হৃদয়।
* * * *
তোমার মাধুর্য যেন বেঁধে নাহি রাখে,
তব ঐশ্বর্যের পানে টানে সে আমাকে। নৈ ৮২

কবির লিখিত 'রাজা' নাটকেও এই রূপ ও অরূপের দ্বন্দ্বটী রূপকচ্ছলে বর্ণিত হ'য়েছে। রাণী সুদর্শনার চোখে 'রাজা' যুগপৎ ভীম ও কান্ত, অধৃষ্য অথচ অভিগম্য; ঐশ্বর্য দিয়ে তিনি অভিভূত করেন, আবার মাধুর্য দিয়ে

টানেন কাছে। রাণী যখন বল্লেন, 'অন্ধকারের মধ্যে যখন তোমাকে দেখ্‌তে না পাই অথচ তুমি আছ বলে' জানি তখন এক একবার কেমন একটা ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।' রাজা তখন উত্তর ক'র্‌লেন, 'প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে রস হাল্‌কা হ'য়ে যায়।'

সুফী কবিগণের প্রেরণার মূলেও এই অপ্রাকৃত প্রেম অথবা মুহাব্বৎ অর্থাৎ সৌন্দর্যের নিগূঢ় সম্ভোগের জন্য অন্তরের তীব্র অভীপ্সা। রূপ-গুণের অতীত এই সৌন্দর্য কামনার আবিলতায় হয় নি মলিন। সব মায়ার বন্ধন পিছনে ফেলে প্রেমের পিছল পথে বেরিয়ে পড়েছে যে সুন্দরের সাধনায়, সেই ব্রতী তাপসই সুফী কাব্যের প্রধান আলম্বন। এক কথায়, চণ্ডীদাসের রামীর প্রেমের মতই এই রস উন্নতোজ্জ্বল—'রজকিনী-রূপ কিশোরী-স্বরূপ, কামগন্ধ নাহি তায়'। ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ-নির্ণয়ে 'আশিক ওয়া মাশুকে'র কল্‌পনা মধুর রসের প্রেমিক-প্রেমিকার কল্‌পনারই অনুরূপ। বৈষ্ণব কাব্যের মতই এই সুফী কাব্যও নানা ভাবস্তরের মধ্য দিয়ে পূর্ণ মিলন-সমাধি লাভ করে। প্রেমিক-প্রেমিকার অভিন্নতা-উপলব্ধিই এই মিলন। বিচ্ছেদের করুণ বেদনায় মধ্যেও আছে অচির-মিলনের এক সূক্ষ্ম সুখানুভূতি, তাই মীরার মত, কবীরের মত, রবীন্দ্রনাথ এবং বৈষ্ণবপদকর্তৃগণের মতই, মরমী সুফী কবিও বিচ্ছেদের মধ্যেই চেয়েছেন মিলনের 'ক্ষণ-দীপ্ত টীকা', কারণ সাধন-পথের এই ক্লেশকে এড়িয়ে গেলে লব্ধ আনন্দের গভীরতাও যায় কমে'। বিশ্ব-বিশ্রুত কবি হাফিজের নিম্নলিখিত ভাবটি কি রবীন্দ্রনাথের বিরহ-চিত্রের সহিত হুবহু মিলে যায় না?—'হে আমার প্রিয়, কি ছার সে দৃষ্টি যা তোমার মুখের আভায় হয় নি উজ্জ্বল, তোমার দ্বারতলের ধূলির প্রসাদ যে পায় নি, কি পেয়েছে সে এ জীবনে? তোমার বিরহের বেদনায় যদি আমার চোখের জল শোণিতের ধারায় পড়ে ঝরে' কি বিস্ময় তাতে?'

এর পর আছে একান্ত আত্মসমর্পণের * চিত্তহারী চিত্র—করুণায় আর্দ্র,

* যোগদর্শনে এরই নাম 'ঈশ্বর-প্রণিধান'। যোগভাষ্যে মহর্ষি বেদব্যাস এর অর্থ ক'রেছেন এইরূপ—'ঈশ্বর-প্রণিধানং সর্বক্রিয়াণাং পরমগুরৌ অর্পণং তৎফলসংন্যাসো বা।'

মমতায় মেদুর, বিশ্বাসে সমুজ্জ্বল, ভাব-মাধুর্যে অনির্বচনীয়! কবি ব'লেছেন,—

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি
আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী,
আমার চোখের চেয়ে-দেখা, আমার কানের শোনা
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা,
আমার বলে' যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার করে' দেবো, তখন তারা আমার হবে। গী. মা ১০১

ভক্তকবি মীরাও গেয়েছেন,—

মীরাকে প্রভু সাঁচী দাসী বনাও।
ঝূঠে ধঁদোসে মেরা ফঁদা ছুড়াও॥

অথবা,

প্যারে দরসন দীজ্যো আয়,
তুম বিনা রহ্যো ন জায়॥
জল বিন কঁবল, চঁদ বিন রজনী
ঐসে তুম দেখ্যা বিন সজনী॥
আকুল ব্যাকুল ফিরূঁ রৈণ-দিন,
বিরহ কলেজো খায়॥
দিবস ন ভুখ, নীঁদ নহি রৈণা
মুখসূঁ কথন ন আবৈ বৈণা॥
কহাঁ কহূঁ কুছ কহত ন আবৈ
মিল কর তপত বুঝায়॥
ক্যুঁ তরসাবো অঁতরযামী,
আয় মিলো কিরপা কর স্বামী!
মীরা দাসী জনম-জনমকী,
পরী তুম্হারে পায়॥

প্রেমের পরম পরীক্ষা এই আত্ম-ত্যাগে। জীবনের কামনাকণাটুকুও ইষ্ট-চরণে নিবেদন করে' দিয়ে উভয়েই সে-পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হ'য়েছেন। 'উজ্জ্বল'-ভাষ্যে শ্রীজীবগোস্বামী রাগের পরাকাষ্ঠা-প্রতিপাদন-প্রসঙ্গে ব'লেছেন 'কুলবধূগণের চরম দুঃখের কারণ স্বজন ও আর্যপথ হ'তে চ্যুতি, বহ্নি-দহন অথবা মরণ নয়। তবু যে তাঁরা সেই অগৌরবকেও স্বেচ্ছায় বরণ করেন অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি ও লোকবিধি লঙ্ঘন ক'রতে সাহসী হন তার কারণ কৃষ্ণসঙ্গ-সুখের জন্য তাঁরা সর্বস্ব-ত্যাগে প্রস্তুত। এবং এই লজ্জা-ত্যাগেই রাগে পরমোৎকর্ষ সূচিত হয়।* গীতার মধ্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর-প্রাপ্তির জন্য সর্ব-সমর্পণের যে পথ-নির্দেশ করেছেন, নিঃস্বত্ব আত্মদানের যে সুধাময় উপদেশ দিয়েছেন, একমাত্র ব্রজগোপীদের দুর্লভ সাধনার মধ্যেই তা হ'য়েছিল মূর্ত। মানুষের আত্মার প্রতি আসক্তি যেমন স্বতঃস্ফূর্ত এবং কোন কারণের অপেক্ষা রাখে না, তেমনি এই ব্রজবধূদের কৃষ্ণপ্রীতিও ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও অহেতুক। চরিতামৃত বলেছেন,—

'পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার নাহি অন্যত্র প্রকাশ ॥'

তাঁদের ধ্যান-জ্ঞান, চিন্তা-চেষ্টা সবই ছিল সেই আত্মরূপী কৃষ্ণকে ঘিরে। শ্রীরাধার প্রেম-প্রসঙ্গে চণ্ডীদাস বলেছেন,

'হাহা প্রাণ-প্রিয় সখী কিনা হৈল মোরে।
কানু-প্রেম-বিষে মোর তনু-প্রাণ জারে ॥
রাত্রিদিন পড়ে মনে সোয়াথ না পাঙ্।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ্ তাঁহা উড়ি যাঙ্ ॥

রবীন্দ্রনাথের উৎসর্গ-কাব্যের 'প্রবাসী' কবিতাটিতে এই সর্বানুভূতির চিত্রটি অপরূপ কাব্য-সুষমায় মণ্ডিত দেখি—

---

* দুঃখস্ত পরমকাষ্ঠা কুলবধূনাং স্বয়মপি পরমমর্যাদানাং স্বজনার্যপথাভ্যাং ভ্রংশ এব, নাগ্ন্যাদিনা চ মরণম্। ততশ্চ তৎকারিতয়া প্রতীতোঽপি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধঃ সুখায় কল্পতে। চেৎ তর্হ্যেব রাগস্য পরমোৎকর্ষতা।

ধূলামাঝে আমি ধূলা হ'য়ে রব সে গৌরবের চরণে।
ফুলমাঝে আমি হব ফুলদল তাঁরি পূজারতি-বরণে।
যেথা যাই আর যেথায় চাহি রে
তিল ঠাঁই নাই তাঁহার বাহিরে,
প্রবাস কোথাও নাহিরে নাহিরে জনমে জনমে মরণে।

নৈবেদ্য-কাব্যের ৪০ সংখ্যক কবিতাতেও এই সুগভীর অনুভূতিটি অনুপম রূপ-রেখায় অংকিত হ'য়েছে।

অপিচ, রবীন্দ্রনাথের রহস্য-কাব্যের আর একটা দিক আছে যেখানে তিনি তাঁর পূর্বগামী কবিদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমি তাঁর 'জীবন-দেবতা'-পর্যায়ের কবিতাগুলির কথাই বল্‌ছি। ইন্দ্রিয়-ভোগ্য সুন্দর সুন্দর কবিতা সৃষ্টির পরে কবির সাম্‌নে হঠাৎ মায়া-পথের রুদ্ধ দুয়ার খুলে গেল, কোথা থেকে তাঁর মনে এক ঝলক অচেনা আলোক এসে পড়ল ; দূর বসন্তের হাওয়ায় প্রাণে লাগ্‌ল দোলা—কবি অনাস্বাদিত আনন্দের বেদনায় জগৎকে নূতন চোখে রঙীন্ করে' দেখলেন—

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।"

এতদিন মনের অবরুদ্ধ কক্ষে জীবনকে খণ্ডিত করে' দেখেছিলেন, আজ বুঝলেন বাহিরের বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে তাঁর একটি নিগূঢ় সংযোগ আছে। ঘর যতক্ষণ বন্ধ থাকে ততক্ষণ মানুষ সেই গৃহাকাশের মধ্যেই পায় তার প্রাণ-শ্বাসের উপকরণ ; কিন্তু দক্ষিণের বাতায়ন যখন খুলে যায় তখন ঘরের আকাশের সঙ্গে বাহিরের আকাশের হয় গলাগলি। জীবন তার ক্ষণিকতাকে অতিক্রম করে' চিরন্তনের স্বপ্নে হয় মগ্ন। মনুষ্য-প্রকৃতির মধ্যেই আছে দুটি মন—নিজত্ব ও মানবত্ব ;* উপনিষৎ-কথিত এক শাখায় দুটি পাখীর মত তারা জীবদেহে বাস করে। একটি তার স্বার্থ ও প্রবৃত্তিগুলিকে ঘিরে একটি

* মুণ্ডক ৩।১।১

সুস্পষ্ট অর্থের জগৎ রচনা করে, অপরটি এই স্বার্থ-চক্রের বাহিরে অনুভূতি-লোকে উড়ে বেড়ায়। এই দ্বিতীয় মনটার আর এক নাম দিয়েছেন কবি 'বিশ্ব-মানব-মন'। মানুষের চৈতন্য যখন সম্মোহিত হয় এর ইন্দ্রজালে তখন সে সংসারের সব ভুলে এর ইঙ্গিতে জীবনের পরম তাৎপর্যের দিকে চলে এগিয়ে। শুধু ফুল-ফোটানই এর কাজ নয়, অথবা পুষ্পজন্মকে ফল-পরিণতির মধ্যে মুক্তি দেওয়াই এর চরম লক্ষ্য নয়—পুষ্প-জীবনের অলক্ষ্য ধারাটিকে এ ধরে' রাখে জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে। এই যে রহস্যময় অদৃশ্য শক্তি, এরই নাম দিয়েছেন কবি 'জীবন-দেবতা'। ইনি প্রভু ন'ন, এঁর চরণে মাথা কুটে মিনতি জানাতে হয় না, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আমাদের মনের ফুল-বনে এঁর মালা-গাঁথার কাজ চল্‌তে থাকে। এই বিবর্ত-চেতনাই কবির "জীবনে সমস্ত যোগ-বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছে।" এই ভাবটিকেই কবি তাঁর 'অন্তর্যামী' কবিতায় চমৎকার রূপ দিয়েছেন,—

'বলিতেছিলাম বসি' একধারে
আপনার কথা আপন জনারে
শুনিতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত।
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।'

আমাদের ভিতরকার ক্ষুদ্র মনকে বৃহৎ মনের সংস্পর্শে নিয়ে যাওয়া, একের কথাকে সকলের বাণী করে' তোলা, টুকরা বিচ্ছিন্ন সুরের দলগুলিকে সঙ্গীতের শতদলে ফুটিয়ে তোলাই হ'ল এর একমাত্র কাজ। মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিবর্তনের পিছনে এই যে তড়িৎ-শক্তি, রবীন্দ্রনাথের মতে এই চেতনা বা

শক্তিই তাঁর জীবন-দেবতা। একদিকে এ দক্ষ সারথির মত মনোরথের গতি নিয়মিত করে, অন্যদিকে নিপুণ শিল্পীর মত জীবনের ক্ষণলগ্নগুলিকে চিরন্তনের মণিমালিকায় গেঁথে তোলে। অচিহ্নিত অতীত থেকে বর্তমানের বিকাশের মধ্যে চিরন্তনের তন্তুটি টেনে এনেছে সে, জন্ম থেকে জন্মান্তরের মধ্যে করেছে পারাপারের সেতু-রচনা। 'বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্ব-ধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার মনের মধ্যে রহিয়াছে।' তাই কবি ব'লেছেন,—

'আজ মনে হয় সকলের মাঝে
তোমারেই ভালবেসেছি,
জনতা বাহিয়া চিরদিন শুধু
তুমি আর আমি এসেছি।

* * * *

লক্ষ বরষ আগে যে প্রভাত
উঠেছিল এই ভুবনে
তাহার অরুণ-কিরণ-কণিকা
গাঁথ নি কি মোর জীবনে ?

এই বিবর্তচেতনা একটি স্বয়ংক্রিয় শক্তি, এ নিজত্বকে মানবত্বে প্রসারিত করে, ছোট-আমিকে বড়-আমির অতলতায় অবলুপ্ত করে' দেয়। শেলীর প্রেম বা অধ্যাত্ম-সৌন্দর্য, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতি, অথবা কীট্‌সের সৌন্দর্যের মতই রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা আত্মাভিব্যক্তির একটি জীবন্ত প্রেরণা। ঈথর-প্রবাহের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যেমন খেলে বেড়ায়, তেমনি এই চিজ্জড়াত্মক প্রকৃতির মধ্য দিয়ে অনাহত ব'য়ে যাচ্ছে একটি আনন্দ-তরঙ্গ; ব্যক্তি-মনে লাগে না এই আনন্দের স্পর্শ—বিশ্বমনের তারে জাগে এর সুরের হিল্লোল। রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় ভাষায় বলি, 'আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ, সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ,

আমার সমস্ত বুদ্ধি-মন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ বিশ্ব-জগৎ, অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ জগৎ আপ্লুত করিয়া আছে।' কিন্তু কবি-চিত্তের এই বিবর্ত-চেতনাকে আমরা যেন ভগবান বলে' ভুল না করি।

'ক্ষণিকা'র মধ্যে পাই অলক্ষ্যের একটা অস্পষ্ট আভাস, অস্ফুট বেদনা। ভাব তখনও কোরকের অবস্থায়, অথচ তার চারিপাশে পুষ্প-পল্লবের, গীতি-গুঞ্জনের সমারোহের আর অন্ত নেই। 'আবির্ভাব' কবিতাটিতে কবি বলেছেন, বসন্তের আনন্দের মধ্যে যাকে পান নি, আজ পেয়েছেন তাকে বর্ষার এই সজল মায়ায়, ফাল্‌গুনের ব্যথা শ্রাবণের অশ্রু-বর্ষণে কদম্ব হ'য়ে উঠেছে ফুটে। দুঃখের এই সুখে পরিণতি, বেদনার আনন্দে পরিণতি, মৃত্যুর জীবনে পরিণতি রবীন্দ্রকাব্যে বারবার নানাভাবে ব্যক্ত হ'য়েছে। এই বিরহের মধ্যেই কবি-চিত্তের স্থিতি ও ব্যাপ্তি। বিরহের পটভূমি আছে ব'লেই মিলনের ক্ষণ-দর্শন হয় তীব্র ও নিবিড়। ক্ষণিকাতে যা ছিল কোরকের আকারে, নৈবেদ্যে ও উৎসর্গে তা একটু একটু করে' তার দলগুলি মেলে একটি ভাব-সুন্দর প্রসূন হ'য়ে ফুটে উঠেছে। সুদূরের বাঁশী কবি-হৃদয়কে করেছে চঞ্চল, মুক্ত-বাতায়নে বসে' দীর্ঘ প্রতীক্ষার পালা হ'য়েছে সুরু।* কবি তাঁর মনের ধূপটি জেলে দিয়ে সেই ধূসর ধোঁয়ায় করেছেন একটি রূপহীন গন্ধ-লোকের সৃষ্টি। মোটের উপর, 'মরণ-মিলন,' 'অতিথি' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে দিব্যানুভূতির অবভাস না থাক্‌লেও আভাস আছে সন্দেহ নেই। খেয়ার 'শুভক্ষণ' প্রভৃতি কবিতায় অধ্যাত্ম-দ্যুতির প্রকাশ আরও স্পষ্ট ও আবেগ-মধুর। কিন্তু তখনও তিনি 'রাজার দুলাল', প্রাণ-রমণ নন; তখনও তাঁর ঐশ্বর্যের রূপ, মাধুর্যের নয়। বুকের মণিহার তাঁর রথচক্রতলে যায় গুঁড়িয়ে। আবার কখনও তিনি

---

* আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী।
দিন চলে' যায় আমি আন্‌মনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে-মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী। (উৎসর্গ)

অকিঞ্চনের মত এসে পাতেন হাত, কৃপণ হৃদয় তাঁকে পরিমিত, কুণ্ঠিত দানের বিনিময়ে দেয় ফিরিয়ে। লজ্জা রাখ্‌বার ঠাঁই থাকে না যখন দেখি রাজ-ভিখারীকে যা দিয়েছিলাম, আমার করংকে তা সোনা হ'য়ে এসেছে ফিরে। এখনও প্রেমে জোয়ার জাগে নি, হিসাব-বুদ্ধি এখনও বৈরাগ্য-শ্রীকে রেখেছে ম্লান করে', এখনও কবি বল্‌তে পারেন নি,—

'তোমার আলোয় নাই তো ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর-বিধুর।'

'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'তে এই প্রত্যয় বাষ্পময় নীহারিকার অবস্থা থেকে জ্যোতির্ময় রূপ-লোকে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। জীবনে কর্মসূত্রে নানা সময়ে যারা এসেছিল তাঁর সংস্পর্শে, কবি তাঁর অন্তর-দেবতার পূজায় তাদের সকলকে জানাচ্ছেন তাঁর পূর্ণ প্রণাম। 'গীতালি'র 'কলিকা' কবিতাটিতে কি গভীর ও উজ্জ্বল এই বিশ্বাস!

'যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে',
যে-মণি দুলিল, যে-ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হ'য়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে!'

তার পরে 'বলাকা' প্রভৃতির কবিতাগুলিতে দুঃখ-বরণের মধ্য দিয়ে 'অভয়-শঙ্খ' লাভের সেই পরিচিত চিত্রটিই নূতন শক্তি ও সৌন্দর্যে বিকশিত হ'য়েছে। তা ছাড়া, এইখানে কবি-মন কিছুদিনের জন্য দার্শনিক অবলেপে আচ্ছন্ন হ'য়েছে। 'ছবি' কবিতাটিতে, 'সাজাহানের' শেষাংশে, বিশেষ করে

'দানের' মধ্যে কাব্য-রসের স্বচ্ছন্দ প্রবাহটি জটিল তত্ত্ব-বিশ্লেষণের মরুপথে তার ধারা হারিয়েছে। "হে প্রিয়, তোমাকে আমি কি দেব? যে অর্ঘ্যই দিই তাই তো শুকিয়ে ঝরে' যাবে! 'হোক্ ফুল, হোক্ না গলার হার, তার ভার কেনই বা স'বে একদিন যবে নিশ্চিত শুকাবে তারা, ম্লান ছিন্ন হবে?" এই বিচার, এই বিশ্লেষণ, এ তো প্রেমের সহজ ধর্ম নয়। প্রিয়তমকে দিই আমার অন্তরের ভাল-মন্দ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব কিছু, 'আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন' তা দেবার জন্য অপেক্ষা করে' বসে থাকি না। এই হিসাব-করা ভালবাসা ব্যক্ত করে বিশ্বাসের শিথিলতা, অন্তরের দৈন্য! বাস্তবিক, এ আনন্দ কবির বা ধ্যানীর নয়, দার্শনিকের; কাজেই যুক্তির সমারোহে আমাদের মনে বিস্ময় যতই উৎপন্ন হোক্ হৃদয় এতে মেতে ওঠে না।

জীবন গতিশীল, একের আহ্বানে নিরন্তর ছুটে চলেছে সে 'জানা হ'তে অজানায়' এটি একটি তথ্য মাত্র—একে বিশ্লেষণ করায় লাভ হয়তো আছে কিন্তু আনন্দ নেই। সত্যকে এখানে উপভোগ্য রূপ দেবার চেষ্টাই শুধু নেই, আছে যুক্তির শাণিত শল্যে তার অবয়বের নিপুণ ব্যবচ্ছেদ। যে ভাব-সত্যটি তাঁর অন্তরে স্বতই উদ্ভাসিত হ'য়েছে যুক্তির নিরিখে তাকে যাচাই করে' নেবার একটি প্রয়াস বলাকার প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় পরিস্ফুট। ধ্যানের ধনকে যুক্তি-সংকুল বিশ্লেষণের পথে নূতন রূপে আস্বাদ কর্‌বার আগ্রহ তাঁকে পেয়ে বসেছে।

অব্যক্তকে ব্যক্তের ভাষায়, বোধাতীতকে বুদ্ধির ভাষায় প্রকাশ ক'র্‌তে গিয়েই এসে পড়ে দুর্বোধতা। অন্ধ-লোকের দেশে হঠাৎ যদি একজন দৃষ্টি-শক্তি লাভ করে' অরুণোদয়ের জ্যোতির্মহিমা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে তবে সে যেমন উপহাস ও অবিশ্বাসের পাত্রই হয়, তেমনি মরমী কবির মর্ম-সঞ্চিত সুধা যখন উচ্ছ্বসিত আবেগের মধ্য দিয়ে হয় ক্ষরিত, তখন সংশয়-কঠিন মন তাকে দ্বিধাভরে দূরেই সরিয়ে রাখে। বাস্তবিক, সাধনাহীন জীবকে এই প্রেমাস্বাদের স্বরূপ বোঝান সহজ নয়। তা ছাড়া, লৌকিক

ভাষার শক্তিও বড়ই সীমাবদ্ধ, প্রয়োজন-সাধনের কাজেই তার সব উদ্যম যায় ফুরিয়ে। সীমার মাঝে অসীমের দৌত্য করার যোগ্যতা তার নেই। তাই তাকে ছন্দের দোলা দিয়ে লীলায়িত করে' অসীমের সাথে বাণী-বিনিময়ের কাজে লাগাতে হয়। চক্ষুষ্মানের কাছে আলোর জগতের প্রতীতি কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু সমগ্র ব্যক্তিত্বের অভিপ্রকাশ যে সাহিত্য, বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধির ভাষায় তার কাজ চলা ভার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ভঙ্গিতে এই কথাই ব'লেছেন, 'কিন্তু মুস্কিল এই যে মানুষকে যে-কথা দিয়া কবিতা লিখিতে হয় সে-কথার যে মানে আছে। এই জন্যই তো ছন্দোবন্ধ প্রভৃতি নানা উপায়ে কথা কহিবার স্বাভাবিক পদ্ধতি উলটপালট করিয়া দিয়া কবিকে অনেক কৌশল করিতে হইয়াছে, যাহাতে কথার ভাবটা বড় হইয়া কথার অর্থকে যথাসম্ভব ঢাকিয়া ফেলিতে পারে।" তবুও যেটুকু ফুটে ওঠে না-ফুটে-ওঠা অংশের তুলনায় তা কতই সামান্য! তাই অনেকটাই বরাত দিতে হয় ব্যঞ্জনার পরে'; যে কবি যে পরিমাণে এই ব্যঞ্জনার সঞ্চার করতে পারেন তাঁর কাব্যে, তাঁর রূপ-সৃষ্টিও হয় ততই হৃদ্য ও মর্মস্পর্শী। বিশ্ব-রহস্যের কেন্দ্র হ'তে যে আনন্দ-সঙ্গীত সুরে সুরে ভরে' তোলে কবির অন্তর, তার আভাসটুকুই শুধু দেওয়া চলে। সেই-আভাসের কনক-কণিকাটুকু সহৃদয়জনের হৃদয়ে প্রবেশ করে' বহুধা বিস্তৃত হ'য়ে বহায় ভাবের বিপুল পরিপ্লব।

আত্মানুভূতির প্রকাশে প্রতীক-কল্পনার স্থান তাই অতি উচ্চে। বাস্তবিক, প্রতীক এবং পুরাণ-রূপকই বুঝি বা রহস্য-সাহিত্যের ভাষা। কিন্তু এই প্রতীকের প্রয়োজন হয় কেন? সব বস্তুই যে তত্ত্বত এক এই প্রত্যয়কে ফুটিয়ে তুলবার জন্যে প্রতীক-কল্পনার প্রয়োজন আছে, কারণ এই প্রত্যয়ই তো রহস্যবাদের অগ্রভূমি। কিন্তু দিব্যানুভূতির দ্যোতনায় জন্য প্রকৃতি থেকে বেছে নিতে হবে এমন সব প্রতিকৃতি যাদের সঙ্গে প্রস্তুত বিষয়ের বস্তুগত একটা সাদৃশ্য আছে। কেবলা প্রীতিকে তাই প্রকাশ করি মানবীয় প্রেমের

ভাষায়, কারণ এই দুটি ভাবই, বিভিন্ন ক্ষেত্রে হ'লেও, একই নিয়মের অধীন ও অনুরূপ ফলই প্রসব করে। মানুষের মরণশীলতার দ্যোতক হিসাবে পাতা-ঝরার উপমা দেওয়া হয়, যেহেতু জীব-জীবনে মৃত্যুর যে শাশ্বত শাসন কাজ করে এ তারই সুষ্ঠুতম দৃষ্টান্ত। সসীম বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধ প্রত্যেক সত্যই কোন গভীরতর সত্যের নির্মোক ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং প্রতীকতার দ্বারা আমরা সেই অন্তর্লীন সত্যবস্তুকে প্রকাশ করি অন্য কোন উপায়েই যাকে বোঝা অথবা বোঝান যায় না।"*

বস্তু-বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সব মানুষেরই কিছু-না-কিছু আছে; কিন্তু আধ্যাত্ম উপলব্ধি আছে কয়জনের? কাজেই তার প্রকাশের ভাষাকেও সাধারণ মানুষের জ্ঞানের মধ্যেই আবদ্ধ রাখ্‌তে হয়। অথচ জ্ঞানের অতীত বা, পরিচিত প্রতীকের সাহায্যে তাকে প্রকাশ কর্‌'তে গেলেই তাকে ভুল বুঝ্‌বার অবকাশ থাকে প্রচুর। তাই অনেক সময়েই অতি উচ্চগ্রামের অধ্যাত্ম-সাহিত্যকেও চিত্তবিভ্রমকর চিত্র বলে' সন্দেহ করা হ'য়েছে। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদের মধ্যে 'মধুবিদ্যা' বা সোমযাগের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাকেও পরাবিদ্যা বা ঈশ্বর-সাধনার রূপক-হিসাবে গ্রহণ করাই সঙ্গত। সোম যদি লতামাত্র হ'ত, অথবা মত্ততা-সৃষ্টিই যদি সোমাভিষবের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ত, তবে এই বিশ্ব-বন্দিত গ্রন্থের সমগ্র নবম মণ্ডলটি সোমদেবতার উদ্দেশে কখনই উৎসৃষ্ট হ'ত না। 'সর্বদর্শী, সহস্রচক্ষু' এই দেবতা, 'এষো দেব অমর্ত্যঃ' (ঋক্ ৯।৬০।১)। বিশ্বামিত্র এই 'মধু' বা 'সোম'কেই ব'লেছেন, 'অক্ষয় অমৃত-পথ্য'। এই রস পান ক'রলে মানুষ হয় অমর—'অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্' (৮।৪৮।৩)। 'পানের দ্বারা এর ক্ষয় না হ'য়ে বৃদ্ধিই হয়।' এই সব উক্তি থেকে সোম-রসকে প্রেম-রস ব'লেই সন্দেহ হয় না কি?† পারশী সুফী-কাব্যে সাকী, পেয়ালা, সুরা প্রভৃতির ছড়াছড়ি;

* C. F. E. Spurgeon—Mysticism in English Literature.

† দ্রঃ শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল-লিখিত 'বেদ-প্রবেশিকা'।

সুরামত্ততার দৃষ্টান্ত দিয়ে সেখানে প্রেমমত্ততার ছবি আঁকা হয়েছে। বাস্তবিক, অন্য কোন লৌকিক প্রতীকের সাহায্যে কি এই দিব্যোন্মত্ততার চিত্র আঁকা সম্ভব ছিল? সুতরাং ভুল বুঝলেও উপায় কি? ধ্যানের বস্তুকে জ্ঞানের ভাষায় রূপ দিতে গেলে ভুল-বোঝার অবকাশ থাকেই। তবুও সব দেশের মরমী সাধকই অপ্রাকৃতের বর্ণনায় প্রাকৃতের সাহায্য নিয়েছেন। স্বয়ং যীশু তাঁর অধ্যাত্ম অনুভূতিগুলির ব্যঞ্জনা করেছেন বস্তু-জগতের নিয়মাবলীর সাদৃশ্যে। বৎসর-শেষের ফসল, বীজ ও বীজবপনকারী, রুটির খমির, মাঠের লিলি, কীট-পতঙ্গ, আগুন প্রভৃতির রূপক ভূরি ভূরি পাওয়া যায় তাঁর ধর্ম-দেশনে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতেও পরিচিত লৌকিক রূপক বিরল নয়।

Mysticism কোন তত্ত্ব বা মতবাদ নয়—একটা মানসিক ভংগিমাত্র। বিভিন্ন মরমী কবি সত্যকে দেখেছেন বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে এবং দৃষ্ট-বস্তু হয়েছে তাঁদের কল্পনার বর্ণসম্পাতে ভিন্ন ভিন্ন রঙে রঞ্জিত। মনের এই তুরীয় স্তরে আমাদের বস্তু-বিষয়ের অনুবোধ সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হ'য়ে যায়, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া যায় থেমে; তখন মানুষ কেবল একটি প্রাণময় সত্তায় হয় রূপান্তরিত। বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্রে অনারত যে ঐকতান ধ্বনিত হচ্ছে তার থেকে উদ্ভূত আনন্দের প্রেরণায় সে প্রাণ-উৎসের সন্ধান পায়। ঋষিকবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায় "We become a living soul." কিন্তু মুস্কিল এই যে অসীমকে প্রকাশ করতে হয় মানুষের ভাষায়—দিব্যানুভূতির প্রেরণা দিতে হয় নীরস, সাধন-দীনের চিত্তে। রবীন্দ্রনাথকেও এই লোকোত্তর বিরহ-মিলনের সুকুমার অনুভূতিগুলি প্রকাশ ক'রতে হ'য়েছে লৌকিক ভাবাবেগের পরিচিত মধ্যবর্তিতায়, কিন্তু কবি তাঁর কাব্যের মধ্যে এমন অপূর্ব ধ্বনি-সঞ্চার করেছেন যে ব্যঞ্জনার বিশালতায় তা অনায়াসেই লৌকিকের পরিলেখ পার হ'য়ে গেছে। শ্রেষ্ঠ শিল্প-সৃষ্টির জন্য চিত্তের যে নির্লিপ্ততা আবশ্যক, তা তাঁর কাব্যে আছে প্রচুর। কাজেই সহজেই তাঁর নিজস্ব অনুভূতিগুলি নিখিলের হৃদয়-সম্পদ

হ'য়ে উঠেছে। ভাবের ব্যঞ্জনার জন্য কবি যে সব ভাব-চিত্রের আশ্রয় নিয়েছেন, তা অনেক সময়েই সম্পূর্ণ অভিনব। রবীন্দ্র-পূর্ব সাহিত্যে তাদের সাক্ষাৎ কদাচিৎ পাওয়া যায়। এই অপরিচিতের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব সময় সময় তাঁর কাব্য-রসের পূর্ণ সম্ভোগে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্র-সাহিত্যে বর্ণ-গন্ধ-শব্দাদির কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই, তাই ইন্দ্রিয়সকল পরস্পরের নিষিদ্ধ সীমায় পদার্পণ ক'রতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করে না, হৃদয়ের অনুশাসন নিঃশব্দে বহন করে' চলে। তাই কখন তাঁর 'সুরগুলি পায় চরণ', কখন বা আলোর মৌন-মায়া সুরসুধায় হয় লীলায়িত। মাধ্যমের এই অভিনবত্বে কারো কারো কাছে তাঁর রচনা কিছু ঝাপ্‌সা মনে হয়, কোন কোন অংশ কিছু বা হেঁয়ালির মত শোনায়। কিন্তু ভাবের অ-গভীরতা এর কারণ নয়, প্রকাশ-শৈলীর প্রশংসনীয় বিশিষ্টতাই এর হেতু। যা হোক্, কাব্যরস আস্বাদনের বস্তু; বিশ্লেষণে তা'র কায়াকেই পাওয়া যায়, মায়াকে নয়। কবির ভাষাতেই বলি, 'মূর্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায় শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না।'

রবীন্দ্রকাব্যের অধ্যাত্মসম্পদ

রবীন্দ্রনাথ আবাল্য উপনিষদের সুধারসে লালিত ও বর্দ্ধিত। তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সে-সময়ে উপনিষদ্ধর্মের সর্বপ্রধান পুরোহিত ছিলেন, কাজেই তাঁহার পরিবারের মধ্যে সনাতন ধর্মের যে-হাওয়া রাত্রিদিন প্রবাহিত ছিল, বালক রবীন্দ্রনাথ নিজের অজ্ঞাতসারেই নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সেই হাওয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদীয় উপনয়ন-সংস্কারের উল্লেখ করিয়া কবি তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে লিখিয়াছেন,—"একবার পিতা আসিলেন আমাদের উপনয়ন দিবার জন্য। বেদান্তবাগীশকে লইয়া তিনি বৈদিকমন্ত্র হইতে উপনয়নের অনুষ্ঠান নিজে সংকলন করিয়া লইলেন। অনেকদিন ধরিয়া বেচারামবাবু প্রত্যহ আমাদিগকে উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে বারংবার আবৃত্তি করাইয়া লইলেন। আমার বেশ মনে আছে আমি "ভূর্ভুবঃস্বঃ" এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কি বুঝিতাম, কি ভাবিতাম স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, তবে ইহা নিশ্চয় যে কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় জিনিস নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় অঙ্গটা বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া।" উদ্ধৃত অংশ হইতে আমি দুটি জিনিসের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। প্রথমটি এই যে, কৈশোরেই কবি উপনিষদ্মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং উহার উদাত্ত গম্ভীর মন্ত্রনিচয় বালক-কবির হৃদয়-তন্ত্রে একটি অনির্ব্বচনীয়, বোধাতীত বেদনা-রাগিণী ঝঙ্কৃত করিয়াছিল। দ্বিতীয় কথা, mysticism-এর মর্মকথা;—বাল্য হইতেই কবি কোন জিনিস স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার পক্ষপাতী নহেন; যদি কোন সুর, ভাব, ভাষা তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে প্রেরণার ইংগিত বহন করিয়া আনে, তবে তাহাই তিনি যথেষ্ট মনে করেন। খোলাখুলি কথার মধ্যে রূপদক্ষের আনন্দ নাই—ঐ

যে চাঁদের চাহনি, তারকার কানাকানি, উহারা তো স্পষ্ট করিয়া আমাদের কিছু বলে না—আমাদের মনের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধরে অলোক-লোকের রুদ্ধ-কক্ষের কোন্ গুপ্ত বাতায়ন, আমাদের চিত্তশতদলের মর্ম-কোষে ঢালিয়া দেয় আনন্দ-নন্দনের কোন্ স্বপ্ন-সুধা!

"নিশার আকাশ কেমন করিয়া তাকায় আমার পানে সে!
লক্ষ যোজন দূরের তারকা মোর ভাষা যেন জানে সে।"—

এই ব্যঞ্জনা, এই ইংগিত, এই আভাসে ভাবের প্রকাশ, কল্পনার রঙে রাঙাইয়া কবি-তূলিকার এই নিপুণ আলিম্পন,—ইহাই হইল অতীন্দ্রিয় সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান কথা।

যাহা হউক, এই দৃশ্যমান বিশ্বের বস্তুগত বিরোধ ও বৈচিত্র্যের অভ্যন্তরে যে শাশ্বত সাম্য বিরাজিত, একত্বের যে-সূক্ষ্ম সূত্রখানি লোক-লোচনের অন্তরালে রহিয়া নানা এবং বহুকে বিচিত্র-কুসুম-দাম-গ্রথিত মাল্যের মত চিরদিন বিধৃত করিয়া রহিয়াছে, সেই সাম্য ও ঐক্যের সন্ধান, উপনিষদের স্তন্য-রসে লালিত এই বালক তদীয় কাব্যজীবনের অতি প্রত্যূষেই লাভ করিয়াছিলেন। যে ঋষিজনোচিত অন্তর্দৃষ্টি আমরা তাঁহার শেষ জীবনের কাব্যের মধ্যে লক্ষ্য করি, তাহা এই ঋষিবাণীনিচয়ের উৎসমুখেই জন্মলাভ করিয়াছিল। "প্রভাতসঙ্গীতের" "প্রতিধ্বনি" শীর্ষক কবিতার মধ্যেই এই দিব্যদৃষ্টির প্রথম আলোকপাত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গূঢ় আনন্দ বস্তুযবনিকাকে ছিন্ন করিয়া অজস্র উৎসে ফাটিয়া পড়িয়াছে অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে রচিত এই কাব্যগ্রন্থের অভ্যন্তরে। এই কবিতা সম্বন্ধে কবি স্বয়ং বলিতেছেন—"বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে সে কোন্ গানের ধ্বনি জাগিতেছে; প্রিয়মুখ হইতে, বিশ্বের সমুদয় সুন্দর সামগ্রী হইতে প্রতিঘাত পাইয়া যাহার প্রতিধ্বনি আমাদের হৃদয়ের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতেছে! এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি এই জন্য তাহার একটা সমগ্র আনন্দ-রূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ যেন আমার অন্তরের

একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোক-রশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ, বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম।" রবীন্দ্রনাথের রচিত "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নামক নাট্য-কাব্যটির মধ্যেও এই সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সাংসারবিরক্ত সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহ ও মায়ার বন্ধনকে অস্বীকার করিয়া ও প্রকৃতিকে পরাহত করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব-চিত্তে অনন্তের উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল।

'মুছ অশ্রুজল, বৎসে, আমি যে সন্ন্যাসী।
নাহিক কাহার পরে ঘৃণা অনুরাগ।
যে আসে আসুক কাছে, যায় যাক্ দূরে,
জেনো, বৎস, মোর কাছে সকলি সমান।"

অবশেষে কিন্তু এই কঠোরপন্থী সন্ন্যাসী একটি বালিকার মায়াবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গেল এবং অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের লীলানিকেতনের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। উপলব্ধি করিল, "ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি।" বিরাগীর কণ্ঠে তাই ধ্বনিয়া উঠিল, "প্রকৃতি এমন তোরে কখন দেখিনি।"

ঐহিকতার আবরণ উন্মোচন করিয়া অমূত্রের আলোক দেখিবার এই দিব্য প্রতিভা আমরা কবির কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে ওতপ্রোত দেখিতে পাই। যদিও একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের রচনার মধ্যে এই আধ্যাত্মিকতার অংশ অনেক অধিক। "এই প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিবার, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দিবার, 'বহুরে আহুতি দিয়া' এককে নিঃসংশয়রূপে, অন্তরতররূপে উপলব্ধি করিবার" ঐকান্তিক চেষ্টাই তাঁহার কাব্যমঞ্জুষার শ্রেষ্ঠ শেবধি। সংসার হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, ক্ষুদ্র ও ক্ষণভঙ্গুরকে তুচ্ছ করিয়া, মানবমনের সহজ বৃত্তিগুলিকে উৎকট আয়াসের দ্বারা রুদ্ধ করিয়া যে পারমার্থিক সিদ্ধি,

তাহার সহিত কবির অন্তরের যোগ কোথাও নাই। কবি ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা মুক্তির প্রয়াসী নহেন—কর্মযোগে নিখিলের সহিত একীভূত হইয়া প্রেমের সাধনা করিতে হইবে, তবেই মুক্তি।

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"
"কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হ'য়ে পড়ুক ঘর্ম ঝ'রে।"

গতিহীনতার অনায়াস আরামের মধ্যে সাধনার ধনকে পাওয়া যায় না, কর্মের সঙ্গে সঙ্গে যখন আকুলতাভরে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকি তখনই সে ডাক সত্য ও সার্থক হয়। কর্মপ্রচেষ্টার বিপুল আবেগে কণ্ঠ হইতে প্রেরণার সঙ্গীত যখন আপনি ধ্বনিয়া উঠে আনন্দের সেই জ্যোতির্ময় উচ্ছ্বাসের মুহূর্তে বঁধুর গলায় কবি গানের মালা দুলাইয়া দিয়াছেন। দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়া সাধ্য ও সাধক এক হইয়া গিয়াছেন। সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মসর্বস্ব সাধনার দ্বারা যে কৈবল্যের কামনা তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। "সবার নীচে, সবার পিছে, সব-হারাদের মাঝে"—যেখানে দয়ালের চরণ নামিয়াছে ব্যথিতের আর্তি দূর করিতে—সান্ত্বনার তীর্থনীরে ধূলিমলিন ধরণীকে অমৃতায়মান করিতে,—সেই সর্বনিম্নে নামিয়া প্রণাম নিবেদন না করিলে তো তাঁহার চরণে সে প্রণাম পৌঁছিবে না, সেই পুণ্যপীঠে তাহাদের সহিত না মিলিলে "মৃত্যু মাঝে হ'তে হ'বে চিতাভস্মে সবার সমান"। বিশ্বমৈত্রীর এই উদাত্ত বাণী, সর্বভূতে ভূমার এই আবির্ভাব-কল্পনা বিশেষভাবে ভারতীয় ঋষিগণের অনুভূতিলব্ধ সত্য। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পূর্বতন মনীষিগণের নিকট ঋষিঋণে আবদ্ধ।

বাস্তবিক, রবীন্দ্রসাহিত্যের অতীন্দ্রিয়তার আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের সব সময়ে স্মরণ রাখা উচিত যে, তাহা সর্বাংশে পাশ্চাত্ত্য **mysticism**-এর অনুরূপ নহে। ভারতীয় অধ্যাত্ম-চিন্তার ধারা সর্বথা প্রতীচ্য

ভাবধারার অনুবর্তন করে না; যদিচ পরমাত্মতত্ত্বের স্বরূপ অবধারণ করিবার, ভাবদেহে পরমাত্মার সহিত একীভূত হইবার যে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা মানবমনের নিভৃত-নিলয়ে নিলীন রহিয়াছে তাহাকে দেশ-কালের রেখার দ্বারা একান্তভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নহে। যে অণু হইতে অণীয়ান্, মহান্ হইতেও মহীয়ান্ আত্মা প্রাণিগণের হৃদয়-গুহায় নিহিত আছেন, সেই অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ অর্থাৎ চির-বিরাজমান পরমাত্মাকে প্রবুদ্ধ বিজ্ঞানে উপলব্ধি করিবার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা দেশকাল-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মুমুক্ষু মানবের মধ্যেই লক্ষিত হয়। কেবল প্রবচন অর্থাৎ শাস্ত্রাধ্যয়ন ও শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না, কেবল মেধা কিংবা বহুল শাস্ত্রশ্রবণেও এই আত্মতত্ত্ব উন্মেষিত হয় না। এই আত্মাকে জানিতে হইলে চাই ভক্তিমুখী, ভাবময়ী সাধনা—এইরূপ ভক্ত সাধকের সমক্ষেই আত্মা স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করেন। কবি শব্দটির মৌলিক অর্থ যিনি স্বরচিত কাব্যের দ্বারা ভগবানের স্তব গান করেন। অতীত ভারতে এই অর্থেই শব্দটি প্রযুক্ত হইত সন্দেহ নাই। কালক্রমে কবি শব্দের অর্থ ব্যাপকতর হইয়া পড়িয়াছে, এখন ছন্দোবদ্ধ সাহিত্যের রচয়িতৃ-মাত্রকেই এই সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়া থাকে। এখন বিশেষ করিয়া অধ্যাত্ম অথবা mystic-কবি না বলিলে কবিশব্দের লক্ষ্যার্থের ধারণা হয় না। যাহা হউক্, এই শ্রেণীর কবির রচনার মধ্যে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল এই যে, একটি নিগূঢ় পরমার্থ-রসের দ্বারা তাহা অনুপ্রাণিত। একটি সর্ব্বতোব্যাপিনী পরমাশক্তির চেতনাময়ী অনুভূতি তাঁহাকে এমন করিয়া অধিকার করে যে, তাঁহার আবেগসমুজ্জ্বল হৃদয়াদর্শে আনন্দময়ের অপরূপ রূপ সহজেই প্রতিবিম্বিত হয়। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে বিভেদ-রেখা মুহূর্ত্তেই বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ভাবাবেশের অচিন্ত্য গভীরতার মধ্যে যে কাব্যের জন্ম তাহার অন্তরের কথাই হইল রূপের সহিত অরূপের, সীমার সহিত অসীমের, বিকাশের সহিত

চরম পরিণামের পরম ঐক্যের বাণীটিকে বিশ্ববৈচিত্র্যের অনাহত লীলার মধ্যে অবারিত করিয়া দেওয়া। কবির জীবনের মধ্যে যে অচিন্ত্য ও অদৃশ্য-শক্তির প্রচ্ছন্ন আবির্ভাবে নানা-সময়ে-রচিত তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন কবিতাগুলি তাহাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করিয়া সমগ্রের এক অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য্যের মধ্যে মিলিত হইয়াছে তাহারই নাম দিয়াছেন তিনি **জীবন-দেবতা**। ফুল যখন ফুটিয়া উঠিয়া সমগ্র বনভূমিকে লাবণ্যের লীলা-হিল্লোলে নাচাইয়া দেয় তখন সহজেই মনে হইতে পারে এই সুষমা ও সৌন্দর্য্যই বুঝি কাননলক্ষ্মীর সাধনার চরম ধন; কিন্তু যখন আরও দূরে রূপাবরণের অন্তরালে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করি তখন বিন্দুমাত্রও সংশয় থাকে না যে, এই ফুল-ফুটান কেবল ফল-ফলাইবার পূর্বাভাস বা উপলক্ষ্যমাত্র। সেইরূপ পরিণাম না জানিয়া কবি যখন একটির পর একটি কবিতাকুসুম ফুটাইয়া চলিয়াছিলেন তখন তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, সেই কুসুমসমূহের শোভন সমাবেশেই এমন এক অপূর্ব অর্ঘ্যমাল্য বিরচিত হইবে যাহার মিলিত সুষমায় খণ্ডের ক্ষুদ্রতা মুহূর্ত্তেই ম্লান হইয়া যাইবে।

"সোনার তরীর" মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই জীবন-দেবতার আবির্ভাব দেখা যায়। এই কাব্যে অংশের মধ্যে সম্পূর্ণতার তত্ত্ব নিহিত আছে। ইহার পরবর্তী সমস্ত কাব্যের মধ্যেই এই বিশ্বানুভূতির চিত্র দেখিতে পাই। প্রকৃতির প্রত্যেক সৌন্দর্য্যকে তিনি এক অখণ্ড, অমূর্ত্ত, অনন্ত সৌন্দর্য্যের অংশরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, জীবনের সকল বিচিত্রতাকে এক পরিপূর্ণ সত্তার অবয়বরূপে কল্পনা করিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত একটি অতি সহজ, অতি নিবিড় প্রেম তাঁহার রচনার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্যকে কবি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই, সীমার মধ্যে তিনি অসীমের আভাস পাইয়াছেন, বহুর ভিতর দিয়া একের আরতি করিয়াছেন, পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র আনন্দকে গ্রথিত করিয়া ভূমার বিনোদ-মাল্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু কবি-হৃদয়ের এই অপরূপ ভাবসত্তা,

সান্তের মধ্য দিয়া অনন্তের পথে আত্মার এই নিত্য অভিসার সকলের কাছে বেশ সহজবোধ্য বলিয়া মনে হয় না। কবি-বীণায় যে বাণীটি বিকাশের ব্যাকুলতায় সান্দ্র ও নিবিড় হইয়া উঠে অনেকে তাহার অন্তরতম ইঙ্গিতটি ধরিতে না পারিয়া তাঁহার কাব্যসৃষ্টির মধ্যে একটা গোধূলির অস্পষ্টতা অনুভব করেন। কিন্তু কবি তো স্বেচ্ছায় এরূপ করেন না; যিনি অনন্ত ও অব্যক্ত, যাঁহার বাসভূমি প্রত্যক্ষের অতীত এক অজানা রাজ্যে তাঁহাকে তো একটা বিশেষ বিগ্রহের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া ধরা সম্ভব নহে। মানুষ সান্ত ও সসীম, কাজেই তাহার অনুভূতিরও একটা সীমা আছে। চিররহস্যময় যিনি, অবাঙ্‌মনসগোচর যিনি, খণ্ড শক্তির দ্বারা তাঁহার বিভূতির প্রকাশ করিতে গেলেই একটু গোধূলির আলোছায়া, একটু বিভাবনার অনবদ্যতা, একটু রহস্যের কুহেলিকা না থাকিয়াই পারে না। 'Mysticism' উপলব্ধির অক্ষমতা নহে, প্রকাশের পঙ্গুতা নহে, অব্যক্তকে ব্যক্তের আলোকে পরিচিত করিবার একটি বিশেষ ভঙ্গী। প্রত্যক্ষ যাহা, পরিস্ফুট যাহা তাহার চিত্রও সুস্পষ্টই হইয়া থাকে; কিন্তু যে চিন্ময় বিভু জগদতীত হইয়াও জগতের মধ্যে সপ্রকাশ মানবের মন তাহার সব শক্তি লইয়া ছুটিয়াও নিজের ও সেই পরমপুরুষের মধ্যে নিরন্তর এক ব্যবধান রচনা করিয়া চলে।

> তোমার প্রেম যে বইতে পারি এমন সাধ্য নাই
> তোমার আমার মাঝখানেতে তাই
> কৃপা ক'রে রেখেছ নাথ, অনেক ব্যবধান।

ঘোমটার আড়ালে-ঢাকা সৌন্দর্য্যের প্রতিমা যেমন রহস্যের ইঙ্গিতে আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা ও বিফলতার হাহাকার বাড়াইয়া চলিয়া যায়, তেমনই ভাবুকের চিত্তও এই প্রতীয়মান সৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত চিদানন্দময় সত্তার নিঃসীম মাধুর্য্যের কণামাত্র লাভ করিবার জন্য সুদূরের অভিসারে বাহির হইয়া পড়ে। তাই কবিকণ্ঠে বাজিয়া উঠে—"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।"

বৈষ্ণবদিগের ভেদাভেদ-দর্শনের মধ্যেও এই গুহাহিত পরমতত্ত্বকে জানিবার

অশেষবিধ প্রয়াস দেখিতে পাই। "আমার চেষ্টা, চিন্তা ও কল্পনা নিরন্তর ক্ষুদ্রতাকে পরিহার করিয়া ভূমার সহিত স্বীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত। অদ্বৈত আমা হইতে পৃথক হইলেও আমার ভিতরে চির-প্রকাশমান। বস্তুতঃ আমার চেতনার প্রবাহ, একবার অহংবোধরূপ খণ্ডচেতনার বিচিত্র তানের ভিতর আমাকে ছাড়িয়া দিতেছে, আবার সমস্ত বৈচিত্র্যের পরিসমাপ্তি যে-বিশ্বচৈতন্য তাহারই অবিচ্ছিন্ন সমের মধ্যে আমাকে বিলীন করিয়া দিতেছে। ভেদাভেদের এই অপরূপ ছন্দে অনুদিন আমাদের অন্তরে বিশ্ব-সঙ্গীত স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে; সাধনার দ্বারা এই বিচিত্রতা ও একতাকে —এই তান ও সমকে—একত্র মিলাইয়া তবেই বিশ্ববোধ পরিপূর্ণরূপে জাগ্রৎ হইতে পারে।" রবীন্দ্রকাব্যের তত্ত্বকথাও মূলতঃ এই। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি ভেদাভেদ-দর্শনের আলোচনা কখনও করেন নাই। যা-কিছু আলাপ-আলোচনা তাঁহার সমস্তই বৈষ্ণবকবিদের লইয়া। বৈষ্ণবকাব্য তাঁহার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৈষ্ণবকবিগণ যে পীযূষ-প্রসাদ পরি-বেষণ করিয়া গিয়াছেন তিনি তাহা আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন; এমন কি একসময় তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া "ভানুসিংহের পদাবলী" পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবকবিগণ তো এই ভেদাভেদতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা নহেন; বৈষ্ণবদিগের মধ্যে মরমী সাধক (practical mystics) যাঁহারা, তাঁহারাই কেবল বৈষ্ণবদর্শন-নির্দিষ্ট সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া আত্মো-পলব্ধি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বৈষ্ণবসাহিত্যের মধ্য দিয়া যে দার্শনিক মতবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত ভেদাভেদ-দর্শনের সম্বন্ধ নিতান্ত গৌণ। ভগবানের অসীমত্ব অথবা জগদতীত সত্তা অর্থাৎ তাঁহার transcendental aspect বা ভেদতত্ত্ব লইয়া তাঁহারা মোটেই মাথা ঘামান নাই। ভগবানকে তাঁহারা কেবলমাত্র এই পার্থিব জগতের মধ্যেই মূর্তরূপে জানিয়াছেন এবং শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও বিশেষ করিয়া, মধুর এই লৌকিক সম্বন্ধগুলির ভিতর দিয়া তাঁহাকে পাইতে চাহিয়াছেন। চণ্ডীদাসের মতে তো "সবার

উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"। তাই তাঁহার কৃষ্ণ ভগবান হইয়াও দোষে-গুণে-জড়িত একটি খাঁটি মানুষ। রাধাশ্যামের প্রেমবর্ণনাচ্ছলে চণ্ডীদাস শাশ্বত মনুষ্যের চিরন্তন প্রেমতৃষাকেই আভাসে প্রকাশ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, বৈষ্ণব কবিগণই প্রথম নানা বিগ্রহের মধ্যে আনন্দময়ের আবির্ভাব কল্পনা করিয়া—তাঁহার সহিত বিচিত্র মানবীয় সম্বন্ধ পাতাইয়া গুহাহিত পরম তত্ত্বকে লোক-বুদ্ধির গোচরীভূত করিয়াছেন।

বৈষ্ণব কবিদিগের রসসুমধুর কাব্যের অনির্ব্বচনীয় সুষমায় যদিও রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে তাহার গুণপক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি ভূমাকে সীমার মধ্যে একান্তভাবে বাঁধিয়া রাখায় তাঁহার উপনিষদ্-দীক্ষিত উদার হৃদয়ে কোন্‌খানে যেন একটু ব্যথা বাজিয়াছিল। ভগবান বন্ধুরূপে, মাতৃপিতৃরূপে সততই তো আমাদের ভালবাসা দিতেছেন ও নিতেছেন, কিন্তু উহাই কি তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয়? তিনি কি এত ক্ষুদ্র যে আমাদের হৃদয়গোষ্পদে তাঁহার পদচ্ছায়া ধারণ করিতে পারি? কাব্যের দিক দিয়া নহে, পরন্তু তত্ত্বের দিক দিয়া এইখানে একটা প্রকাণ্ড খণ্ডতা ও অসামঞ্জস্য তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন বৈষ্ণবকবিদিগের মধ্যে।

"বন্ধু হ'য়ে, পিতা হ'য়ে, জননী হ'য়ে
আপনি তুমি ছোট হ'য়ে এস হৃদয়ে।
আমিও কি আপন হাতে
ক'রবো ছোটো বিশ্বনাথে?
জানাবো আর জান্‌বো তোমায় ক্ষুদ্র পরিচয়ে?"

—গীতাঞ্জলি, ১১৫।

শিল্প ও রসের দিক দিয়া কবিত্বের এই অফুরান নির্ঝর তাঁহার হৃদয় হরণ করিয়াছিল, কিন্তু বোধের দিক দিয়া তাঁহার চিত্তে সম্পূর্ণতা ও সামঞ্জস্যের সান্ত্বনা জাগাইতে পারে নাই। উপনিষদের উদাত্ত বাণীর মধ্যেই তিনি পূর্ণতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাই, উপনিষদ্ ও বৈষ্ণবসাহিত্যের দুই

আপাত-বিরুদ্ধ ধারা গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের মত আসিয়া মিশিয়াছে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রয়াগতীর্থে। এই দুয়ের মিশ্রণে যে-দর্শন জন্মলাভ করিয়াছে তাহার সহিত "ভেদাভেদের" সম্পূর্ণ অভেদ লক্ষিত হয়। বৈষ্ণবদর্শনে অনভিজ্ঞ হইয়াও এইজন্যই তিনি তাহার (সেই দর্শনের) ব্যাখ্যাতা ও রূপকার।

যে ধর্মের আবহাওয়ার মধ্যে তিনি মানুষ—যে অধ্যাত্মশিক্ষা তাঁহার মজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল, সেই শিক্ষাই তাঁহাকে বিগ্রহ-কল্পনা হইতে বিরত করিয়াছে। বৈষ্ণবকবিরা যেখানে প্রতীকের সাহায্য লইয়া তাঁহাদের অধ্যাত্ম-অনুভূতিকে মূর্তি দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে কোনরূপ প্রতীকের সহায়তা ব্যতীতই "অরূপরতনকে" রূপের অমরাবতীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বৈষ্ণবকাব্যের symbolism তাই mysticism-এ পরিণত হইয়াছে তাঁহার অধ্যাত্ম-রচনায়। "দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা" ইহা নিছক রূপক, ইহার ভিতরে অস্পষ্টতা কিছুই নাই;—দাস্য, সখ্য প্রভৃতি সম্বন্ধের যতকিছু দিক বৈষ্ণবকবিকুল তাহার সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন; এমন কি যে-রসকে সাধকগণ সর্ব্বরসের আধার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (চৈতন্য-চরিতামৃতে রায় রামানন্দ ও মহাপ্রভুর বার্ত্তালাপ দ্রষ্টব্য) সেই মধুর রসের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের কোন লৌকিক অঙ্গই বাদ পড়ে নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, এক দিকে তাহা যেমন দুর্বোধতার হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছে, অপরদিকে তেমনি অধ্যাত্মমহিমার স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া প্রাকৃতের পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। কতক শিক্ষার গুণে, কতক এই কারণে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবসাহিত্যের রীতিকে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছেন সুফী-কাব্যের আঙ্গিকের আদর্শে। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের উপর সুফী-সাহিত্যের প্রভাবও নিতান্ত নগণ্য নহে। তাঁহার পিতার আমলে তাঁহাদের বাটিতে সুফী-কবিদিগের কাব্যের বহুল আলোচনা হইত। এই সকল আলোচনার আসরে রবীন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেন এবং তাঁহার কাব্যের—বিশেষতঃ রচনারীতির উপর সুফী-মরমীদিগের প্রভাব কিছু-না-কিছু নিশ্চয়ই পড়িয়াছে।

সুফীদর্শন, ইংরাজীতে Eclectic বলিতে যাহা বুঝায়, সেই শ্রেণীর। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সুফীসাধকগণের মধ্যেও সর্বানুভূতির ভাব বিদ্যমান। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে একেশ্বরবাদিতার নিদারুণ নিষ্করুণতায় যখন দেশবাসীর চিত্তভূমি, নিদাঘের মরুক্ষেত্রের মতই, শুকাইয়া উঠিয়াছিল, তখন সুফী মরমী-গণের রস-সুমধুর সাধনার ধারাবর্ষণে সমস্ত দেশ আবার সজীব ও শস্যশ্যামল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ের পরবর্তী কালের পারসীক সাহিত্য ব্রহ্মানুভূতির আনন্দে সমুজ্জল। হাফিজ এবং সাদির কাব্যেও, বৈষ্ণব সাহিত্যের মতই, ভক্ত-ভগবানের নিগূঢ় প্রেম-সম্বন্ধকে মানবীয় প্রেমের আলোকেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। পার্থক্য এই যে বৈষ্ণব কবিগণ যেখানে ভগবানের নাম ও বিগ্রহরূপ কল্পনা করিয়া মানবের প্রতি মানবের প্রেমের আস্বাদ দিয়াছেন, সুফীগণ সেখানে বিশ্ববিভুকে, দয়িত ও প্রিয়তমরূপে বুঝিয়াও, বিগ্রহের নিগড়ে বাঁধেন নাই। তিনি বন্ধুরূপে বল্লভরূপে সসীম, আবার অন্তরূপে তিনি বিরাট্ ও জগদেককারণ। এইখানে সুফীদিগের সহিত রবীন্দ্রনাথের মিল। কিন্তু এ মিল কি অহেতুক ও আকস্মিক? এইখানে হাফিজের কবিতার একটু নমুনা উদ্ধৃত করি। ইহাতে হাফিজের অসীমের প্রতি আকুতি কি সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে!

ঘরে-ফেরা পাখীর মতন
আত্মা মোর ধায় ঊর্দ্ধলোকে!
উড়ে সুখে অনন্ত অম্বরে
পাশমুক্ত পক্ষের পুলকে!
পরাণের নিভৃত-নিলয়ে
আসে যদি প্রেম-নিমন্ত্রণ
কে চাহিবে পিছনের পথে
ক্ষণিকের জীবন-বন্ধন?
জাগো মন! কর আবাহন
বঁধুয়ারে আপনার প্রাণে,

নিখিলের কামনার ধন,—
সব আশা ধায় তারি পানে !
হাফিজের সাধন-শেবধি !
এস নাথ, আলোকের রথে !
ডাকি লও এ জগৎ হ'তে
শাশ্বত সে প্রেমের জগতে !! *

ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের "ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা, প্রভু, তোমার পানে" প্রভৃতির ভাবসাদৃশ্য পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। ফলকথা, উপনিষদের পরানুভূতি বৈষ্ণবকাব্যের রস ও সুফী-সাহিত্যের বর্ণনভঙ্গী বা কাব্যরূপ এই তিন বিশিষ্ট উপাদানে লোকোত্তর প্রতিভা-প্রেরণার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-হর্ম্ম্য নির্ম্মিত। তবুও স্বীকার করিতে হয়, রসাংশে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তত্ত্বের দিকে ইহাকে প্রসারিত করিতে গিয়া। একটি বিগ্রহকে অবলম্বন করিয়া, প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম-বাসনার দুর্নিরোধ্য আকর্ষণের মধ্য দিয়া আবেগের যে তীব্রতা ব্যক্ত হইতে পারে, বিগ্রহ-নিরপেক্ষ হইয়া কিছুতেই সেরূপ সম্ভব নহে। অপরদিকে, বৈষ্ণব-কাব্যের অনেকাংশ বিশুদ্ধ রুচিসম্মত নহে—ভাষ্যকারগণ সযত্নে তাহাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিলেও সাধারণে তাহা বুঝিবে না। জয়দেবের গীতিকা যে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ তাহা প্রকৃত সাধক ব্যতীত প্রাকৃত জনের বোধগম্য হওয়া সহজ নহে। তবেই দেখা যাইতেছে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অতীন্দ্রিয়ের আভাস দিতে গেলে ভুল বুঝাইবার আশঙ্কাও যথেষ্ট বিদ্যমান থাকে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে এই চিরাচরিত পথ পরিত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণে আবেগের দিক দিয়া যেমন তাঁহার কবিতা স্থানে স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, অপর দিকে তেমনি তাহা ইন্দ্রিয়-বৈকল্যের গ্লানি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে।

* **Miss Bell**-কৃত ইংরাজীর মর্ম্মানুবাদ।

এই প্রসঙ্গে অবান্তর হইলেও বলা যাইতে পারে যে, Wordsworth-এর mysticism ঠিক এই শ্রেণীর নহে। তাঁহার গ্রন্থাবলির মধ্যে সীমার মাঝে অসীমের সুর বড় শুনি না, যদিও রূপ হইতে ভাব, বাহ্য হইতে অন্তর, এবং কান হইতে প্রাণের পথে প্রয়াণের চিত্র প্রচুর দেখিতে পাই। তিনি বিশ্বশতদলের কেন্দ্রকোষে শান্তিসুধার সন্ধান দিয়াছেন; পরন্তু যে প্রেম, যে আনন্দ হইতে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের জন্ম তাঁহার কাব্যমঞ্জুষায় সে দুর্লভ রত্নের সন্ধান ক্বচিৎ পাওয়া যায়। প্রকৃতির অন্তরে প্রাণের পরিচয় তিনি পাইয়াছেন—তরুলতা, পশুপক্ষীর চেষ্টার আনন্দই কেবল তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এ সুর নূতন নহে; তাঁহার পরবর্তী জীবনে তিনি এই আত্মবোধকে প্রসারিত করিয়া বিশ্ববোধের অভিমুখে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। Blake-ও একজন উচ্চাঙ্গের মরমী কবি। তাঁহার কাব্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বস্তুর মধ্যেই এক স্বপ্নময়ী অতীন্দ্রিয়-অনুভূতির প্রকাশ লক্ষিত হয়। তাঁহার মতে অপবিত্র বা অকিঞ্চিৎকর বিশ্বে কিছুই নাই—হিংস্র আরণ্য পশুগণের অন্তরেও ভগবদ্বিভূতির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জাজ্বল্যমান। মরমী কবির কাব্যে প্রায়শঃই একটি বেদনার সুর শুনা যায়; কিন্তু দুঃখ-বেদনার কণ্টককে কবি আনন্দপদ্মের সদ্ম-রূপেই অনুভব করিয়াছেন। তথাপি Wordsworth বা Blake কেহই উপনিষদের "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" প্রভৃতি অধ্যাত্ম-অনুভূতির উচ্চতম গ্রামে পৌঁছিতে পারেন নাই। যে অপার্থিব রস-রশ্মিতে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-সাধনা সমুজ্জ্বল তাহা অদ্যাপি য়ুরোপীয় কবিকুলের অনায়ত্তই রহিয়া গিয়াছে। Blake-এর—

> "Joy and woe are woven fine
> A clothing for the soul divine,
> Under every grief and pine
> Runs a joy with Silken twine."

এর সহিত রবীন্দ্রনাথের " দুখের বেশে এসেছ ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে। যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় ক'রে ধরিব হে।" ইত্যাদির তুলনা করিলে দেখিতে পাই ইংরাজ কবি যেখানে দুঃখের অন্তরে সুখ-সম্ভাবনার ইঙ্গিতমাত্র করিয়াছেন, ভারতীয় কবি সেখানে দুঃখকে "আনন্দের স্বরূপ" এই উপলব্ধিতে বুকের মাঝে নিবিড়ভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন। অধ্যাত্মচিন্তার যে উদার স্বর-লহরীতে রবীন্দ্র-কাব্য লীলায়িত য়ুরোপীয় মরমীগণের মধ্যে তাহা সুলভ নহে।

রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতার সহিত ভক্ত-কবি কবীরের কোন কোন দোঁহার ভাবসমতা লক্ষিত হয়। খণ্ডের মধ্যে পূর্ণতার পিপাসা কবীরের রচনারও বিশেষ লক্ষণ। কবীর গাহিয়াছেন—

"জো তন পায়া খণ্ড দিখায়া তৃষ্ণা নহী বুঝানী
অমৃত ছোড়্ খণ্ডরস চাখা তৃষ্ণা তাপ তপানী"—ইহার সহিত

ঋষি রবীন্দ্রের "অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ, সীমা হ'তে চায় অসীমের মাঝে হারা" ইত্যাদি তুলনীয়।

পরিশেষে আর একটি কথার উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বাগ্রে গীতিকবি। তাঁহার কাব্য, নাটক, গল্প সকলের ভিতর দিয়াই বাজিয়া উঠিয়াছে সঙ্গীতের এক অব্যক্ত বেদনা। বিশ্বসৌন্দর্য্যকে তিনি কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়াই প্রত্যক্ষ করেন নাই। এই সৃষ্টির অণু-পরমাণুতে আনন্দের যে অনাহত সঙ্গীত অনাদি অতীত হইতে ধ্বনিত হইতেছে তাহাকে তিনি কান পাতিয়া শুনিয়াছেন ও হৃদয় দিয়া উপভোগ করিয়াছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে রূপ এবং সুর তাই একই সত্যের দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি। গ্রহে নক্ষত্রে, চন্দ্রে সূর্য্যে, তারায় তারায় সঙ্গীতের যে অবারিত স্রোত সৃষ্টির আদিম প্রভাত হইতে বহিয়া চলিয়াছে য়ুরোপীয় কবিকুল তাহার নাম দিয়াছেন "Music of the Spheres"। নিখিল বিশ্বের পরম ঐক্যের এই শাশ্বত সুরটি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে বাঙালী কবির চিত্তবীণায়। তাই এই সুরের আবেশটি লগ্ন হইয়া আছে তাঁহার প্রত্যেক সাহিত্য-সৃষ্টির অন্তরালে। তাঁহার

"তুমি কেমন ক'রে গান কর যে গুণী—
আমি অবাক্ হ'য়ে শুনি কেবল শুনি।
সুরের আলোয় ভুবন ফেলে ছেয়ে, সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী।"

অথবা

"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনা তোমারে।"

প্রভৃতি গানে এই সুরের সাধনাই কাব্যসৌন্দর্য্যের অনির্ব্বচনীয় সুষমায় মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জগৎ আলোর জগৎ, সুরের জগৎ। এই সুর ও আলোকের সাহায্যে তিনি যে কাব্যহর্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা আকৃতিতে যেমন বিশাল, বিচিত্রতায় তেমনি অভিনব ও অপরূপ। সাধক-হৃদয়ের অনুভূতি-বেদ্য এই অতীন্দ্রিয় প্রেম-কথা পাঠকের চিত্তে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব আবেশের সৃষ্টি করে।

দর্শনের ন্যায় কাব্যেরও ভিত্তি দুঃখবাদ। জীবন-রহস্যকে কেন্দ্র করিয়াই কাব্যশতদল বিকশিত হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে প্রাণের পরতে প্রেমময়ের রস-পরশ লাগে বলিয়াই জীবন একেবারে দুঃসহ হইয়া উঠে না। বুকের মাঝে যেটুকু তাঁহাকে পাই সেইটুকুই সুখ, সেইটুকুই সার্থকতা। কিন্তু ক্ষণিকের সেই পাওয়া সে তো চরম পাওয়া নয়!

"তোমায় আমি পাইনি যেন সেকথা রয় মনে,
ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।"

এই যে পাওয়া এবং না-পাওয়া, এই যে আনন্দ এবং দুঃখ, এই যে আলো এবং ছায়া ইহাই হইল মরমী কবির একমাত্র উপজীব্য। ভক্ত তো ভগবানকে হৃদয়-মধ্যে সর্বক্ষণের জন্য পান না; চিত্ত যখন নির্ম্মল থাকে, ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভের আকুলতা যখন চোখের জলের অজস্র ধারায় ফাটিয়া পড়ে, তখনই কেবল সেই তন্ময় মনে চিন্ময়ের ছবি ফুটিয়া উঠে। আবার ক্ষণপরেই সে-ছবি

মিলাইয়া যায়; ঐহিকতার মেঘে অলোকের আলোক ম্লান হইয়া আসে, তাই ক্ষোভে-দুঃখে কবি গাহেন—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না?
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না!
কি করিলে বল পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে;
এত প্রেম আমি কোথা পাব, নাথ, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে!"
"মিশিয়ে গেছে সোরু মোটা দুটো তারে,
জীবন-বীণা ঠিকস্বরে আর বাজে না রে।"
"এই বেদনাধন সে কোথায় ভাবি জনম ধ'রে,
ভুবন ভ'রে আছে যেন পাইনে জীবন ভ'রে!"

জীবনে অনুভূতির মধ্যে বিশ্বাস ও সংশয়ের এই আলো-ছায়া কবির রচনাকে অল্প-বিস্তর জটিল ও অস্পষ্ট না করিয়াই পারে না। "আমার মাঝে আছে কে সে কোন্ বিরহিণী নারী"—এই যে আমার অন্তরের নিভৃতলোকনিবাসিনী চিরবিরহিণী অশ্রুজলের মালা গাঁথিয়া দয়িতের উদ্দেশে বাসর জাগিয়া বসিয়া আছে, তাহার হৃদয়ের ব্যথিত শূন্যতা কি মিলন-মধুরসে ভরিয়া উঠিবে না? পূর্ণতার জন্য এই যে শূন্যতা তাহা কি ভাষায় বুঝান যায়? যেখানে কবির সার্থকতা সেইখানেই আমরা দোষানুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। কবি যেখানে ধ্যাননেত্রে আরাধ্যকে খুঁজিয়া ফিরিতেছেন—ক্ষ্যাপার মত 'পরশপাথর' খুঁজিতে খুঁজিতে বারবার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছেন অথচ আশা ছাড়িতেছেন না—সাধনার সেই নিরতিশয় বিস্ময়কর ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার সাধ্য আমার নাই।

রবীন্দ্র-কাব্যে প্রকৃতি

প্রকৃতির সহিত মানব-মনের সম্পর্ক নানা কবি নানাভাবে তাঁহাদের কাব্যে অংকিত করিয়াছেন। বলিতে গেলে এই সম্পর্ক হইতেই নিখিল কাব্যকলার উদ্ভব। Wordsworth-এর ভাষায়—"মানুষ ও প্রকৃতির প্রতিমূর্তি কাব্য"। বস্তুত, প্রকৃতির সহিত সংস্পর্শের ফলে মানব-চিত্তে যে অনুভূতিময় বেদনা সঞ্জাত হয় তাহারই ব্যঞ্জনা দেখি কাব্যে। কিন্তু সব কবি ঠিক একই দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখেন না। কবিচিত্তের বিশেষ গঠন-অনুসারে এই দৃষ্টিভংগি গড়িয়া উঠে। এই দৃষ্টিভংগিও আবার একই কবির চিরকাল একরূপ থাকে না; কবি-মানসের বিকাশের সংগে সংগে ইহাও নব নব পরিণতি লাভ করে। কেহ বা প্রকৃতিকে জড়মাত্র-রূপে অনুভব করেন; তাঁহাদের চোখে প্রকৃতি কেবল দৃষ্টির শোভা—ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের উপকরণ। কেহ দেখেন প্রকৃতিকে মমতাময়ী জননী-রূপে; তাঁহার শুধু চেতনা আছে তাহাই নহে—মানুষের সুখ-দুঃখে, হর্ষ-বিষাদে বরদা দেবীর মতই তিনি তাঁহার কল্যাণ-হস্ত প্রসারিত করিয়া দেন, শোকশুষ্ক ললাটের কঠিন রেখাগুলি প্রসন্ন-দক্ষিণ করে মুছাইয়া দেন। কোথাও বা দেখি প্রকৃতি মানুষের জীবন-নাট্যের পটভূমি মাত্র; একটি অনুকূল পরিবেশের মধ্যে সুখ-দুঃখ-বিচিত্র মানুষের জীবন-লীলা অপরূপ লাবণ্যে হিল্লোলিত হইয়া উঠে। অনেকে আবার নিজের মনের অনুভাবগুলি প্রকৃতির উপরে আরোপ করেন এবং তাঁহাদের মনের সুখ-দুঃখের বর্ণানুলেপনেই প্রকৃতি-চিত্র মধুর অথবা বিধুর হইয়া উঠে। কবি কোলরিজের "Ode to Dejection" কবিতায় এই ভংগিটি অতি মনোজ্ঞরূপে ব্যঞ্জিত হইয়াছে;—

"O lady, we receive but what we give
And in our life alone does Nature live."

অপিচ, কেহবা জীব ও প্রকৃতির মধ্যে একই অলক্ষ্য সত্তার বিকাশ অনুভব করিয়া অতীন্দ্রিয় আনন্দে বিভোর হন। ফলকথা, বিভিন্ন কবির, অথবা একই কবির বিভিন্ন সময়ের প্রকৃতি-সম্পর্কে দৃষ্টিভংগি একরূপ নহে।

প্রাচীন তথা রবীন্দ্র-পূর্ব বংগ-সাহিত্যে প্রকৃত নিসর্গ-কবিতা অতি অল্পই চোখে পড়ে। বিরহিণী নায়িকার বারমাস্যার বর্ণনাপ্রসংগে ঋতুচিত্রাবলী মাঝে মাঝে পাওয়া যায় বটে—কিন্তু মানুষের সহিত প্রকৃতির নিগূঢ় আত্মিক যোগের কোন পরিচয় সেখানে নাই। মানুষের জীবন-নাট্যের পটভূমিও ইহাদের ঠিক বলা চলে না; যেহেতু অংকিত আলেখ্যের সৌন্দর্য অথবা উপাদেয়তা ইহাতে বিন্দুমাত্রও বর্ধিত হয় নাই। মানুষ ও প্রকৃতির বিচ্ছিন্ন ছবিগুলি নিতান্ত আকস্মিকভাবেই যেন পাশাপাশি রহিয়া গিয়াছে। ভারতীয় কাব্যে ঋতু-বর্ণনার যে সুপ্রতিষ্ঠিত রীতি ক্রমিক ধারায় চলিয়া আসিতেছে, সেই সনাতন-রীতি-রক্ষার খাতিরেই যেন কোন গতিকে ইহারা কাব্যে স্থান পাইয়াছে। কোন একজন বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন, 'শ্রেষ্ঠ কাব্য-সৃষ্টির জন্য দুইটি বিশিষ্ট শক্তির সমাবেশ আবশ্যক; ব্যক্তি-মনের সহিত ক্ষণলগ্নের মিলনেই শিল্প-সৃষ্টি সম্ভব হয়। বাস্তবিক, মানুষের জীবনে এই মুহূর্তের প্রভাবকে কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না;—ইহা দমকা হাওয়ার মত আসিয়া সহসা মনের রুদ্ধ বাতায়নগুলি খুলিয়া দেয়; অমনি কোথা হইতে এক ঝলক অচেনা আলোক অন্তরে প্রবেশ করিয়া কোন্ অনুদ্দেশের দেশে মনকে লইয়া যায়। মনের সহিত মুহূর্তের এই মিলনেই প্রকৃত রসদৃষ্টি স্ফুরিত হয় এবং এই মানসিক অবস্থাকেই 'mood' অথবা 'মেজাজ' বলা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয়, এই রস-দৃষ্টির পরিচয় প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যের পৃষ্ঠায় অতি অল্পই মিলে।

কবিকংকণের চণ্ডীকাব্যে মগরায় ঝড়ের বর্ণনা এইরূপ পাই—

ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ করে দুর দুর॥

নিমেষেকে যোড়ে মেঘ গগন মণ্ডল।
চারিদিকে বরষয়ে মুষলের জল ॥
নদীজলে বৃষ্টিজলে উথলে মগরা।
কূলজুড়ে বহে জল একাকার ধারা ॥
করিকর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার নদী হইল হারা ॥
দিবানিশি সম চারি মেঘের গর্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোনজন ॥

উদ্ধৃত বর্ণনাটি কতকটা বিবৃতির মত শুনায়; অর্থাৎ যে বর্ণানুলেপন না থাকিলে কথা চিত্র হইয়া উঠে না, তালিকা মালিকা হইয়া উঠে না তাহার অভাব ইহাতে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ঈশান-কোণে মেঘ করিয়াছে, ক্রমে তাহা দিগদিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়া গেল এবং গুরু গুরু গর্জন করিতে লাগিল। মুষলধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল, জলে জলে পৃথিবী একাকার হইয়া গেল। এ সমস্ত তথ্য বা সংবাদমাত্র—কিন্তু ইহার মধ্যে সেই মায়া-রসায়নের অভাব আছে যাহা সংবাদকে সাহিত্য করিয়া তুলে—যাহা তথ্যকেও সত্যের সৌন্দর্যে লীলায়িত করে। কবি-মনের পরশ-মণির ছোঁওয়া ইহাতে লাগে নাই, তাই সে-দিনের সেই বর্ষণ-মুখর প্রকৃতি চিরকালের চিত্র অথবা সংগীত হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই বর্ণনার চিত্র-ধর্ম কিছু পরিমাণে থাকিলেও সংগীত-ধর্ম আদৌ নাই।* অলংকারমতে ইহা 'অবর' শ্রেণীর কাব্য অর্থাৎ বাচ্যের মধ্যেই ইহার অর্থ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, বচনের অতীত কোন ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি ইহাতে নাই। বস্তুকে যখন বস্তুরূপেই দেখা যায়—প্রকৃতির আকৃতিগত রূপই যখন মুখ্য লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার বিচ্ছিন্ন অবয়বগুলির মধ্যে অখণ্ড সংহতির সুষমাটি ধরিতে পারা যায় না। অংশকে অংশরূপে দেখিয়াও যখন সমগ্ররূপে

* "শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমব্যংগ্যং ত্ববরং স্মৃতম্।" —সাহিত্যদর্পণ

অনুভব করা যায় তখনই সেই-দেখা সম্পূর্ণ ও সার্থক হয়। এই সমগ্রতার অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক প্রকৃতি-কবিতায় দীপ্যমান। গাছ-পালার উপর দিয়া, নীল আকাশে শুভ্র মেঘের কোলে কোলে ঐ যে বলাকার দল চঞ্চল গতিতে কোন্ অজানার উদ্দেশে উড়িয়া চলিয়াছে—সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে সেই সচল শুভ্রতার পানে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার দৃষ্টি তাহাতে লগ্ন হইয়া গিয়াছে—আর কিছুই যেন চোখে পড়ে না; চারিপাশের আর সমস্তই ফিকা হইয়া গিয়াছে, জাগিয়া আছে শুধু সেই লীলা-চঞ্চল হংসদলের ত্বরিত, তরংগিত গতিভংগিখানি। সে যেন গতির সংগীত, 'শব্দের বিদ্যুৎ-ছটা'। পারিপার্শ্বিক সমগ্র চিত্রখানি টুকরা টুকরা হইয়া কবি-দৃষ্টিতে ধরা দেয় নাই —সমগ্রের নিলীন নিভৃত ভাবরূপটুকু একটিমাত্র লক্ষিত বস্তুর মধ্য দিয়া পরিস্রুত হইয়া তাঁহার সমস্ত চৈতন্যকে আবিষ্ট করিয়াছে। বাসা-ছাড়া পাখীর মতই তাঁহার এবং বুঝি নিখিল মানবের আত্মা একটি নির্ভর নীড়ের প্রত্যাশায় অমনি করিয়া উধাও বেগে উড়িয়া চলিয়াছে। নিসর্গ-কাব্যে এই সংগীত-ধর্ম অর্থাৎ প্রকৃতি-চিত্তের এই সজীব অনুরণন পূর্বস্থরি-গণের কাহারও কাব্যে পাওয়া যায় না। রংগলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই কিছু-না-কিছু নিসর্গ-কবিতা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কোথাও এই অনির্বচনীয় ভাব-সৌরভটুকু খুঁজিয়া পাই না। তাঁহারা কেবল প্রকৃতির বহিঃসৌন্দর্যেই মুগ্ধ হইয়াছেন এবং বিচ্ছিন্ন ছবি-গুলিকে শব্দ-রেখায় বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। কেহ কেহ আবার প্রকৃতির সান্নিধ্যে শান্তি এবং সান্ত্বনাও লাভ করিয়াছেন; কিন্তু মরমী রবীন্দ্রনাথের মত কেহই প্রকৃতির অন্তরের উত্তপ্ত স্পর্শটুকু তাঁহাদের কাব্যে জীবন্ত করিয়া রাখিতে পারেন নাই; কারণ তাঁহাদের সে 'mood' বা রস-দৃষ্টি নাই। নিম্নে রংগলালের 'প্রভাত-বর্ণনা' হইতে কয়েক চরণ উদ্ধৃত করা গেল :—

কুমুদ মুদিল আঁখি, জাগিল যতেক পাখি,
মুক্তকণ্ঠে আরম্ভিল গান।

মোহন মধুর স্বরে, শ্রবণ মোহিত করে,
সুশীতল করিল পরাণ ॥
সুসার উষার কাল, বালরূপে ভানু ভাল,
সাজিয়াছে কোলেতে তাহার।
তাহে দ্যুতি দূতী হয়ে, সমাচার সঙ্গে লয়ে,
ধরণীতে করিছে প্রচার ॥

উদ্ধৃত স্তবক হইতে রংগলালের প্রকৃতি-দর্শন সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যাইতে পারে। এখানে চিত্র-ধর্মই প্রধান অর্থাৎ কবি প্রভাত-প্রকৃতির অবয়ব-গত বৈশিষ্ট্যগুলিই একটির পর একটি সাজাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এগুলি অসংবদ্ধ বা অসংলগ্ন নহে—মূলত চোখে-দেখার ভাষা হইলেও ইহাতে কবি-মনের বর্ণালিম্পনও যথেষ্ট আছে এবং নির্বাচিত ঘটনাগুলি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করিয়া এমন ভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে যে ইহাকে একখানি রুচির কারুচিত্র বলিতে কাহারো আপত্তি হইতে পারে না। হেমচন্দ্রের "পদ্মের মৃণাল" শীর্ষক কবিতাটির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার দৃষ্টিভংগি স্বতন্ত্র এবং পরিসর আয়তত্তর। সরসী-বক্ষে একটী মৃণালের ওঠাপড়া লক্ষ্য করিয়া ভাবানুষংগে (association) কবির মনে মানুষের ভাগ্যবিবর্তনের বিচিত্র স্মৃতি জাগিয়া উঠিল এবং তিনি সুদূর অতীতে মিশরে গ্রীসে রোমে মানস-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন। বস্তুত, মৃণালের 'হিল্লোল'-রূপ বিভাব কবির চিত্তে শোকভাবের উদ্দীপন করিয়া কবিতাটিকে করুণরসে পরিণত করিয়াছে। অবশ্য এই শ্রেণীর রচনাকে ঠিক নিসর্গকাব্যের পর্যায়ে ফেলা চলে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। 'যমুনাতটে' শীর্ষক কবিতায় কবি চিত্রাংকনের সংগে সংগে মানব-মনের সহিত প্রকৃতির নিগূঢ় বন্ধনের কথা বলিয়াছেন এবং মানুষের ব্যথা-বেদনায় 'প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূর্তি' আমাদের প্রাণে যে কী অমৃত-প্রলেপ বুলাইয়া দেয় তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের নিসর্গ-কাব্যে প্রকৃতির চিত্র-রূপটিই অতীব সুন্দর ও বর্ণোজ্জ্বল

হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাধারণ পাঠকের পরিচিত না হইতেও পারে মনে করিয়া তাঁহার 'অবকাশ-রঞ্জিনী' হইতে 'অপূর্বদর্শন' কবিতাটির কয়েক চরণ উদ্ধৃত করা গেল :—

পশিনু প্রাঙ্গণে, মরি কী সুন্দর
সুন্দর আকাশে সুন্দর শশী,
ভাসিছে, হাসিছে, পড়িছে সুন্দর
সম্মুখ গিরির উপরে খসি'।
চন্দ্রের কিরণে আকাশের গায়
শোভে গিরিশ্রেণী মেঘের মত,
চিত্রিয়া আকাশ তরঙ্গ-রেখায়
শোভে কৃষ্ণ মেঘ ভূতল-নত ;
সে রেখা উপরে আকাশ-দর্পণে
শোভে তালচূড়া, আম্রের বন
তরংগে তরংগে চন্দ্রের কিরণে
ছায়ালোক চিত্রি', মোহিছে মন।

গুপ্তকবির কাব্যেও প্রকৃতি-চিত্র আছে—কিন্তু সেখানেও প্রাণের সহজ সুরটি ঠিকমত বাজে নাই ; প্রকৃতির সহিত কবিচিত্তের নিবিড় আত্মীয়তার পরিচয় তাহাতে পাওয়া যায় না। প্রকৃতি শুধু জোগাইয়াছে মানুষের সম্ভোগের উপচার। ক্বচিৎ হয়তো এই বিচিত্র জগচ্ছবি নিরীক্ষণ করিয়া স্রষ্টাকে কবির মনে পড়িয়াছে, কিন্তু কোথাও তিনি বিশ্বজীবনের সহিত আপনাকে ওতপ্রোত করিয়া দেখিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গুরু বিহারী-লালও প্রধানত প্রকৃতির আকৃতিগত স্থূলচিত্রই আঁকিয়াছেন। ছন্দোমাধুরী এবং রেখাংকন-নৈপুণ্য যথেষ্ট থাকিলেও অনুভূতির আবেগ-কম্পন অথবা বিষয়াতিরিক্ত ভাবের ব্যঞ্জনা তাহাতে অল্পই আছে। স্থানে স্থানে অবশ্য তাঁহার দৃষ্টি স্বচ্ছ হইয়া বস্তুবিশ্বের নির্মোক হইতে মুক্ত হইয়াছে এবং

তিনি প্রকৃতির অভ্যন্তরে একটি নিগূঢ় আনন্দময় সত্তার উপলব্ধি করিয়াছেন :

সাদা সাদা ডোরা ডোরা দীর্ঘ মেঘগুলি
নীরবে ঘুমায়ে আছে খেলা দেলা ভুলি' ;
একাকী জাগিয়া চাঁদ তাহাদের মাঝে,
বিশ্বের আনন্দ যেন একত্র বিরাজে। —শরৎকাল

রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া পূর্ববর্তী কবিগণের দৃষ্টিভংগির বিশ্লেষণ কতকটা অপ্রাসংগিক মনে হইলেও ইহার প্রয়োজন আছে। কারণ বাঙ্‌লা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের সম্পূর্ণ নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন—তাঁহার পরিপ্রেক্ষিত স্বতন্ত্র ও অভিনব। এ বিষয়ে শ্রৌত ঋষিদের ভাবধারার তিনি উত্তর-সাধক। বিশ্বকে তিনি দেখিয়াছেন চর্মচক্ষু দিয়া নহে, মর্মচক্ষুর আলোকে; তাই বস্তু-বিশ্ব তাঁহার দৃষ্টিতে জড়রূপে প্রতিভাত হয় নাই—ইহার মধ্যে তিনি পাইয়াছেন অখিল প্রাণের নিগূঢ় সংকেত। সময়ে সময়ে দু'একটি ছোটখাট কথায়—নিপুণ তূলিকার দু'একটি টানে যে অনবদ্য রূপ-চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহাও ব্যঞ্জনার মহত্ত্বে তাহার সংকীর্ণ পরিলেখ পার হইয়া অসীমতায় গিয়া মিশিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক :—

বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্ধমগ্ন তরীপরে
মাছ-রাঙা বসি, তীরে দু'টি গরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি'। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাট-তলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝটপটি'। —চৈতালি

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে ইহা তো অতি সাধারণ কথা। এই বিচ্ছিন্ন ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে ব্যঞ্জনার ধ্বনি কোথায়? কিন্তু প্রকৃতির প্রকৃত পূজারি যাঁহারা তাঁহারাই বুঝিবেন এই কাটা-কাটা দৃশ্যগুলি অন্যোন্যনিরপেক্ষ নহে, বিশাল বিশ্ব-সংগীতের সহিত একান্তভাবে সংযুক্ত। মধ্যাহ্নের মৌন-গম্ভীর সৌন্দর্য, পল্লীলক্ষ্মীর অন্তরের গভীর প্রশান্তি কি এই কয়টি রেখার বন্ধনে বাঁধা পড়ে নাই? যুক্তির পথে চলিয়া যে-সত্যে পৌছান যায় না, অনুভবী কবি তাঁহার শিল্পমায়ায় সেই আনন্দময় মুক্তিলোকের সন্ধান দিয়াছেন। নির্জীব ছবিগুলি পরস্পর গ্রথিত হইয়া সজীব চলচ্চিত্রের মতই প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে।

কবির বাল্য এবং কৈশোর কাটিয়াছিল জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে অত্যন্ত কঠোর শাসনের মধ্যে। এই শাসনতন্ত্র ছিল আবার 'ভৃত্যরাজক', অর্থাৎ তাঁহাদের ওঠাবসা, চলাফেরা সমস্তই একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং সেই গণ্ডী বা সীমান্ত-রক্ষক ছিল কয়েকটি চাকর। ছাদের উপর হইতে প্রাসাদময়ী নগরীর যে রুক্ষ-ধূসর রূপ ফুটিয়া উঠিত তাহাতে ছিল না আকাশের সুনীল আশ্বাস অথবা বনানীর শ্যামল বাণী!

"হায় রে রাজধানী পাষাণ-কায়া।
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে,
ব্যাকুল বালিকারে নাহিক মায়া।
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথ-ঘাট,
পাখীর গান কই, বনের ছায়া।"—ইহা কবির নিজের জীবনের কথা।

গৃহবদ্ধ কিশোর-কবির মন তাই বাহিরকে পাইবার জন্য সতত অধীর হইয়া থাকিত—দূর হইতে যখন গন্ধে-গানে, রঙে-রেখায় মুক্ত প্রকৃতির দু'একটি সংকেত কদাচিৎ আসিয়া পড়িত তখনই তাহারা এক দুর্বার বেগে তাঁহার মনকে টানিত। বোধ করি শৈশবের এই দীর্ঘ অনশনই কবির প্রকৃতি-ক্ষুধাকে এত বলবতী করিয়াছিল, তাই পরে শিলাইদহ এবং শান্তিনিকেতনে যে ভোজের

আয়োজন ঘটিয়াছিল তাঁহার বুভুক্ষু অন্তর সমস্ত চৈতন্য দিয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিল। এই প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' হইতে কয়েকটি লাইন তুলিয়া দেই—"বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল; এমনকি বাড়ির ভিতরেও আমরা যেমন-খুসি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ, শব্দ, গন্ধ দ্বার-জালনার ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত।"

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে Wordsworth এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রকৃতি সম্পর্কে ভাবগত আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। অথচ দুইজনের বাল্য-জীবন সম্পূর্ণ বিপরীত আবেষ্টনীর মধ্যে কাটিয়াছিল। হ্রদ-কবি Words-worth-এর বাল্য ও যৌবন মুক্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য-সমারোহের মধ্যে স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন ভাবেই অতিবাহিত হইয়াছিল। এবং এই রমণীয় পরিবেশ নিসর্গ-শোভার অন্তরতর রহস্যটি জানিবার জন্য তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল—কবির অনুপম ভাষায়, তাঁহাকে শিখাইয়াছিল "To search the mystic cause of things And follow Nature to her secret springs."

যাহা হউক, উভয় কবির প্রকৃতি-বিষয়ক দর্শন অনেকটা একই রূপ। উপনিষদের বাণী রবীন্দ্রনাথকে অভিমন্ত্রিত করিয়াছিল—এই ভূমাদৃষ্টি অর্থাৎ সর্ব্বভূতে একই প্রাণময় বিভুর অনুভূতি ভারতীয় ঋষিদের নিকট হইতেই তিনি রিকৃথরূপে লাভ করিয়াছিলেন। জীবনের একটি পরম মুহূর্তে মনের এমন একটি 'অনুকূল আর্দ্র' অবস্থা আসে যে "তার কাছে চারিদিকের বস্তু কেবল বস্তু নয়—কেবল দৃষ্টি-গোচর বা শ্রুতি-গোচর নয় কিন্তু ভাব-গোচর, তার সমস্ত সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা সে একটি সংগীতের দ্বারা পূর্ণ করে নেয়"—যখন বুদ্ধি দিয়া জানার অপেক্ষা ধ্যান দিয়া পাওয়ার আকাজ্ক্ষাই প্রবল হইয়া উঠে—যখন

"With an eye made quiet by the power

Of harmony, and the deep power of joy
We see into the life of things"

"যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥" শ্বেত ২।১৭

ইহাই কবির ধ্যানমন্ত্র—তাই শাখায় শাখায়, ফুলে ফুলে, সমুদ্রের কূলে কূলে হিমাদ্রির শৃংগে শৃংগে তিনি দেখিয়াছিলেন সুন্দরের অভ্রান্ত ইংগিত।

কবির ভাষায়,—

তোমার ইংগিতখানি দেখিনি যখন
ধূলি-মুষ্টি ছিল তারে করিয়া গোপন।
যখনি দেখিছি আজি, তখনি পুলকে
নিরখি ভুবনময় অাঁধারে-আলোকে
জ্বলে সে ইংগিত।
বিপরীত-মুখে তারে পড়েছিনু তাই
বিশ্বজোড়া সে লিপির অর্থ বুঝি নাই।

এই যে বিশ্বপ্রকৃতিকে একই সত্তার অভিপ্রকাশরূপে অনুভব করা ইহাই সকল দেশের মরমী কবির বিশিষ্ট দৃষ্টিভংগি। প্রকৃতির বিভিন্ন অভিব্যক্তির মধ্যে কতক-গুলি সামান্য নিয়মের আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকের কাজ;—কিন্তু সৃষ্টি তো কেবল একটা বিরাট্ যন্ত্রমাত্র নহে,—ব্যষ্টির সমষ্টি অথবা একটা অমোঘ অলংঘ্য শক্তি-মাত্রও নহে,—ইহা সুন্দর ও আনন্দময়। বুদ্ধি দিয়া ইহার স্থূল রূপের পরিমাপ হয়তো করা চলে, বোধির দ্বারা ইহার আনন্দরূপের উপলব্ধি করিতে হয়। 'বিশ্বচরাচর ঝরিছে আনন্দ হ'তে·আনন্দনির্ঝর', 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'; 'Of joy in widest commonalty spread'—ইহাই মরমী কবির জীবনের মূল কথা। ইন্দ্রিয় দিয়া ইহার যেটুকু বুঝা যায় তাহা ক্ষণিক, প্রেম দিয়া ইহাকে নিত্য-রূপে পাইতে হয়। বিশ্বপ্রকৃতিকে যখন চৈতন্য-নিরপেক্ষ স্থূল পদার্থরূপে দেখি—আসলকে ফেলিয়া যখন আবরণকেই বরণ করিয়া লই

তখন তাহার অন্তর্লীন আনন্দ-রূপটি অব্যক্তই রহিয়া যায়, কারণ এই চৈতন্য —এই প্রাণই তো আনন্দ এবং এই আনন্দই সৌন্দর্য। শিল্পীর কল্প-প্রতিমাখানি দেখিয়া যদি কেবল তাহার কারু-রূপেই মুগ্ধ হই—তাহার অন্তরে শিল্পীর নিভৃত সৃজনানন্দকে যদি খুঁজিয়া না পাই তবে সৃষ্টির পরম তাৎপর্যটাই আমাদের অজ্ঞাত রহিয়া যায়।

এই তাৎপর্যটি তত্ত্ব নহে—ইহা চিন্ময়ভাবের বেদনাময় উপলব্ধি। শ্রুতির ভাষায় 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।' এই প্রসংগে মরমী মার্কিন কবি এমার্সনের একটি উক্তিও প্রণিধান-যোগ্য— 'God has not made some beautiful things, but Beauty is the creator of the universe.' সূর্য আলোক বিকিরণ করে সত্য, কিন্তু দৃষ্টির সহিত সৌর রশ্মির মিলন না ঘটিলে যেমন বস্তু-রূপের প্রতীতি হয় না, তেমনি রূপময় বিশ্বের সহিত প্রেমময় দৃষ্টির মিলনেই রূপাতীত এক চিন্ময় সত্তার প্রতীতি হয়। চিদ্দীপের আলোক এই প্রেম—'প্রেমা চিদ্দীপ-দীপনঃ', তাই কবির মর্মের প্রার্থনা, 'এ দীপ আমার পিচ্ছিল তিমির-পথে যেন বারংবার নিভে নাহি যায়।'

আর একটা বিষয়েও Wordsworth ও রবীন্দ্রনাথের একটা মিল আছে। সুন্দরের উৎসব-সভায় প্রকৃতির বৈচিত্রীর সহিত একান্তভাবে যুক্ত থাকিয়া একটি রহস্যঘন অনুভূতি বারবার তাঁহাকে বর্তমান হইতে অতীতে, জন্ম হইতে জন্মান্তরে লইয়া যাইতেছে এবং তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছেন যে বিশ্বের সহিত তাঁহার এই বন্ধন অনাদিকালে এবং অনন্ত জীবনে অনুস্যূত রহিয়াছে। "আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ, সেই প্রেম, আমার সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ, আমার বুদ্ধি-মন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া রহিয়াছে"। আজিকার 'আমি' যে চিরকালের সেই 'আমি', 'লক্ষ যোজন দূরের তারকার' সহিত আমার যে বিনা-কথার

বাণী-বিনিময় চলে এই অনুবোধ বারেবারেই তাঁহাকে আকুল করিয়াছে। তাই তিনি একখানি পত্রে এই অনুভূতিটি এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। "ক্রমে যখন অন্ধকারে সমস্ত অস্পষ্ট হ'য়ে এলো, তখন ঠিক মনে হচ্ছিল এ সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার অপরূপ জগৎ—যখন এই বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পূর্ণ গঠিত হ'য়ে ওঠেনি, অল্পদিন হ'লো সৃষ্টি আরম্ভ হ'য়েছে—এ যেন তখনকার সেই অতি সুদূরবর্তী, অর্ধচেতনায় মোহাচ্ছন্ন, মায়ামিশ্রিত, বিস্মৃত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর।" আর একখানি পত্রে বলিয়াছেন, "আমার এই যে মনের ভাব এ যেন প্রতিনিয়ত অংকুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথ আদিম প্রকৃতির ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হ'চ্ছে।" আমার একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মার আলোকে আমাদের দেখাইতে চাহিয়াছেন, নিসর্গের সহিত মানুষের সম্পর্ক আকস্মিক অথবা ক্ষণিক নহে, এমন কি এক-জীবনেরও নহে;—তরুলতার মতই মানুষও প্রকৃতি-প্রতিমার একটি প্রধান ও অবিচ্ছিন্ন অংগ, মানুষকে বাদ দিয়া সে অসম্পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ এই প্রকৃতিকে এতই অন্তরংগরূপে দেখিয়াছেন যে তাঁহার কাব্যমুকুরে ইহার যে মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে তাহা যেন মানুষেরই মূর্ত্তি—তেমনি মমতাময়ী—তেমনি প্রাণবেগে চঞ্চল। 'বসুন্ধরা' কবিতায় জীবধাত্রী ধরণীকে জননীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে এবং 'এই জনমের স্মৃতির তলে আর জনমের ভাবের স্মৃতি'র সংযোগ কবিতাটিকে একটি অনাস্বাদিত স্বাদুতা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে পট-ভূমিকায় জীবনকে দেখিয়াছেন তাহা কত শত জন্ম-মৃত্যুর আলো-ছায়ায় লীলায়িত, অতীত ও অনাগতের সমুচ্চয়ে তাহা বিচিত্র ও বিপুল। বর্তমান হইতে দেখিতে দেখিতে তিনি অস্ফুট নীহারিকার যুগে চলিয়া যান, কখন বা কল্পনায় অলক্ষ্য দূর-ভবিষ্যতের স্বপ্ন-সংগীত রচনা করেন। ঋষি-কবি Wordworth-এর জীবন-দর্শনও ইহা হইতে কোন অংশে পৃথক্ নহে।

'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

"মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ঐ বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে'
ঐ তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে।"

"বসুন্ধরা' কবিতাতেও ঠিক অনুরূপ ভাবই পাই—

"আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের ; তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী-দিন
যুগ-যুগান্তর ধরি।"

এই প্রসংগে মহাকবি কালিদাসের

"তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি।" এবং

Wordsworth-এর Immortality Ode-এর নিম্নলিখিত চরণগুলি স্মরণীয়—

"Our birth is but a sleep and a forgetting :
The soul that rises with us, our life's Star,
Hath had elsewhere its setting,
And cometh from afar !"

"বসুন্ধরা" কবিতাটির মধ্যে আর একটি সুস্পষ্ট সুর লক্ষ্য করা যায় ; তাহা হইতেছে এককে বিচিত্রের নর্মলীলায় এবং বিচিত্রকে একের ধ্যান-সাধনায় উপলব্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষা। একদিকে যেমন তিনি সমস্ত বাহিরখানিকে অন্তরে লইবার জন্য উৎকণ্ঠিত, অন্যদিকে তেমনি—

'ব্যাপ্ত হয়ে দিকে দিকে, অরণ্যে ভূধরে—
কম্পমান পল্লবের হিল্লোলের পরে' দুলিতে দুলিতে

সারাবেলা প্রত্যেক কুসুমকলিটিকে চুম্বন করিয়া বেড়াইতে এবং নীড়ে-নীড়ে, গৃহে-গৃহে, গুহায়-গুহায় প্রবেশ করিয়া বৃহৎকে বিচিত্ররূপে জানিতে তাঁহার সাধ। "To see the parts as parts but with a feeling of the whole"—Wordsworth-এর মত ইহাই হইল রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভংগি।

এইবারে কবির কাব্য-জীবনের আদিপর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সংক্ষেপে প্রকৃতির প্রতি তাঁহার মানস-দৃষ্টির বিকাশধারাটির সন্ধান করা যাক্। প্রচলিত মতে খাঁটি নিসর্গ বলিয়া ছাপ দেওয়া যাইতে পারে এরূপ কবিতা রবীন্দ্র-সাহিত্যে দুর্লভ—কোমর বাঁধিয়া মামুলি নদ-নদীর বর্ণনা তিনি করেন নাই, অথচ আশ্চর্য্য এই যে প্রকৃতির স্নিগ্ধ মাধুরীটুকু প্রায় প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে এমন করিয়া মিশিয়া আছে যে তাহাদের অন্যনামে চিহ্নিত করাও শক্ত। প্রথমে 'প্রভাত-সংগীতের' 'নির্ঝরের স্বপ্নভংগ' কবিতাটি লওয়া যাক। উপলব্যথিত পার্বত্য নির্ঝরিণীর অসংবৃত ললিত গতি-ভংগির যে মনোজ্ঞ চিত্র-খানি তিনি ধরিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে মনে হয় ইহা তো নদী নহে—যেন কোন মায়াময়ী তরুণী তাহার লীলা-সুন্দর চপল চরণে নূপুর-দুটি বাজাইয়া চলিয়াছে, আর তাহার ছন্দে ছন্দে আনন্দ যেন ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে!

"কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরান ঢালি।
ভূধর হইতে ভূধরে ছুটিব, শিখর হইতে শিখরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।"

যে আবেগ এতদিন কবির অন্তর্গুহায় অবরুদ্ধ ছিল প্রকৃতির মায়া-কাঠির

স্পর্শে সহসা সে যেন তাহার মুক্তি-পথ খুঁজিয়া পাইল এবং দিগ্‌দিগন্তে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে করিতে নৃত্যচ্ছন্দে বহিয়া গেল। এই পর্বে কবির গুহামুক্তির পালা।

এই অপূর্ব চিত্র-সংগীতখানি কি ব্যংগ্যের ইংগিতে আমাদের মনকে দুলাইয়া দেয় না? আর কাব্যের প্রাণ-বস্তুই তো এই ব্যংগ্য—

ব্যঞ্জকত্বং তু মুখ্যতয়ৈব শব্দস্য ব্যাপারঃ।

পরবর্ত্তী কাব্যগ্রন্থ "কড়ি ও কোমলে" আছে রূপ-পিপাসার মদির রাগিণী এবং একটি করুণ অবসাদের সুরও তাহারই সংগে জড়াইয়া আছে। নিসর্গ-বর্ণনাগুলির মধ্যেও আছে একটা ক্লান্তির শৈত্য, আশার আলোক অথবা উত্তাপ কিছুই নাই।

আজি শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে কি জানি পরান কি যে চায়,
ওই শেফালির শাখে কি বলিয়া ডাকে, বিহগ-বিহগী কি যে গায়।
আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে, রহে না আবাসে মন হায়!
আজি কে যেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই জীবন বিফল হয় গো।
তাই চারিদিকে চায় মন কেঁদে গায় "এ নহে এ নহে নয় গো"!

ইহাতে আছে একটা নৈরাশ্যময় নির্বেদের সুর যাহা মনকে কি এক অনির্দেশ্য বেদনায় ব্যাকুল করিয়া তোলে। ইহার পর মানসী-কাব্যে কবির প্রকৃতি-দৃষ্টি একটা নূতন ও অপ্রত্যাশিত পথে মোড় ফিরিয়াছে—এবং দৃষ্টিভংগীর মধ্যে আশা ও নিরাশার, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের একটা দ্বন্দ্বও বাজিয়া উঠিয়াছে। কবির প্রকৃতি-দর্শন সম্বন্ধে মূল কথাগুলি পূর্বেই বিবিধ প্রসংগে বহুলরূপে আলোচিত হইয়াছে। মানসীতে সেই সাধারণ ধারার ব্যতিক্রম ও বৈপরীত্য লক্ষিত হয় বলিয়াই ইহার সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। এই কাব্যে প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা অনেকগুলি—প্রায় সবগুলিতেই তিনি প্রকৃতিকে একই পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়াছেন। এই দৃষ্টিভংগী সম্বন্ধে প্রথম এবং প্রধান কথা প্রকৃতি-জীবনে শৃংখলা এবং নিয়মের অভাব। 'কড়ি ও কোমলে' যে নির্বেদের

ভাবটি দেখা গিয়াছে বোধ হয় তাহাই ক্রমশ বিস্পষ্ট হইয়া প্রকৃতিকে প্রতীপ-রূপে কল্পনা করিয়াছে, অথবা ইহাও হইতে পারে যে মানবীয় ভাবটা প্রবল হইয়া নিসর্গ-দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। সে যাহাই হউক, সংগতির সংগীত ইহাতে বাজে নাই—এ যেন উন্মাদিনী ভৈরবীর উল্লোল নর্তন—আবেগের উদ্দামতায় বারেবারেই তাহার চরণ-নূপুরের তাল কাটিয়া যায়। মানুষের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন, বিশ্বনিয়মের একান্ত অধীন একটা স্বতন্ত্র শক্তিরূপে প্রকৃতির পরিকল্পনা এদেশে এবং বিদেশে বহু কবিই করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে প্রকৃতি শুধু নিয়তির চারিদিকেই অন্ধ আবেগে ঘুরিয়া মরে—মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই; তাহার হৃদয় নাই, সংবেদনা নাই, আছে শুধু দুর্বার গতিবেগ এবং নিয়মের পৌনঃপুনিকতা :

> "Nature, an infinite, unfeeling power
> From some great centre moving evermore
> Keepeth no festal-day when man is born
> And hath no tears for his mortality." —Keble

এই যে লক্ষ কোটী প্রাণী আশা-আকাংক্ষার ডালি সাজাইয়া সংসারের রংগমঞ্চে জীবন-লীলার অভিনয় করিয়া যাইতেছে, তাহাদের স্পন্দিত অন্তরের, করুণতম কম্পনও তাহাকে অণুমাত্র চঞ্চল করিতে পারে না;—অর্থাৎ মানুষের এবং প্রকৃতির অয়ন-চক্রই স্বতন্ত্র—পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া উভয়ে একটি সার্থক পরিণতি লাভ করে না। কিন্তু প্রেমের পথ মানুষের, তাই সে নিয়মকে মানিয়াও তাহার নিগড়ে বাঁধা পড়ে না। বাহ্য নিয়মের অন্ধ অধীনতা জড়ের লক্ষণ—প্রাণের ধর্ম্ম নহে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি', 'প্রকৃতির প্রতি', 'সিন্ধুতরঙ্গ' প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃতিকে মূঢ় জড়শক্তিরূপেই দেখিয়াছেন। সে যে কেবল মানুষের আহ্বানে সাড়া দেয় না তাহাই নহে, কোন শৃংখলা অথবা বিধানকেই সে মানিয়া চলে না, তাই তিনি বলিয়াছেন,

> 'মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়ম-নিগড়ে।'

সৃজন-স্রোতের অভ্যন্তরে পলে পলে আবিল আবর্ত ফেনাইয়া উঠে, কালের পারাবারে মানবের জীবন পাল-তোলা তরণীর মত অনুকূল বায়ুভরে বন্দরের অভিমুখে বহিয়া যায় না—তাহার বক্রমুখে পড়িয়া মানবের হৃদয়-বৃন্তের অস্ফুট কামনা-কলিকাগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কোথায় ভাসিয়া যায়! তাই কবি-কণ্ঠে বাজিয়া উঠে ;—

"হায় প্রেম, হায় স্নেহ, হায় তুই মানব-হৃদয়,
খসিয়া পড়িলি কোন নন্দনের তট-তরু হ'তে ?
যার লাগি সদা ভয়, পরশ নাহিক সয়,
কে তারে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের স্রোতে ?"

নিষ্ঠুরা প্রকৃতির হৃদয় বলিয়া কি কিছুই নাই ? স্পর্শাতুর মানব-হৃদয় তাহাকে বারবার আপনার মাঝে পাইতে চাহে—কত ভংগীতে, কত সংগীতে সে তাহার বন্দনা করে। বধিরা প্রকৃতি আজও তবু মানুষের সেই উন্মুখ আহ্বানে সাড়া দিল না—মানুষের কাছে তাহার রহস্য-গুণ্ঠন উন্মোচন করিল না! ঋতুতে ঋতুতে গন্ধ-গানের ডালি সাজাইয়া, হাসি-আলোর ঝারি ঝরাইয়া উৎসবময়ী প্রকৃতি কি মানুষের জীবনব্যাপী বিষাদকেই ব্যঙ্গ করিতেছে না ?

"আপন রূপের রাশে আপনি লুকায়ে হাসে
আমরা কাঁদিয়া মরি এ কেমন রীতি ?"

প্রাণের পানপাত্র হইতে দুঃখের আসব পান করিতে হয়,—ইহাই মানুষের ভাগ্যলিপি, সুতরাং ইহাতে তাহার দুঃখ নাই। কিন্তু এই অন্তহীন দুঃখে সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই এই চিন্তাই তাহাকে আকুল করিয়া তুলে। তাই তৃষিত চাতকের মত করুণাবিন্দুর প্রত্যাশায় স্নেহাতুর নয়নে সে প্রকৃতির পানে চাহিয়া থাকে, কিন্তু কই মমতাময়ী জননীর মত ধরণী তো বলিয়া উঠে না—

আমি শুধু ধূলি নই, বৎস, আমি প্রাণময়ী
জননী, তোদের লাগি অন্তর কাতর!

নহ তুমি পরিত্যক্ত অনাথ সন্তান
চরাচর নিখিলের মাঝে;
তোমার ব্যাকুল স্বর উঠেছে আকাশ পর,
তারায় তারায় তার ব্যথা গিয়ে বাজে!

কিন্তু কি কুহক জানে এই মায়াবিনী—কিছুতেই তো ইহাকে ভুলা যায় না! যতই সে উপেক্ষাভরে মুখ ফিরাইয়া থাকে তাহাকে পাইবার আগ্রহও যেন ততই বাড়িয়া যায়। বুঝা যায় না বলিয়াই তাহাকে বুঝিবার, ধরা যায় না বলিয়াই তাহাকে ধরিবার জন্য হৃদয় অধীর হইয়া উঠে: তখনই কবি গাহেন:

যত তুই দূরে যাস্ তত প্রাণে লাগে ফাঁস,
যত তোরে নাহি বুঝি তত ভালবাসি!"

"সিন্ধু-তরংগ" কবিতাতে আবার প্রকৃতিকে মমতাহীনা রাক্ষসীরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। মানুষের আশা ও আকাংক্ষাকে মুহূর্তে চূর্ণ করিয়া—শান্তিলুব্ধ মানবাত্মার সকল সুখ-শান্তি হরণ করিয়া—চিত্তাকাশের কামনা-রঞ্জিত স্বপ্ন-ছবিখানি ঘনাবলেপে মুছিয়া লেপিয়া দিয়া প্রকৃতি-রাক্ষসীর একি উল্লোল উল্লাস! জীবনের বর্ণবৈভব তো তাহাতে নাই, আছে ক্রূর মৃত্যুর হিংস্র উৎসব। তাই প্রকৃতিকে উদ্দেশ করিয়া কবির এই অভিমানভরা জিজ্ঞাসা—

সহস্র জীবনে বেঁচে ওই কি উঠিছে নেচে
প্রকাণ্ড মরণ?

এ যেন পিশাচী বিমাতার হিংস্র উত্তরোল!

কিন্তু এই যে নিষ্ঠুর জড়স্রোত—ইহারই মধ্যে মানুষের মর্ম্মকোষে স্নেহ-প্রেমের অক্ষয়সুধা কে সঞ্চিত করিল? এই প্রেম সেই অমিত শক্তি কোথায় পাইল যাহার বলে প্রাণের ধনকে বুকে বাঁধিয়া ভয়াল মৃত্যুকেও সে উপেক্ষা করিতে পারে? জড়-দৈত্যের সহিত প্রেম-দেবতার এই যে অনিবার 'ভাঙাগড়াময়' 'দ্যূত-খেলা' ইহাই কবিকে সর্ব্বাধিক বিস্মিত করিয়াছে,—'পাশা-পাশি এক ঠাঁই দয়া আছে, দয়া নাই, বিষম সংশয়।" কলকথা এখনও পর্যন্ত কবি

উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে একই দেবতার দুই রূপ আছে—রুদ্র ও মনোহর, —'সুন্দর সে, মহান্ সে, মহাভয়ংকর'; আঘাত দিয়া যিনি কাঁদান, তিনিই আবার অসীম মমতায় হৃদয়ের তপ্ত অশ্রু মুছাইয়া দেন।

কিন্তু ইহাই মানসী-কাব্যের প্রকৃতি-কবিতায় রবীন্দ্রনাথের একমাত্র দৃষ্টিভংগী নহে। 'জীবন-মধ্যাহ্নে' কবিতাটির মধ্যে কবি প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন সম্পূর্ণ বিপরীত পরিপ্রেক্ষিতে; এখানে সে নির্মম অথবা অন্ধ জড়শক্তিমাত্র নহে—মানুষের সুখ-দুঃখে উদাসীনও নহে—তাহার অন্তরে আছে একটি রহস্য-ঘন গহনমায়া! জটিল জীবনের কুটিল পথে বেদনাদীর্ণ অন্তর যখন অনাবৃত হইয়া পড়ে, যখন আত্মার নগ্ন দীন মূর্তিখানি দেখিয়া মানুষ বার-বার শিহরিয়া উঠে, তখন প্রকৃতি পাঠাইয়া দেয় তাহার প্রাণে সান্ত্বনার অমৃত-সংকেত! সেই অলক্ষ্য মায়ার স্পর্শে ম্রিয়মাণ মানব নবীন জীবনানন্দে স্পন্দিত হয়। অন্তরের করুণ বেদনা বিশ্বের অণু-পরমাণুতে সঞ্চারিত হইয়া তাহার তীক্ষ্ণতা হারাইয়া ফেলে—একের ক্রন্দনে বিশ্বহৃদয়ে বেদনার বান ডাকিয়া যায়! প্রশান্ত গভীর প্রকৃতির মাঝে জীবের জীবনধারা যখন হারাইয়া যায়, স্বার্থের ব্যাপ্তির ফলে তখন দুঃখের মৃণালে আনন্দের শতদল ফুটিয়া উঠে! কবির কথায়, 'বিশ্বের নিঃশ্বাস লেগে জীবন-কুহরে মংগল আনন্দধ্বনি বাজে।' বিশ্বজীবনের সহিত ভাবের এই আত্মীয়তা হইতেই লোকোত্তর আনন্দের উদ্ভব। এই প্রসংগে কবি কোলরিজের 'Æolian Harp' কবিতার নিম্নলিখিত চরণগুলি স্মরণীয়:

O, the one life within us and abroad,
Which meets all motion and becomes its soul,
A light in sound, a sound-like power in light,
Rhythm in all thought and joyance everywhere.

এইবারে মানসীর একটী বিখ্যাত কবিতার উল্লেখ করির। 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় কবি প্রকৃতিকে একটি নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছেন। ধরণী এখানে প্রাণময়ী জননী, সন্তানের জন্য তাঁহার আকুতি ও উৎকণ্ঠার অন্ত নাই। মাতৃহৃদয়ের

গহনগোপনে সন্তানের জন্য যে কী অক্ষয় মমতার মধু সঞ্চিত আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বস্তুরূপা এই যে প্রকৃতি-প্রতিমা—ইহা নিস্পন্দ অথবা নিষ্ক্রিয় নহে, ইহার অভ্যন্তরে একটি নিগূঢ় চেতনা আছে—একটি স্নেহবিহ্বল স্পর্শাতুর আত্মা আছে। জননী যেমন স্তন্যরসে সন্তানকে লালন করেন,—রোগে সেবা, শোকে সান্ত্বনা দান করেন, স্নেহশীলা ধরণীও তেমনি অন্তরের নিভৃত নেপথ্য হইতে তাঁহার অসংখ্য সন্তানের জন্য ধন-ধান্যরূপ অমৃত-পথ্য প্রেরণ করিয়া তাহাদের নিত্য সঞ্জীবিত রাখিতেছেন।

"Nature never betrayed the heart that loved her."

এই ধরণী শুধু জীবন্ত তাহাই নহে, ইহার একটা সুপরিস্ফুট ব্যক্তিত্ব আছে; তাই ইহার সহিত আমাদের সংস্পর্শ শুধু অনুভূতিময় নহে—ইহা ব্যক্তি-মনের সহিত একটি নিবিড় জীবন্ত যোগ! তাই প্রকৃতির সহিত আমাদের নিত্যকার হাসি-কান্নার লীলা চলে। পদ্মাবক্ষ হইতে লিখিত একখানি পত্রে কবি স্বয়ং বলিয়াছেন, "এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য্য নয়—এর মধ্যে একটা চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্চে—এর মধ্যে অনন্ত বৃন্দাবন"।

কিন্তু এইখানেই কবি-চিত্তের চরম স্থিতি নহে; ইহার পরে তিনি বিশ্বরহস্যের আরো গভীরে নামিয়া গিয়াছেন। সেই সূক্ষ্মলোকে মানব-মনে ও প্রকৃতি-মনে কোনও বিচ্ছেদ নাই—জড়ে ও জীবনে কোনও দ্বৈত নাই—বিচিত্রের বহুরন্ধ্র বাঁশীখানি একের সুরেই অনুরণিত।

এইবারে আর একটা নূতন দিকের পরিচয় দিব। এই যে কবিরা পর্ব্বত-প্রান্তর সরিৎ-সাগর মেঘ-রৌদ্র ছায়া-আলো প্রভৃতি নৈসর্গিক বস্তুপুঞ্জের মধ্যে একটি ভাগবত মহিমা উপলব্ধি করেন, ইহা সম্ভব হয় কিরূপে? এই বহুবিচিত্র প্রকৃতি-চিত্র তো বহুকাল হইতেই মানুষের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা চিরকালই ইহাকে অনন্তের অভিজ্ঞানরূপে কল্পনা করে নাই কেন? যদি বস্তুপুঞ্জেই এই অধ্যাত্ম সৌন্দর্য একান্তভাবে নিহিত থাকিত—যদি বিশ্বগ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সুন্দরের লিপিকাখানি লিখিত থাকিত, তবে সর্বকালের সকল

মানুষই ইহা হইতে একই বাণীর সন্ধান পাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই; আদিম যুগে মানুষ প্রকৃতিকে স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থরূপেই গ্রহণ করিয়াছে। এখনো আমরা অনেকে এই বিরাট্ বিশ্ব-রূপকের নিভৃত, নিলীন অর্থটি ধরিতে পারি না, কারণ আমাদের চিত্ত-শক্তি ও কান্তি-বৃত্তির যথোচিত উন্মেষ এখনো হয় নাই—বোধ হয় কোন কালেই হওয়া সম্ভব নয়। তাই এই প্রতীয়মান জগৎকে আমরা বাহির হইতে আল্‌গোছে দেখি, অন্তর দিয়া তাহাকে ধরিতে পারি না। যদি বা কেহ ধরিয়াছে সেই ক্ষণস্পর্শটিকে ভাষা দিয়া বাঁধিতে পারে নাই—আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা তাহার প্রকাশের শক্তিকে বারেবারেই হার মানাইয়াছে। রূপ-জগতের মধ্যেই অরূপের ব্যঞ্জনা দেখিয়া, সান্তের মাঝেই অনন্তের আসন অচল-প্রতিষ্ঠিত জানিয়া মানুষ নিসর্গের মতই ইংগিতময় ভাষায় তাহার সুর বাঁধিয়াছে—প্রকৃতি হইতে নানা উপাদান আহরণ করিয়া নিজের মনের ভাবচ্ছবির সহিত তাহার মিল খুঁজিয়াছে; প্রকৃতির ছন্দোবন্ধ, তাহার সুরঝংকার, তাহার বর্ণৈশ্বর্য কবির প্রাণ ও গানকে দুলাইয়া দিয়াছে। তাই কবি প্রকৃতির ভাষায় কথা বলেন, প্রকৃতি হইতে উপমাদি অসংখ্য অলংকার সংকলন করিয়া তাঁহার মানস-সুন্দরীকে সাজাইয়া তোলেন। প্রকৃতির একটি মূক ভাষা আছে কান দিয়া যাহা শুনা যায় না, প্রাণ পাতিয়া যাহা শুনিতে হয়; কবি সেই অগীত গান শুনিতে পান; কারণ এমার্সনের কথায়, He is the man without impediment. তারার ঝিলিকে, পল্লবের হিল্লোলে, ব্রততীর নতিতে একটি অশ্রুত পুলকের সুর তাঁহার কানে আসে এবং আপন মনের গোপন কথাটি তিনি উহাদেরই জবানিতে বলিয়া যান। মোহবশে আমরা মনে করি লোক ঠকাইবার জন্যই কবির এই ইন্দ্রজালের সৃষ্টি। মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলি—গন্ধ, ছন্দ, আনন্দ—শুনিতে নেহাৎ মন্দ লাগে না; কিন্তু উহাদের পরস্পর সম্বন্ধটা তো খুঁজিয়া পাই না। এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব, কারণ এই প্রত্যয় তো বুদ্ধি-গম্য নহে, ইহা অনুভূতি-সাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কথায় কথায় প্রকৃতির প্রসংগ, গন্ধগীতির প্রসংগ আসিয়া পড়ে কেন তাহারই কৈফিয়ৎ স্বরূপ একথা

বলিতে হইল। শেলী যখন বন-বাণীর মধ্যে তাঁহার মানসীর বাণীর ধ্বনিটী শুনিয়া বলিয়া উঠেন—

In solitude

Her voice came to me through the whispering woods.

তখন তাহাতে অবাক্ হইবার কিছুই নাই। দৃষ্টি যাঁহাদের স্বচ্ছ, সৃষ্টির রহস্যকে তাঁহারা সহজেই স্পর্শ করিতে পারেন। তাই রবিকবির কণ্ঠে শুনি :—

শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে যে দিন হাওয়া উঠ্‌তো কেঁপে
ফাগুন-বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়,
যেদিন দিকে দিগন্তরে লাগ্‌তো পুলক কি মন্তরে
কচি পাতার প্রথম কলকথায়,
সেদিন মনে হ'তো কেন ঐ ভাষারই বাণী যেন
লুকিয়ে আছে হৃদয়-কুঞ্জ-ছায়ে,
তাই অমনি নবীন রাগে কিসলয়ের সাড়া লাগে
শিউরে-ওঠা আমার সারা গায়ে!—পূরবী।

'পূরবী'তে বাতাসের সংগে কবির সংলাপটুকু বড়ই সুন্দর এবং ইহার মধ্যে কবি-চিত্তের স্বরূপটী অনেকটা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

শুধায় সবে, ওগো বাতাস, তবে তোমার আপন কথা কী যে
বল মোদের, কি চাও তুমি নিজে?
বাতাস বলে, আমি পথিক, আমার ভাষা বোঝো বা নাই বোঝো
আমি বুঝি তোমরা কারে খোঁজো,—
আমি শুধু যাই চ'লে আর সেই অজানার আভাস করি দান,
আমার শুধু গান।

মানুষের জীবনে যেমন, প্রকৃতির জীবনেও তেমনি, কর্ম ও ধ্যানের ধারা গংগা-যমুনার মত বহিয়া চলিয়াছে, 'বাহিরের দিকে তার চঞ্চলতা, অন্তরের দিকে তার শান্তি, বাহিরের দিকে তার তট, অন্তরের দিকে তার সমুদ্র'।

বৈজ্ঞানিকের চোখে প্রকৃতির কর্মজীবনের ধারাটিই ধরা পড়ে,—'সেখানে কুঁড়ি ফুলের দিকে, ফুল ফলের দিকে, ফল বীজের দিকে, বীজ গাছের দিকে হন্ হন্ করে ছুটে চলেছে।' কিন্তু অন্তরে তার অনন্ত সৌন্দর্য, অনন্ত ঐশ্বর্য—সেখানে সে 'আমাদের কাছে প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে'। কবির কাব্যে প্রকৃতির ধ্যান-জীবনের মর্মবাণী সংগীতের সহস্রদলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কখন শরতের কাঁচা সোনায়, বনের নবীন শ্যামলতায় তিনি কিশোর-মনের আনন্দের রঙ্‌টি খুঁজিয়া পান! কখন বর্ষণমুখর শ্রাবণ-রাত্রিতে প্রিয়-বিরহের বেদনা ঘন মেঘের ছায়ার মতই মনের পরে নামিয়া আসে; বৈষ্ণব কবিদের মতই * তাঁহার আর্ত অন্তর তখন কাঁদিয়া উঠিয়া বলে—

"তুমি যদি না দেখা দাও
কর আমায় হেলা
কেমন করে কাটবে আমার
এমন বাদল-বেলা।"

আবার কখনও বা নববর্ষায় মেঘমেদুর আকাশ দেখিয়া ময়ূরের মতই তাঁহার প্রাণ বর্হ বিস্তার করিয়া নাচিয়া উঠে। এমনি করিয়া চলিতে থাকে ঋতুতে ঋতুতে কবির সহিত প্রকৃতির বিরহ-মিলনের ছায়া-রৌদ্রের লীলা!

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল, অথচ বলার কথা অনেক বাকী রহিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের পটভূমি এত বিরাট্ এবং তাঁহার প্রতিভা এত বিচিত্র ও বহুমুখী যে একটি নিবন্ধে তাহার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। অতএব সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া আমরাও এই খানেই আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত করিলাম।

---

* "বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোঁয়ায়বি
হরি বিনু দিন রাতিয়াঁ।"
"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

রবীন্দ্র-কাব্যে রূপক

রবীন্দ্রনাথের কাব্যমঞ্জুষায় রূপক-রচনার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে এবং এই রূপকের আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহাদের নিভৃত অর্থের উদ্ধারও খুব সহজ নহে। নানা জনে তাহা হইতে নানা অর্থ টানিয়া বাহির করে,—কাজেই অবিসংবাদিত কোন অর্থ-আবিষ্কারের চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু কবি আদৌ এই রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করেন কেন? যে সংবেদনা বা অনুভূতির তরংগটি তাঁহার অন্তরকে আলোড়িত করিয়াছে তাহাকে তিনি তাহার সহজ স্বরূপে প্রকাশ করেন না কেন? ইহার উত্তর, কবির হৃদয়ের ভাবগুলি এতই স্বতন্ত্র ও গভীর যে পরিচিত প্রতীক অথবা শব্দ-চিত্রের দ্বারা তাহাদের পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভব নহে। সুতরাং তাহাদের খোলাখুলিভাবে বুঝাইবার ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়িয়া তাঁহাকে সংকেতময় বাগ্‌-ভংগির আশ্রয় লইতে হয়। এই বাগ্‌-ভংগি আবার দৃগ্‌-ভংগির বৈশিষ্ট্যের উপরই বহুল-পরিমাণে নির্ভর করে। অভিব্যক্ত জগতের পিছনে যে অনন্ত অব্যক্ত জগৎ রহিয়াছে সে সম্বন্ধে যাহাদের দৃষ্টি ক্ষীণ, তাহাদের পক্ষে হয়তো শব্দ-চিত্র রচনা করিয়া মনের ভাবটা মোটামুটি বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়; কিন্তু কাব্য তো কেবল রূপলোকের শব্দ-চিত্রমাত্র নহে,—প্রাকৃত জগতের অবিকৃত প্রতিরূপও উহা নহে। সেই রূপলোক কবির চিত্তকে যে ভাবে দোলা দিয়াছে, সেই আনন্দ-শিহরণের কোন ইংগিত যদি তাহাতে না থাকে তবে শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে তাহার সার্থকতা বিন্দুমাত্রও নাই। পরিচিতের সহিত পরিচয়-সাধনের জন্য কবির দৌত্যের প্রয়োজন কি? এই পরিচিত পুরাতন জগৎ হইতে কবি যখন আমাদিগকে এক অভিনব অপরিচিত রাজ্যে লইয়া যান, তখন কি এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে আমাদের মন ভরিয়া উঠে; কিন্তু শব্দের বাচ্যার্থের এমন শক্তি নাই যে আমাদের মনকে স্থূল বস্তুলোক হইতে

আনন্দময় রসলোকে উত্তীর্ণ করিতে পারে। 'নিয়তি'র নিয়ম মানিয়া পরিচিত-পথে সেখানে পৌছান যায় না; সেই 'নবরসরুচির' স্বপ্ন-স্বর্গের স্বর্ণ-মন্দিরে পৌছিতে হইলে ব্যঞ্জনাময়ী কবি-বাণীর শরণ লইতে হয়। যে পরিমাণে যে বাক্য তাহার বাচ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া তাহার প্রতীয়মান অর্থটিকে প্রতিভাসিত করিতে পারে সেই পরিমাণে তাহা সার্থক-কাব্যরূপে পরিগণিত হয়। সংকেতের অর্থ কেবল প্রতিরূপ-রচনা নহে—যাহা দৃষ্টির অগোচর তাহাকে রূপ-সীমার মধ্যে তুলিয়া ধরা। ব্যঞ্জনা-শক্তির অভাবে কাব্য রসরক্তহীন কংকালে পরিণত হয়; মন যেখানে ছিল সেইখানেই রহিয়া যায়, কারণ রসাবেগবর্জিত ভাব আমাদের প্রাণে কোন স্পন্দন সঞ্চার করিতে পারে না। সাংকেতিকতা যখন যথার্থ রসরূপতা লাভ করে তখন তাহার মধ্যে সীমাহীনের বেদনা ব্যঞ্জিত হয়; সুতরাং কাব্যের রসত্ব ও গুরুত্ব নির্ভর করে তাহার প্রতীক-রূপের সার্থকতার উপর।

একটি কথা এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করি। যে স্থূল বস্তু-জগৎকে আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি তাহা যে নিতান্তই ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র এবং ইহার পিছনে যে অনন্ত অমূর্ত জগৎ বিদ্যমান আছে, এই প্রত্যয় প্রতীক-কবিগণের কল্পনায় এতই সত্য যে তাহা আমাদের পক্ষে ধারণা করাও কঠিন। এই সসীম জগৎকে তাঁহারা দেখেন অনন্ত অব্যক্ত জগতের ভাব-বিগ্রহরূপে; কাজেই প্রাকৃত জগৎ তাঁহাদের দৃষ্টিতে অপ্রকৃত এবং স্বপ্ন-রঞ্জিত অপ্রাকৃত জগৎই একমাত্র সত্য।

কিন্তু এই দৃষ্টিভংগি যদি কেবল কবিরই বৈশিষ্ট্য হয় এবং সাধারণ ধারণার একান্ত অনধিগম্য হয় তাহা হইলে তো ইহাকে রুগ্ণ মনের বিকার অথবা কথার কূটাভাস বলিয়া উড়াইয়া দিতে হয়। কিন্তু এই স্থলে মনে রাখা প্রয়োজন যে কাব্য কবির অন্তর-পুরুষের অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ-মাত্র। এই ব্যক্তিত্ব-সত্তাটি কি তাহা বুঝিতে হইলে মনঃসমীক্ষণ-বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হইতে হয়। ফ্রয়েডের মতে আমাদের মানস-জীবনকে মূলত সংজ্ঞান

ও নির্জ্ঞান এই দুই স্তরে বিন্যস্ত করা যাইতে পারে। মনের গভীরে কতকগুলি শক্তিশালী মানসিক ক্রিয়া—আবেগ, অনুভূতি প্রভৃতি—চেতনার স্তরে উপনীত না হইয়াও বিদ্যমান আছে। একটি প্রবল-প্রতিকূল শক্তির প্রতীপতায় গহন মনের এই প্রত্যয়গুলি চেতনার স্তরে পৌঁছিতে পারে না, কিন্তু এই বাধা না থাকিলে উহারা চৈতন্য-লোকে উদ্‌ভাসিত হইতে পারিত। এই প্রত্যয়গুলি যে আছে তাহা প্রমাণিত হয় যখন মনঃসমীক্ষণের বিশেষ আংগিকের সহায়তায় সেগুলি অব্যক্ত হইতে ব্যক্তলোকে উপনীত হয় এবং তখন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি সচেতন প্রত্যয়গুলি হইতে ইহাদের পার্থক্য কত সামান্য।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মানসিক ক্রিয়াগুলির একটি সুব্যবস্থিত সংহতি বিদ্যমান আছে ; ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে 'Ego' বা 'অহম্'। ব্যক্তিত্ব বলিতেও আমরা এই সত্তাকেই বুঝি। এই 'অহম্' আমাদের সচেতন চিন্তার প্রবাহ, আমাদের ধারণা ও সংবেদনার সমষ্টিমাত্র এবং ইহা হইতেই উদ্‌ভূত হয় অবদমন (repression)। এই অবদমনের প্রভাবে আমাদের বিশেষ কতকগুলি মানসিক সংসক্তিই যে শুধু সংজ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তাহা নহে, অন্যান্য অভিব্যক্তি ও উদ্যমও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ফ্রয়েডের মতে এই অহম্ বা ব্যক্তিত্ব স্বরূপত নিষ্ক্রিয় এবং অজ্ঞাত ও অপ্রতিরোধ্য শক্তিপুঞ্জের দ্বারাই ব্যক্তিত্বের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত ; এই অনিরূপ্য শক্তিকেই শেলী বলিয়াছেন, অলক্ষ্য শক্তির মহাছায়া—"The awful shadow of some unseen Power"। এই শক্তিগুলি অন্তর্লীন—প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিশিষ্টরূপে বিশ্লিষ্ট,—এবং আমাদের অবদমিত আবেগ ও সহজ প্রবৃত্তিগুলির আধার হইলেও সচেতন বুদ্ধির বশীভূত নহে। মনঃসমীক্ষণ-শাস্ত্রে নির্জ্ঞান মনোলোকের এই সংরক্ষিত আধারের নাম 'Id' অথবা নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ব ; অর্থাৎ আমাদের সচেতন চিন্তাসমূহ এই 'ইড্'-এর দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহার ব্যক্তিরূপ পরিহার করিয়া বিশ্ব-বোধের মধ্যে বিলীন হয়। সচেতন মনের ক্রিয়ার নাম চিন্তা—

নির্জ্জানের গভীরতম প্রদেশের ক্রিয়াগুলিই কল্পনা নামে পরিচিত। এই কল্পনা আমাদের বস্তুমুখীন চিন্তানিচয়কে অন্তর্মুখীন ও বিশ্বমুখীন করিয়া দেয়, সংকীর্ণতার সীমা অতিক্রম করিয়া মন ধ্যানের অসীমতায় মিলাইয়া যায়। রূপ হইতে অপরূপের রাজ্যে মনের এই যে পক্ষ-বিস্তার কারুসৃষ্টির ইন্দ্রজাল এইখানেই। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিলেও আমরা এই সত্যেরই সন্ধান পাইব। রবীন্দ্রনাথ এই শক্তিকে তাঁহার অন্তরস্থ এক নিগূঢ় ও অনির্বাচ্য শক্তিরূপে অনুভব করিয়াছেন। ইহা তাঁহার জীবনব্যাপী ভাব-কুসুমগুলিকে এক অখণ্ড তাৎপর্যের সূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছে। এ সম্বন্ধে কবি স্বয়ং এইরূপ বলিয়াছেন, "যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। ...যেটা লিখিতে যাইতেছিলাম সেটা সাদা কথা, সেটা বেশী কিছু নহে—কিন্তু সেই সোজা কথা, সেই আমার নিজের কথার মধ্যে এমন একটা সুর আসিয়া পড়ে যাহাতে তাহা বড় হইয়া ওঠে, ব্যক্তিগত না হইয়া বিশ্বের হইয়া ওঠে।...এই যে কবি যিনি আমার সমস্ত ভাল-মন্দ, সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি জীবন-দেবতা নাম দিয়াছি।" ফ্রয়েডও, জর্জ্জ গ্রডেক্-এর অনুসরণে, 'Ego' অথবা ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অবিকল এই কথাই বলিয়াছেন—"The conduct of the ego throughout life is essentially passive—we are 'lived', as it were, by unknown and uncontrollable forces"। টি-এস্-ইলিয়ট্ বলিয়াছেন, সাহিত্য ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি নহে—প্রত্যুত ব্যক্তিত্ব হইতে আত্মার মুক্তি। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, যে পর্য্যন্ত না আমাদের মন সচেতন চিন্তার প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নির্বিশেষ কল্পনার মধ্যে সমাহিত হয় সে পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয় না। বিচ্ছিন্নতা বা 'detatchment'ই শিল্প-সৃষ্টির অপরিহার্য অংগ। কাজেই উপর হইতে তাঁহার এই উক্তিটি আমাদের প্রতিপাদ্যের বিপরীত শুনাইলেও আসলে উহার পরিপোষক।

রূপকে রূপ-ধারণাই কল্পনার ধর্ম্ম—কেবল চিত্ররূপে নহে, পরন্তু বিচিত্ররূপে ভাবের দর্শন। আমাদের গহন মনের স্মৃতি-সম্পুটে জন্ম-জন্মান্তরের অসংখ্য স্মৃতি সঞ্চিত হইয়া আছে; সংজ্ঞান-লোকে ইহারা কদাচ উদ্‌ভাসিত হয় না। কল্পনা সেই গভীর অতল হইতে কত-না বিস্মৃত স্মৃতির উদ্ধার করে এবং প্রতীকের সহায়তায় আকারিত করিয়া সাহিত্য ও বিবিধ শিল্পকলায় তাহাদের মুক্তি দান করে। এই কল্পনা যে আমাদের মনকে কেবল সংজ্ঞানের উদ্‌ভাসমান স্তর হইতে সংজ্ঞান-পূর্ব স্তরের অন্তর্ভূমিতে লইয়া যায় তাহা নহে—সংজ্ঞান হইতে নির্জ্ঞানের গহনতম গুহায় (Id) ইহার দৌত্য চলিয়া থাকে। সংজ্ঞান-পূর্ব স্তরে শুধু এই-জীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ স্মৃতি ও সংবেদনাসমূহই সঞ্চিত থাকে—কিন্তু নির্জ্ঞান মনোলোকের যে 'অতলান্ত' গভীরতায় জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি-সংবেদনাসমূহ সংরুদ্ধ থাকে সেই দুষ্প্রবেশ্য লোকে প্রবেশের ছাড়পত্র আছে শুধু কল্পনারই হাতে। রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাই এই জন্ম-পূর্ব সংস্কারের অক্ষয় স্বাক্ষর বহন করিতেছে। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি হইতেই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়:—

যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট্‌ জঠরে
অজ্ঞাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলগান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে।

ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সহিত এই দৃষ্টি-ভংগির সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে বলিতে হয় মনঃ-সমীক্ষণের জটিল ও বিশিষ্ট আংগিকের সাহায্যে যাহা ব্যক্তলোকে উদ্‌ভাসিত হয়, কবি-কল্পনা সহজ প্রেরণায় অনায়াসেই তাহা সম্পন্ন করে।

ব্যক্তিত্ব ব্যাপারটিকে ঠিকমত বুঝিতে হইলে চরিত্রের সহিত ইহার তুলনা করিতে হয়। প্রথম কথা, ইহা সঞ্চরণশীল; Shelley-র ভাষায়, **'It visits with inconstant glance Each human heart'**—চরিত্রের মত ইহা অচল-প্রতিষ্ঠ নহে। তাহা হইলে ইহাকে "মানসিক ক্রিয়াসমূহের সু-

ব্যবস্থিত সংহতি” কি করিয়া বলা যায়? এই সঞ্চরণশীলতা কি সংহতি-ধর্মের বিরোধী নহে? উত্তরে বলা যায়—‘না’; কারণ সংগূঢ় অথচ সক্রিয় ঐ কল্পনা-শক্তির স্বাভাবিক গতিও অখণ্ড ঐক্যের দিকেই; বহির্মুখী দৃষ্টিতে যাহা অসংগতিরূপে প্রতীত হয়, অন্তর্মুখী দৃষ্টিতে তাহাই সুসংহত ও সুসমঞ্জস-রূপে প্রতিভাত হয়। নিগূঢ় মনোলোকের মুক্তধারার মুখে পড়িয়া ব্যক্তিত্বের প্রকাশ-রূপের রূপান্তর ঘটে; কিন্তু প্রতীক-কাব্যের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা যাঁহারা তাঁহারা যে অপূর্ব-পরিচিত দৃষ্টিকোণ হইতে জীবনকে দেখেন সেখান হইতে দেখিলে অভিব্যক্ত ইন্দ্রিয়-জগৎকে আর সত্য বলিয়া মনে হয় না এবং অলক্ষ্য অন্তর্জগৎকেও নিছক স্বপ্ন বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন হয়।

তবেই দেখা গেল, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব এক বস্তু নহে, চরিত্রের অভিব্যক্তিও সাহিত্য নহে। চরিত্র স্থির ও সুপ্রতিষ্ঠ, কোন কারণেই ইহার ব্যবহারের ব্যতিক্রম হয় না। চরিত্রের আছে শুধুই প্রকাশ, ব্যক্তিত্বের মত ইহার বিসার ও বিকাশ নাই। “নিভৃত নিঃসংগতায় হয় প্রতিভার (ব্যক্তিত্বের) জন্ম, চরিত্র সংগঠিত হয় সংসার-প্রবাহের মধ্যে।” কবিগুরু গ্যেটের এই নিরুক্তিটির মধ্যেই চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের পার্থক্যটি সন্নিবিষ্ট আছে। চরিত্র উৎকীর্ণ চিহ্নের মত অনপনেয় (গ্রীক ভাষায় চরিত্রের অর্থও ইহাই); ইহা অনুভূতির উত্তাপে গলে না, আবেগের আঘাতে টলে না, সঞ্চিত অভিজ্ঞতার প্রভাবে কিছুতেই ইহার রূপান্তর হয় না;—এককথায় চরিত্র বলিতে বুঝায় একটি স্থির নৈর্ব্যক্তিক আদর্শ যাহা সমস্ত সুকুমার-বৃত্তির আবেদনের ঊর্ধ্বে আপনাকে ধরিয়া রাখে।

সাংকেতিকতা ব্যাপারটিই আমাদের বর্তমান সন্দর্ভের প্রধান আলোচ্য এবং ইহার আলোচনা-প্রসংগে স্বভাবতই কল্পনার কথা আসিয়া যায়, কারণ সংকেতময়তাই কল্পনার ধর্ম। যাহা অন্তর্গূঢ় এবং অনির্বচনীয় তাহার পূর্ণাংগ অভিব্যক্তি সম্ভব নহে, তাহার প্রতি শুধু অংগুলি নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হয়। কিন্তু এই সংকেত-সংজ্ঞাটি এতই অস্পষ্ট এবং ইহা এত

বিভিন্ন অর্থে গৃহীত হয় যে ইহাকে একটু স্পষ্ট করিবার চেষ্টা বোধ হয় নিরর্থক নহে। তাহা ছাড়া, অনেক সময়েই আমরা রূপকের সহিত ইহার সারূপ্য দেখিয়া ইহাদের অভিন্ন মনে করি; সেদিক দিয়াও এই শব্দটির প্রয়োগ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

প্রথম কথা, ইহা অভিব্যঞ্জন,—প্রতিমূর্তন অথবা প্রতিবিম্বন নহে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জগতের রূপময় ভাষায় অরূপ অতীন্দ্রিয় জগতের প্রত্যগ্র প্রকাশ; সুপ্রযুক্ত সার্থক প্রতীকের মাধ্যমে ভাব যেরূপ মনোজ্ঞরূপে অভিব্যক্ত হয় অন্য কোন উপায়েই সেরূপ সম্ভব নহে। প্রতীকের প্রতীয়মান অর্থটি বুঝিবার জন্য প্রয়োজন হয় সহজ সংস্কারের, কিন্তু রূপকের নিভৃত অর্থটি ধরিবার জন্য প্রয়োজন হয় বস্তু-বিষয়ের জ্ঞানের। রূপকের মধ্য দিয়া যে চিন্ময় ভাব-বস্তুটি স্তরে স্তরে আপনাকে উন্মোচিত ও উৎসারিত করিয়া তুলে তাহার সর্বাংগীণ ধারণা কেবল জ্ঞান নহে, সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও অনুভব-শক্তিরও অপেক্ষা রাখে।

তাহার পর, এই প্রতীকতা উপমা-উৎপ্রেক্ষাদির মত অলংকারমাত্র নহে—কাব্য-রূপসীর শ্রী-সাধনের প্রসাধনও ইহা নহে। অবশ্য একথা বলা আমার অভিপ্রেত নহে যে কাব্য-শরীরকে শ্রীমণ্ডিত করিবার জন্য কলা-বিলাসের কোনই প্রয়োজন নাই। গীত-রূপের প্রসংগে মহামুনি ভরত যে 'বর্ণালংকার-সমৃদ্ধি'র কথা বলিয়া গিয়াছেন কাব্য-রূপের পক্ষেও তাহা তুল্যরূপেই প্রয়োজ্য। আমি শুধু বলিতে চাহি যে 'শৃংগার'-বস্তুটি বাহিরের—বিমূর্ত ভাবের প্রতীক-রূপটি কল্পনায় প্রথম প্রতিভাসিত ও প্রমূর্ত হয়; অলংকার, সেই কল্প-প্রতিমাকে অন্তর্লোক হইতে বাহিরে আনিবার কালে সচেতন-মনের সযত্ন মণ্ডন ও বর্ণানুরঞ্জন। তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে সাদৃশ্যমূলক অলংকার-গুলির কোন কোনটির উদ্‌ভাবনার মূলেও উপমান-উপমেয়ের অভেদ-কল্পনা নিহিত আছে। রূপক-অলংকারে উপমান-উপমেয়ের ভেদ-প্রতীতি থাকে না—রূপকং স্যাৎ অভেদো য উপমানোপমেয়য়োঃ (কা. প্র.)। পরিণাম-অলংকারেও

পাই বিষয়-বিষয়ীর এই একাত্ম পরিণতি। মোট কথা, অলংকার যেখানে দৃষ্ট ও অদৃষ্টের, রূপ ও ভাবের, অন্তর ও বাহিরের পরিণয় হইতে প্রসূত সেখানে তাহা আর অলংকার থাকে না, প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়, এবং এই প্রতীকতা যে অলংকারে যত অধিক, ভাব-ব্যঞ্জনার শক্তিও তাহার ততই বেশী। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন-দেবতার পরিচয়-প্রসংগে যখন বলিয়াছেন,

'এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে ; স্বর্গ হ'তে মর্ত্যভূমি
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনক-বর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল ; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার তলতল ছলছলে
ললিত যৌবন খানি।"

তখন কি তিনি তাঁহার অন্তরস্থ সৌন্দর্য-সত্তাকে বিশ্ব-সৌন্দর্যের সহিত একীভূত করিয়া দেখেন নাই, সেই অব্যক্ত সৌন্দর্য-রূপকে ব্যক্ত রূপের আলোকে উদ্‌ভাসিত করেন নাই? রবীন্দ্র-কাব্যে প্রযুক্ত অধিকাংশ অলংকারেই এই প্রতীক-শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া উহা এমন বিশ্বজনীন আবেদন ও অনুপম মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে।

প্রতীকের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা বৃহৎকে অণুর মধ্য দিয়া প্রকাশ করে। বস্তু-সর্বস্ব, বর্ণনামূলক কাব্যের মত প্রত্যেকটি ঘটনা খুঁটাইয়া বলিবার জন্য তাহার মাথা-ব্যথা নাই। আয়তন আয়ত হইলেই যে ব্যঞ্জনা বিপুল হইবে, অথবা কণ্ঠ উৎকণ্ঠ হইলেই যে আবেগের বেগ বৃদ্ধি পাইবে তাহা মনে হয় না ; বরং অনেক সময় ইহার বিপরীতটাই সত্য ; নিবিড় নীরবতাও যে সরব রসনার চেয়ে বহুগুণে মুখর হইতে পারে, 'শকুন্তলা'-নাটকের ব্যাখ্যা প্রসংগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাহা আমাদের উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। অলক্ষ্য অণুকণার মধ্যেও যে কি প্রচণ্ড শক্তি সংগুপ্ত আছে এবং প্রয়োজনীয়

উপাদানগুলির উপযোজনার দ্বারা যে কি বিস্ময়কর আকারে উহা প্রকটিত হইতে পারে 'হিরোসিমা'র মর্মান্তিক দৃষ্টান্তের দ্বারা মার্কিন রণনায়কগণ তাহা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করিয়াছেন। জগতের মহৎ কবিগণের এক একটি বাণী-বিদ্যুতের স্তোক প্রকাশও বিশ্ব-মানবের চিত্তাকাশে ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া তাহাদের মানসলোককে চিরকালের জন্য দীপ্তিমান্ করিয়া রাখিয়াছে। Yeats-এর ভাষায় বলিতে গেলে, "It is indeed only those things which seem useless or very feeble that have any power"—অর্থাৎ যে সমস্ত বস্তু আপাতদৃষ্টিতে শক্তিহীন ও অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়, প্রকৃত শক্তির আধার উহারাই।* অস্ফুট বীজের মধ্যেই ভাবী মহীরুহের সম্ভাবনা নিহিত থাকে; বীণার তারে মীড়ের একটি টানে প্রাণে যে অপরূপ ঝংকার উঠে, জীবনান্ত পর্যন্ত তাহার রেশ আমাদের চিত্ত-বীণায় অণুরণিত হইতে থাকে।

আমরা সকলেই কোন-না-কোন সময়ে অনুভব করিয়াছি যে কতকগুলি পদার্থ, ভাবানুষংগের ফলেই হউক বা দীর্ঘকালীন সংস্কারের ফলেই হউক, আমাদের মনের বিশেষ কতকগুলি অনুভূতি ও সংবেদনার সহিত অনুস্যূত হইয়া আছে: বস্তুটি দেখিলেই সেই বিশেষ ভাবটি জাগ্রত হয়, অথবা ভাবটির উদয় হইলেই প্রতীক-রূপটিও স্মৃতি-সীমায় আসিয়া দাঁড়ায়। সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত একটি পদ্ম দেখিলে আমাদের মনে কি একটি পবিত্রতার ভাব উদিত হয় না, অপরাজিতার ম্লান নীল-রূপটি দেখিলে কি রূপহীনার কুণ্ঠিত সৌন্দর্যের কথা মনে পড়ে না? অপিচ, রক্তজবার রূঢ় রক্তিমা রুদ্র-দেবতার সংহার-রূপের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়, চম্পার উগ্র সৌরভে লালসার উদগ্র গন্ধটিই ভাসিয়া আসে! Yeats তাঁহার 'Symbolism in Painting' প্রবন্ধে

---

* রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন,—

'তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা ক্ষুদ্র তাহা নয়
সত্য যেথা কিছু আছে বিশ্ব সেথা রয়।' খেয়ার উৎসর্গ-কবিতা

একজন সাংকেতিক চিত্রশিল্পীর কথা বলিয়াছেন যিনি শারীর গতি ও সংগতি ব্যতীত অন্য কোন প্রতীক-রূপই স্বীকার করিতেন না। অন্তর্নিবিষ্ট মনের ব্যঞ্জনার জন্য তিনি আঁকিতেন কেশগুচ্ছে আচ্ছাদিত কান। প্রেম, পবিত্রতা কিংবা সুষুপ্তি বুঝাইবার জন্য তিনি কখনও গোলাপ, লিলি অথবা আফিম ফুলের উপযোজনা করিতেন না, যেহেতু তাঁহার মতে ঐগুলি আসলে রূপক, প্রতীক নহে—অর্থাৎ ইহাদের গূঢ়ার্থ ইতিহ-সূত্রে আগত, স্বতই উৎপন্ন নহে।

সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে বস্তুবিষয়ের মূল্যমান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নিরন্তর পরিবর্তিত হইতেছে, কাজেই বহু ব্যবহারের ফলে যে সকল প্রতীক-রূপ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহারা আর আমাদের মনে পূর্বের সেই মূল্য বহন করে না। তাই কবিকে নব নব রূপধেয়ের উদ্‌ভাবন করিতে হয়। অবশ্য প্রকাশের এই অবস্থায় মন সংজ্ঞান-লোকে সচেতন রূপধারণার মধ্যে ফিরিয়া আসে। যাহা হউক, অভিনবত্বের জন্য কোন কোন সময় রূপক-গুলি কিছু অস্পষ্ট ও দুর্গ্রহ বলিয়া বোধ হয় বটে, তবুও একথা স্বীকার করিতেই হয় যে ইহারা আমাদের মনকে রূপ হইতে অপরূপের রাজ্যে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সংজ্ঞান-পূর্ব (pre-conscious) স্তরে যে 'ভাব-বিগ্রহ'গুলি সংগুপ্ত থাকে, উদ্বুদ্ধ-সংস্কারে সেগুলি চৈতন্য-লোকে উদ্‌ভাসিত ও আকারিত হয়। ভাববিগ্রহ বলিতেছি এই কারণে যে বহিঃপ্রকাশের পূর্বে অন্তঃপ্রকাশ বলিয়াও একটি অবস্থা আছে; কল্পনার অর্থ কেবল অমূর্তের অনুধ্যান নহে, ভাবকে মূর্তরূপে অনুভব করা।

য়ুরোপীয় চিত্র-শিল্পের বিবর্তন-ধারাটি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় কেমন করিয়া যুগ-প্রগতির সহিত তাল রাখিয়া ইহার প্রকাশ-শৈলী পরিবর্তিত হইতে হইতে ক্রমশ সাংকেতিকতার দিকেই আগাইয়া চলিয়াছে। শিল্পে একটা যুগ ছিল যখন প্রকৃতির অবিকৃত প্রতিকৃতিই শিল্প-লিপির পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হইত; কোনরূপ আবরণ অথবা আভরণ শিল্পকৃতিকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিত। কিন্তু অচিরেই কলা-রাজ্যে এই বাস্তবতার বিরুদ্ধে একটি তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা

দিল। প্রাগ্-র‍্যাফেল্ রূপ-শিল্পিগণ আবার বর্ণচ্ছটাময় আলেখ্য আঁকিতে লাগিলেন; কারণ তাঁহাদের মতে একান্ত বস্তুনিষ্ঠ শিল্প-চেষ্টা আমাদের চিত্তে 'চমৎকার' সৃষ্টি করিতে পারে না—ইহার জন্য প্রয়োজন হয় লোকসীমাতিবর্তী কল্প-পদার্থের। মিলেয়িস্ (Sir John Evereth Millais)-অংকিত 'ওফিলিয়া' চিত্রখানির বর্ণাঢ্যতা দেখিলেই ইহার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। ইহার সংগে সংগেই আসে 'Impressionist' আন্দোলন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলো-ছায়ার বিন্যাসই এই সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহারাও নিসর্গ-বাদকে নিন্দা করিয়াছেন; ইহাদের মতে শিল্প প্রকৃতির অনুকৃতি নহে—প্রকৃতির উপর মানস-সঞ্জাত রূপকের আরোপ। ইহার পর পর্যায়ক্রমে Cubism, Purism, Dadaism, Futurism, Vorticism প্রভৃতি 'ism'-এর ঝড় তীব্রবেগে চিত্র-রাজ্যের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত রীতির বিচার ও বিশ্লেষণ আমার বিবক্ষিত বিষয়ের বহির্ভূত। এই প্রসংগে আমি কেবল এই কথাটিই জানাইতে চাই যে চিত্রাংকন-রীতি একটু একটু করিয়া ক্রমশ সাংকেতিকতার দিকেই পা বাড়াইয়াছে। Cubism-এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া রোজার ফ্রাই বলিয়াছেন, ইহা প্রকাশরূপের বিমূর্ত ভাষা—ইহা দৃশ্যমান সংগীত;* অর্থাৎ সংগীতের মত লোক হইতে লোকাতিশায়ী ভাবের দিকেই ইহার উন্মুখ উর্ধ্ব গতি। Futurist-দের বক্তব্যও প্রায় ইহাই; তাঁহারা বলেন,—'A work of art is a subjective expression in an absolute personal language.'

চিত্র-জগতের ন্যায় নাট্য-জগতেও অধুনা য়ুরোপে একধরনের রূপক-রীতির প্রচলন হইয়াছে; ইহার নাম 'expressionism'। ইহার আংগিকের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে আখ্যান-অংশকে সংকেত-অংশের একান্ত অধীন করা হয়; ফলে প্রতিপাদ্য ভাবটি বিমূর্ত (abstract) হইয়া পড়ায় ব্যঞ্জনার পরিধিও সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। সাংকেতিকতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়া নাট্যকারগণ কুশীলবগণের ব্যক্তি-নাম না দিয়া জাতি-নাম দিয়া থাকেন। এই 'symbolism' অতিশয়

* An abstract language of form—a visual music.

স্পষ্ট ও চেষ্টা-প্রসূত বলিয়া ইহার আবেদন খুব গভীর ও ব্যাপক হয় না এবং নাটকগুলি শেষ পর্যন্ত 'mystery' ও 'morality' নাটকেরই সগোত্র হইয়া দাঁড়ায়।

শিল্পের ন্যায় কাব্যকলার ক্ষেত্রেও এই 'বাদ' লইয়া বিবাদ য়ুরোপে নিতান্ত অল্প নহে। প্রশ্ন হইতে পারে ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনা-প্রসংগে বারবার য়ুরোপের কথা উঠে কেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে—আংগিকের এই বৈশিষ্ট্য, এই সাংকেতিক দৃষ্টি-ভংগি রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে-আগত রিকৃথ-রূপে নহে, তাঁহার এই প্রকাশ-ভংগি বিশেষ করিয়া তাঁহার য়ুরোপীয় শিল্পানুশীলনের ফল। রিল্‌কে (জার্মান), মেটারলিংক্‌ প্রভৃতি কবিদিগের মধ্যে এই সাংকেতিকতা যেরূপ মনোজ্ঞ ও বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার অনুরূপ কিছু ভারতীয় সাহিত্যে কদাচিৎ পাওয়া যায়। অথচ ইংগিতের দ্বারা বিষয়াতীত বস্তুর দ্যোতনা ভারতীয় সাহিত্যে নূতন নহে। অলংকার-শাস্ত্রে একদিকে ব্যঞ্জনা, তাৎপর্য এবং অন্যদিকে ধ্বনি, স্ফোট প্রভৃতি স্বীকৃত হইয়াছে, এবং ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্য-শিল্প যে সংকেতময় সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক অস্পষ্টতা-সৃষ্টির চেষ্টা সেখানে কোথাও নাই। অথচ মেটারলিংক্‌ প্রভৃতির সৃষ্ট রূপক-নাটকগুলি যেন কতকটা প্রহেলিকার মত—অস্পষ্টতা ও প্রচ্ছন্নতাই ইহাদের সৌন্দর্য। শেলী মনে করিতেন অনন্তের যে অনুভূতি তিনি লাভ করিয়াছেন তাহা অনির্বচনীয়—তাহাকে স্পষ্ট করিতে গেলেই তাহা আরও অস্পষ্ট হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ 'বড়-আমি'কে ধরিতে না পারিয়া মন 'ছোট-আমি'র ফাঁদে বাঁধা পড়িবে। মহাজন-পদাবলীতে দেখি ইহার আগাগোড়াই রূপক, অথচ ভাব-কল্পনা ও প্রকাশ-শৈলীর মধ্যে স্বচ্ছতার অভাব বিন্দুমাত্রও কোথাও নাই। অপ্রাকৃতকে প্রাকৃতের, অলৌকিককে লৌকিকের মাধ্যমে যে এমন রমণীয়রূপে প্রকাশ করা যায় তাহা স্বয়ং আস্বাদ না করিলে অপরের পক্ষে বুঝান কঠিন। কিন্তু স্ফুটতা রবীন্দ্র-কাব্যের বৈশিষ্ট্য নহে। এ বিষয়ে তিনি য়ুরোপীয়

রোম্যাণ্টিক্ ও সাংকেতিক কবি-নিবহের কাব্যধারার উত্তর-সাধক। তাঁহার 'রাজা', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী' প্রভৃতি রূপকনাটকগুলি মেটারলিংক্-এর সংকেতবাদের আদর্শেই রচিত। 'ব্লু বার্ড্', 'দি সাইট্‌লেস্' প্রভৃতির মতই ইহাদের প্রকাশভংগি অস্পষ্ট এবং ইহাদের রসোপলব্ধিও বুদ্ধিসাপেক্ষ; তবুও একথা বোধ হয় বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি আবেগধর্ম হইতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত নহে, কারণ তাঁহার প্রতিভা মূলত আবেগধর্মী।

রূপক ও প্রতীকের পার্থক্য সম্বন্ধে ইংগিতমাত্র করিয়া কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এখন ইহাদের আর একটু বিস্পষ্ট করার চেষ্টা করা যাক। সাধারণভাবে যদিও প্রতীক আবেগেরই দ্যোতক, তবুও প্রতীকের দ্বারা ভাবের (idea) উদ্বোধনও অসম্ভব নহে। বস্তুত, কতকগুলি প্রতীক বিশেষ সংস্থিতি অথবা অনুষংগে আবেগের পরিবর্তে ভাবেরই উদ্দীপন করে। ভাবপ্রধান এই প্রতীকগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে হইলে বহির্বিষয়ের জ্ঞান, পুরাণেতিহাসের সহিত পরিচয় এবং বিগাহী বুদ্ধির উপযোগ আবশ্যক। কবি নজরুলের 'দারিদ্র্য' কবিতার তৃতীয় পংক্তির 'কণ্টক-মুকুট-শোভা' বাক্যাংশটি একটি ভাবপ্রতীক, কারণ শুনিবার সংগে সংগেই ইহার নিলীন ভাবরূপটি নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক মানুষের অন্তরে পরিস্পন্দ আনিতে পারে না। ইহার সৌন্দর্য বিশুদ্ধ আবেগের সৌন্দর্য নহে, কাজেই অনুভূতি-বেদ্যও নহে,—ইহার ধারণা বিচারণার অপেক্ষা রাখে। যীশুর জীবনের সেই রক্তাক্ত কাহিনীটি যাহার অজ্ঞাত এবং প্রস্তুত প্রসংগে ইহার 'যোগ্যতা' কোথায় তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি যাহার অনায়ত্ত, তাহার পক্ষে ইহার সম্পূর্ণ তাৎপর্যটি হৃদয়ংগম করা সম্ভব নহে। কিন্তু যখন শুনি—

"অন্তর-মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তর-ব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম শূন্য গগনে"—

তখন স্বপ্ন, পদ্ম, চন্দ্র প্রভৃতি প্রতীকগুলি প্রয়োগ-সিদ্ধ এবং, ভাবদ্যোতক না হইয়া, আবেগ-ব্যঞ্জক বলিয়া ইহাদের আবেদনটি সহজেই কানের ভিতর দিয়া আমাদের মর্মকুহরে প্রবেশ করে।

অপিচ, রূপক বিচ্ছিন্ন একটি ভাব-প্রতীকমাত্র নহে—প্রতীকের পরম্পরা বা মালা। শিবজটার মধ্যে গংগোত্রীর প্রচ্ছন্ন প্রবাহটি যেমন আবর্তিত, ভাবের প্রলম্বিত প্রবাহটিও সেইরূপ রূপকের ছদ্মরূপের অন্তরালে সঞ্চালিত। ইহার নিগূঢ় তাৎপর্যটি উদ্ধার করিবার জন্য ইহার রহস্যময় অতলতায় ডুব দিতে হয়, কিন্তু তবুও সর্বসম্মত কোন অর্থ আবিষ্কার করা সম্ভব হয় না; কারণ প্রত্যেক মানুষের মানস-প্রকৃতি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট, কাজেই বিভিন্ন মন ইহাকে বিভিন্ন-ভাবে গ্রহণ করে। সুতরাং রূপকের অর্থসম্বন্ধে ঐকমত্য প্রত্যাশা করা কেবল অসংগত নহে, অনর্থকও বটে।

বলা বাহুল্য, প্রতীক-রূপকের মিলন-রেখাটি বেশ সুচিহ্নিত নহে। নিপুণ চিত্রকর যেমন পটের উপর ছায়া-আলোর মায়া-মিলন বর্ণিত করেন, কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম সীমা-রেখাটি ঠিক ধরিতে পারা যায় না, কবি-কল্পনাতেও তেমনি প্রতীকগুলি একটির পর একটি উদ্‌ভাসিত হইয়া একটি বিতত কান্তি লাভ করে। সহজ ভাষায় কথা না বলিয়া কবি রূপকে কথা বলেন কেন তাহার হেতু নির্দেশ করা সহজ নহে। এই পর্যন্ত বলা যায় যে যুক্তির গ্রন্থিবদ্ধ স্বাদহীন দৈনন্দিন ভাষায় কাজের কথা, বড় জোর মনের কথা, বলা চলে; হৃদয়ের নিভৃত ভাব-লোকের কথা বলিতে হইলে এই যুক্তির গ্রন্থি হইতে মুক্ত হইতে হয়। এক কথায়, ভাবের ভাষাই হইল আভাস অর্থাৎ রূপক; এই বাক্‌সরণি ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই তাহার মুক্তি অর্থাৎ পরিব্যাপ্তি সম্ভব নহে। প্রত্যেকটি ভাব প্রথমে সংজ্ঞান-পূর্ব চেতনায় বীজাকারে অংকুরিত হয় এবং কবির সচেতন চেষ্টায় ছন্দিত ও স্পন্দিত হইয়া বাণীমূর্তি লাভ করে।

বাস্তবিক, সময় সময় আমার সন্দেহ হয় আমাদের চিরপরিচিত 'রূপকথা' শব্দটি 'রূপকতা' শব্দ হইতে আসিয়াছে কিনা। রূপকথার চারিদিকে শুধু যে স্বপ্ন-

সৌন্দর্যের একটি পরিমণ্ডল আছে তাহাই নহে, গল্প-ধারার অভ্যন্তরে, বালু স্তরের তলে অলক্ষ্য ফল্গু-ধারার মত, বিষয়াতিশায়ী, অনতিস্পষ্ট একটি গূঢ়ার্থের ধারা উহার আদ্যন্ত বহিয়া গিয়াছে। একদিকে সে কেবল গল্প বলে,—কত উদ্ভট কাহিনী ও কল্পনা, কত অবাস্তব চিত্র ও ঘটনা ছায়া-ছবির মত মনের পটে ভাসিয়া বেড়ায়—কোন্ ভুলিয়া-যাওয়া অতীতের পানে মনটা ডানা মেলিয়া উড়িয়া চলে। বিশেষ করিয়া শিশু-মনে অপরিসীম ইহার প্রভাব; তাহার কারণ—সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তব সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট প্রত্যয় তাহাদের মনে দৃঢ় রেখায় মুদ্রিত হয় নাই, তাই যাহা অলীক ও মায়া তাহাও বিশ্বাস করিতে তাহাদের কিছুমাত্র বাধে না। প্রাথমিক পর্যায়গুলি পার হইয়া জীবনের মধ্য-দেশে যাহারা প্রবেশ করিয়াছে, অভিজ্ঞতার বিচিত্র সঞ্চয়ে চিত্ত যাহাদের ভারাক্রান্ত, সম্ভব-অসম্ভবের অবধি-রেখা যাহাদের মনে সুচিহ্নিত, তাহারাও ইহা হইতে আনন্দ পায় সম্পূর্ণ অন্য এক কারণে; তাহারা ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পায় বর্তমানের সমস্যাসংকুল জটিলতা হইতে অতীতদিনের সহজ আনন্দের মধ্যে সাময়িক মুক্তি। কিন্তু রূপকথা কেবল গল্প বলে না, অনেক সময়েই গল্পের আড়ালে একটি গূঢ়তর তাৎপর্য প্রচ্ছন্ন থাকে; এমন কি ইহাও বলা যাইতে পারে যে গল্পটা উপলক্ষ্যমাত্র, লক্ষ্যকে দুর্লক্ষ্য করিবার একটা সযত্ন আয়োজন। যে কথাগুলি দেশে দেশে শিশু-মহলে বিশেষ পরিচিত—ঈসপ্ অথবা গ্রিম্-এর গল্পই হউক, অথবা পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথা-সরিৎ-সাগরের কথাই হউক—তাহাদের প্রত্যেকটি রূপক; বাচ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া লক্ষণার দ্বারা তাহারা গূঢ়তর উদ্দেশ্যের ইংগিত করে। কিন্তু এই সকল গল্প ঠিক রূপকথা-জাতীয় নহে, কারণ ইহাদের মধ্যে খেয়ালী-কল্পনার লীলাচমক তেমন নাই, বর্ণনা-শৈলীতে বর্ণানুরঞ্জনও সেরূপ গাঢ় নহে। সাধারণ নীতিকথার সহিত ইহাদের পার্থক্য এই যে তটস্থ অর্থটি কূটার্থকে এমনভাবে ঢাকিয়া রাখে যে উপভোগের আবেশ-ময় মুহূর্তে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই আমাদের মনে জাগে না। এই ভাব-প্রতীক বা রূপকগুলি, আবেগ-প্রতীকের মত, একেবারে আকার লইয়াই ফুটিয়া উঠে

না, ভাবকে বুদ্ধির রাজ্যে আনিয়া সচেতন চেষ্টায় দ্বারা তাহাদের রূপায়িত করিতে হয়। রূপকথার উপর খেয়ালী-কল্পনার প্রলেপ অধিক থাকে বলিয়া অনেক সময় রূপক বলিয়া তাহাকে চেনাই যায় না। স্বপ্নপুরীর রাজকন্যা, সোনার-কাঠি রূপার-কাঠি, অসীম অতলে সোনার কৌটায় ভোমরা-ভুমরী প্রভৃতি কত অনাসৃষ্টির সৃষ্টি ইহাতে করিতে হয়! এই রহস্যময় পরিবেশের সহিত প্রাকৃত জগতের কোন মিল আছে কি? দৈনন্দিন জীবনের বর্ণগন্ধহীন ভাষার সহিত এই কুহকময় কবি-ভাষারই বা মিল কোথায়? তবুও ইহারাই তো সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া লৌকিক মনে অলৌকিকের ক্ষুধা মিটাইয়াছে!

বস্তুত, কল্পনা যেখানে চেতনার সহিত মিশিয়াছে যুক্তবেণীর সেই সংগম-সীমায় দাঁড়াইয়া ভাবকে ভাব-রূপে অর্থাৎ রূপকে পরিণত করেন কবি। হয়তো ভাবটিকে যেরূপে আকারিত করিয়া, যে ভূষায় মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা হইতে ভিন্ন-রূপে প্রকাশ করা যাইত, কিন্তু সার্থকরূপে কখনই নহে। রবীন্দ্রনাথের রূপক-কবিতাগুলি সম্বন্ধেও একথা খাটে; দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সোনার তরী', 'দুই পাখী', 'পরশ-পাথর', 'শেষ খেয়া' প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমার মনে হয় না যে আস্বাদের গাঢ়তা ও অপূর্বতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহাদের ভাষান্তরিত করা যায়, অথচ প্রতীক-রূপগুলি যে ভাবদীপ্ত, আবেগ-স্নিগ্ধ নহে, আশা করি সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। যাঁহারা মনে করেন নীরস নীতি-কথাকে সরস করিয়া বলিবার জন্যই রূপকের উদ্ভাবনা তাঁহাদের সহিত আমি একমত নহি। তবে নীতিকে যদি ভাব-অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে এই দাবী কতকটা মানিয়া লওয়া যায়। রূপক ও নীতি-মূলক রচনার পার্থক্য সুস্পষ্ট;—সাংকেতিকতা ও রূপকের পার্থক্য এই নীতি-অনীতির প্রশ্ন লইয়া একথা স্বীকার করাও শক্ত।

"বস্তুবাদী সমালোচকগণ মনে করেন কোন বস্তু এবং সেই সম্বন্ধে কবির সংবেদনার মধ্যে কোন অবিচ্ছিন্ন যোগ নাই; কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। দার্শনিক 'হোয়াইট্‌হেড্‌' বলেন, বহির্বস্তু ও সেই সম্বন্ধে আমাদের নিজস্ব সংবেদনার

মধ্যে কোন দ্বৈত নাই, ইহারা পরস্পর-সম্বদ্ধ এবং ইহাদের বিকাশও হইয়া থাকে একত্রই। কার্য-কারণ সম্বন্ধে প্রচলিত নিয়ম বা যুক্তিক্রম এখানে খাটে না। মন ও পদার্থ, আত্মা ও দেহ সম্বন্ধে দ্বৈততার যে সংস্কার আমাদের মনে আছে, রোমাণ্টিক্ কবিদিগের দৃষ্টিতে তাহা সত্য নহে; এই হিসাবে প্রকৃতির জীবন-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা নূতন বাণীর অগ্রদূত।

"প্রতীক-কবি আরও একটু অগ্রসর হইয়া কাব্যকে বস্তু-জগতের শাসন-পাশ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিবার পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে আবেগ ও অনুভূতিই হইল কাব্যকলার প্রাণবস্তু এবং ইহারা এতই ব্যক্তিগত যে অন্যের নিকট ইহাদের স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা একরূপ অসম্ভব। সাধারণভাবে সংকেত বলিতে আমরা যাহা বুঝি ইহা ঠিক সেই জাতীয় নহে; অর্থাৎ ক্রুশ্ যেরূপ খৃষ্ট ধর্মের প্রতীক অথবা তারকা-ও-রক্তরেখা-লাঞ্ছিত পতাকা যেরূপ যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রতীক ইহা সেই শ্রেণির নহে। 'দান্তে'র 'ডিভাইন্ কমেডি'র প্রতীকগুলির মত ইহারা সাধারণ ও গতানুগতিকও নহে; অধিকাংশ স্থলেই প্রতীকগুলি কবি-শিল্পীর অদ্ভুত খেয়াল হইতে উদ্ভূত এবং এতই অনন্য-তন্ত্র যে এক হিসাবে ইহাদের ভাব বা আবেগের ছদ্মরূপও বলা যাইতে পারে।

"আমাদের চেতনার প্রত্যেকটি মুহূর্ত অপরটি হইতে পৃথক্ এবং প্রত্যেকের একটি স্বতন্ত্র সুর আছে। প্রত্যেক কবির ব্যক্তিত্বও একরূপ নহে, সুতরাং কোন সর্বজনবোধ্য ভাষায় তাহা যথাযথরূপে অভিব্যক্ত হইতে পারে না। তাই কবিকে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও অনুভূতিকে প্রকাশ করিবার জন্য তদুপযোগী ভাষা সৃষ্টি করিতে হয়, এবং এই ভাষা সংকেতময় না হইয়া পারে না। যাহা এরূপ বিশিষ্ট, ক্ষণিক ও অস্পষ্ট তাহাকে সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য; কাজেই শব্দ এবং চিত্র-পরম্পরা দ্বারা তাহার ইংগিত করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।"*

যে ভাষায় আমরা কথা বলি তাহাও তো ভাবের অভিজ্ঞান ব্যতীত

*Edmund Wilson প্রণীত 'Axel's Castle' পুস্তকের অংশবিশেষের মর্মানুবাদ।

কিছুই নহে। মানব-সভ্যতার কোন্ অজ্ঞাত অধ্যায়ে প্রকৃতি ও ভাব-জগতের বিভিন্ন বস্তুর নামরূপগুলি কল্পিত হইয়াছিল আজ তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। কিন্তু তবুও মনে হয় ইহাদের উদ্‌ভাবয়িতা যাঁহারা তাঁহারা কবিই ছিলেন; কখন বাহিরের রূপ দেখিয়া, কখন বা নিভৃত ভাবটি অনুভব করিয়া তাঁহারা বিশিষ্ট ব্যষ্টি-ও-জাতি-সংজ্ঞাগুলির কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। বহু শতাব্দীর ব্যবধানে আজ আর আমরা তাহাদের রূপক-রূপটি ধরিতে পারি না—দীর্ঘদিনের লৌকিক সংশ্রয়ে তাহাদের অলৌকিক সুষমাটি উবিয়া গিয়াছে; তাই সেই সংকেতময় ভাষার 'অরোরা'-আলোকে আর কল্পনার স্বপ্নলোক আভাসিত হয় না। কিন্তু এই ব্যবহার-দুর্বল ভাষাই যখন নূতন কবিকর্তৃক নূতন আসত্তি ও অর্থে প্রযুক্ত হয় তখন তাহার মধ্যে এক আশ্চর্য ও অভিনব শক্তির সঞ্চার লক্ষ্য করা যায়। যখন বলি, 'তোমাকেই আমি যুগ যুগ ধরিয়া অনিবার ভালবাসিয়া আসিয়াছি', তখন এই পরিচিত ও পরিমিত বাগ্-রীতির মধ্য দিয়া যাহা পাই তাহার অর্থটি দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট বটে, কিন্তু তাহা সংবাদমাত্র। কিন্তু যখন শুনি,—

'তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার,
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার!'

তখন উক্তিটির ভিতরের অনুক্ত ইংগিতটাই বড় হইয়া দাঁড়ায় এবং মনটা যেন কোন্ বিস্মৃত স্বপ্ন-নীড়ের উদ্দেশে পাখা মেলিয়া দেয়। বস্তুত, আভাসই কাব্যের ভাষা—যত মন তত ইহার অর্থ; সে যাহা বলে তাহার তুলনায় বলে না অনেক বেশি এবং এই না-বলা বাণীর ধ্বনিটুকুই আমাদের মর্ম-কুহরে অনুরণিত হইতে থাকে। ফুল হইতে গন্ধের মত, খাদ্য হইতে খাদ্যপ্রাণের মত, এই ধ্বনিকে বাক্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখান যায় না। কিন্তু এই ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতে গেলে ভাষার আসত্তি অর্থাৎ পদবিন্যাস-পদ্ধতির পরিবর্তন করিতে হয়, আর বাণী-বীণার মূল তন্ত্রের আশে-পাশে কতকগুলি শাখা-তন্ত্র

যোজনা করিতে হয়—যেন ছড়ের টান পড়িলেই ঝংকার উঠে এবং বীণা থামিয়া গেলেও তাহার রেশটি না মিলায়। ছন্দের স্পন্দ ভাষায় না লাগিলে তাহা কি মনকে ভাসাইতে পারে? কিন্তু মনে রাখিতে হইবে কেবল ব্যঞ্জনা নহে, রঞ্জনাও কাব্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এবং এই লক্ষ্য-সাধনের নিমিত্ত এমন ধ্বনি-সুন্দর প্রতীক-রূপ কল্পনা করিতে হয় যাহাতে আমাদের কান্তিবিষয়ক সংস্কার-গুলি সহজেই উদ্দীপিত হইতে পারে। এই রঞ্জকতা-উৎপাদনের জন্ম প্রথম প্রয়োজন সুপ্রযুক্ত শব্দের—এই শব্দ কেবল ভাবব্যঞ্জক সংকেতমাত্র নহে, ইহার রঞ্জক শক্তিও অসামান্য। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যক্ জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্ ভবতি।' সুপ্রযুক্ত শব্দের অর্থই বোধ হয় ছন্দোযুক্ত সার্থক শব্দ। ছন্দের দোলা লাগে বলিয়াই কথা শেষ হইয়াও শেষ হয় না; স্বপ্ন-জাগরণের সেই মিলন-মুহূর্তটি—কারু-কল্পনার সেই সান্দ্র লগ্নটি প্রলম্বিত ও প্রসারিত হইতে থাকে। Emerson-এর মতে 'হৃৎ-স্পন্দের সহিত ছন্দঃস্পন্দের একটি নিবিড় যোগ আছে। আবেগ-সমুথ হৃৎস্পন্দের মাত্রানুসারেই ছন্দোমাত্রা নিরূপিত হয়।'* ছন্দের মধ্যে সমস্বরতা ও বৈচিত্র্য দুইই আছে—একাস্বয়ের ফলে আমাদের সচেতন মনটি তন্দ্রালু হইয়া পড়িলে ছন্দের বন্ধুরতা আমাদের কল্পনাকে উদ্রিক্ত করে এবং নিগূঢ় মনোলোক হইতে নব নব সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে থাকে। অবশ্য ছন্দ বলিতে আমি ধ্বনিপরম্পরার সমন্বয়-সুষমা (rhythm) বুঝিতেছি, কৃত্রিম বৃত্ত-অথবা-জাতি-রীতি নহে। ছন্দ ব্যতীত প্রতীক-রূপে স্পন্দ ও শক্তি সঞ্চার করা যায় না, এমন কি কাব্যরূপের কল্পনাও অসম্ভব হইয়া পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা ও নাটকে এই রূপক-শিল্প চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এই জাতীয় নাটকগুলির আলোচনা সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে সম্ভব নহে। আমরা এখানে মাত্র দুইটি প্রসিদ্ধ রূপক-কবিতার আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কবির ভাষায়, কাব্যের কথা "বোঝ-

* Essay on Poetry and Imagination.

বার জন্তে হয় নি, বাজবার জন্তে হ'য়েছে।" ফাল্গুনীর রাজা তাই কবিশেখরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "তোমার কথা আমি এক বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারি নে, অথচ তোমার স্বরটা গিয়ে আমার বুকে বাজে।" কবিশেখর উত্তর করিলেন, "আমার গান আমাকে ছাড়িয়ে যায়, সে এগিয়ে চলে, আমি পিছনে চলি।" কবিশেখরের কথা কবির নিজেরই প্রাণের কথা; তাঁহার কাব্য আমরা বুঝি আর নাই বুঝি, তাহার স্বরটুকু আমাদের বুকের মাঝে বাজে। তবুও রহস্তময় কাব্যের মর্মার্থ-উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা নিরর্থক নহে; বর্তমান আলোচনার মধ্য দিয়া আমরা সেই চেষ্টাই করিব।

'পরশ-পাথর' রবীন্দ্রনাথের অন্ততম শ্রেষ্ঠ রূপক-কবিতা। ইহার অর্থ লইয়া সমালোচক-মহলে মতানৈক্যের অন্ত নাই। আমরা এখানে কবিতাটির কয়েকটি সম্ভাব্য অর্থের বিচার ও আলোচনা করিব।

অনেকে মনে করেন কবিতা-বর্ণিত 'পরশ-পাথর' আসলে পরমার্থ-ধন। সংসার-বিরক্ত ক্ষ্যাপা সন্ন্যাসী জীবনের বিঘ্নবন্ধুর পরিচিত পথ পরিত্যাগ করিয়া তাই একমনে সমুদ্রের উপল-উপকূলে নিভৃত নির্জনতার মধ্যে সেই পরমধনের অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছিল, কিন্তু সে পথে তো তাঁহাকে পাওয়া যায় না,—তিনি যে মানুষের চিরন্তন সুখদুঃখের আবর্তের মধ্যেই আপনার আসনখানি পাতিয়া রাখিয়াছেন। বৈরাগ্যসাধনার দ্বারা যাহারা মুক্তির কামনা করে, তাহাদের সে কামনা অপূর্ণই রহিয়া যায়—ধ্যান-ধন তাহাদের ব্যগ্র বাহুর আলিংগনে ধরা দেন না। এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে ভ্রান্ত পথই যদি সে লইয়া থাকে তবে অচিহ্নিতের স্পর্শচিহ্ন ক্ষণকালের জন্তও অলক্ষ্যে সে লাভ করিল কেমন করিয়া? সংসারে তিনি আছেন সত্য, সংসারের বাহিরেও কি নাই? বাঞ্ছিতকে সে পাইয়াছিল ঠিকই, কিন্তু পাইয়াও পাওয়ার আস্বাদ সে অনুভব করিতে পারে নাই।

কেহ কেহ আবার কবিতাটিকে বৈজ্ঞানিকের নিরলস বিজ্ঞান-সাধনার রূপকহিসাবে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী। ঐ ক্ষ্যাপার মতই বিজ্ঞানীরাও

সংসার ভুলিয়া, বিশ্ব ভুলিয়া প্রকৃতির রহস্যমন্ত্রের সন্ধানে তৎপর। উদাসীন সাধক সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া প্রকৃতির গুণ্ঠন-উন্মোচনে ব্যাপৃত। ইঁহাদের মতে ইহাই কবিতাটির একমাত্র তাৎপর্য। বড় বড় বৈজ্ঞানিকের বিস্ময়কর আবিষ্কারের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে আমরা ইহাই অবগত হইব যে তাঁহারাও অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই তাঁহাদের কাম্যফল লাভ করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি তত্ত্বের পিছনে ছুটিয়া বিজ্ঞানবিৎ 'র‍্যন্‌টুগেন্‌' যখন তাঁহার রশ্মি আবিষ্কার করিলেন তখন সেই আবিষ্কারের আকস্মিকতায় এবং সেই অভাবিত সৌভাগ্যের উদয়ে কবিতা-বর্ণিত উদাসীন সাধকের মতই তিনি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এই ব্যাখ্যাও কিন্তু বেশ বিচারসহ মনে হয় না। র‍্যন্‌টুগেন্‌ যাহা চাহিয়াছিলে তাহার পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক নূতন তথ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, অথচ কবিতার সন্ন্যাসী তাহার মৃগ্যকেই লাভ করিয়াছিল। 'গ্রামবাসী ছেলে' বলিয়া দিলে তবে সে বুঝিয়াছিল যে তাহার কটি-দেশের লৌহ-শৃংখল কনক-কিংকিণীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের আকস্মিক আবিষ্কারও অপরের নির্দেশের অপেক্ষা রাখে না। এই সব দিক হইতে বিচার করিয়া ভাষ্যটীকে সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন ।

এইবার অপর একটি ব্যাখ্যার উল্লেখ করিব। এই শ্রেণীর ভাষ্যকার-গণের মতে কবিতাটির মধ্যে আত্মভোলা কবির অরূপাভিসারের ইংগিত আছে। রূপ-সম্মোহিত কবি যেন সংসারের কোলাহল হইতে দূরে—বহুদূরে স্বপ্ন-সায়রের কূলে কূলে ধ্যানের পরশমণি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু কেবল চাহিলেই তো তাহা পাওয়া যায় না—কবির মানসাভিসার তো শ্যামের সংকেত-কুঞ্জে সহজে লইয়া যায় না! প্রেমময়ের মুরলীধ্বনি কি কান পাতিলেই শোনা যায়? হঠাৎ কোন্ ক্ষণলগ্নে অপ্রত্যাশিত পথে চিরসুন্দরের পরশ-চিহ্ন সোনার রেখায় লেখা হইয়া যায় তাহা কে বলিতে পারে? যতই মনোজ্ঞ হউক কবিতাটির ভাষার সহিত এই ভাষ্যের সংগতি রক্ষিত হয় না, কারণ উহাতে (প্রস্তুত কবিতায়)

পরশমণির স্পর্শলাভের প্রসংগ থাকিলেও সে সম্বন্ধে সাধকের সচেতনতার সংকেত নাই। এ অনুভূতি কি তবে অবচেতন মনের? যে অনুভূতির প্রতীতি আমার নিজেরই হয় নাই, অপরে তাহা দেখাইয়া দেয় কি প্রকারে? পাইয়া-হারানো সেই পরমধনের সন্ধান সেই একই পথে আবার আমাকে করিতে হয় কেন?

এইবারে আমার নিজের অনুমত ব্যাখ্যাটি উপস্থাপিত করিব। ক্ষ্যাপা সন্ন্যাসী যে পরশ-পাথরের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল তাহা যে পার্থিব বৈভব নহে তাহা বুঝা যায় কবিতাটির নিম্নলিখিত উক্তিগুলি হইতে:

"তার এত অভিমান, সোনারূপা তুচ্ছজ্ঞান,
রাজসম্পদের লাগি নহে সে কাতর,
দশা দেখে হাসি পায় আর কিছু নাহি চায়
একেবারে পেতে চায় পরশ-পাথর!"

'পরশ-পাথর' বলিতে তবে কবি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন? এ কোন্ পরম সম্পদ্ যাহা অতুল রাজ-সম্পদ্‌কেও তুচ্ছ জ্ঞান করে,—যাহাকে পাইবার জন্য এই উদ্‌ভ্রান্ত সাধক তাহার জীবনের সব সুখ-কামনা জলাঞ্জলি দিয়াছে? আমার মনে হয় কবি এখানে বিশেষ কোন প্রাপ্তির কথা বলিতে চাহেন নাই। প্রত্যেক মানুষের মনে পূর্ণতার যে একটি অচল আদর্শ আছে, জীবনের চলার পথে সহজ সুখ-সাধনার মধ্যে যাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অথচ না পাইলে জীবন অতৃপ্ত ও অপূর্ণ রহিয়া যায়, সেই পরমপ্রাপ্তির—'সেই সফল বাঞ্ছনার' কথাই এখানে সংকেতিত হইয়াছে। এই আদর্শের রূপটি অনেকের কাছেই বেশ স্পষ্ট নহে, অথচ সংবেদনশীল মনে দুর্নিবার ইহার আবেদন। তার-পর, সেই পরশমণি পাইবার জন্য যে পথ সে লইয়াছিল তাহা কি ভ্রান্ত পথ এবং সেই জন্যই কি তাহার ঈপ্সিতের দর্শন মিলিল না? আমার মনে হয় পথ-অপথের প্রসংগ লইয়াও কবি এখানে মাথা ঘামান নাই। অন্তরে অনন্ত আগ্রহ লইয়া—নয়নে দীপ্র দৃষ্টি লইয়া ধূলিপাংশুল জটাজটিল সন্ন্যাসী অনন্য-মনে সমুদ্রের বিজন সৈকতে তাহার কাম্যধনের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে।

সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে এই সিন্ধু মন্থন করিয়াই সৌন্দর্যলক্ষ্মী উর্বশী এবং কল্যাণ-লক্ষ্মী কমলা উদিত হইয়াছিলেন, এই সিন্ধুর অশ্রান্ত কলসংগীতেই নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে বিশ্বরহস্যের অন্তরতম ইংগিত! সুতরাং এই পথকে বিপথ কেমন করিয়া বলি? আর এই পথেই ত অতর্কিতে দুর্লভের ক্ষণদর্শন মিলিয়াছিল—যদিও সে তাহা অনুভব করিতে পারে নাই? যে বাঞ্ছিতের দর্শনের দুরাশায় তাহার এই দুশ্চর তপস্যা তাঁহার পরমস্পর্শ যখন প্রাণে লাগিল—সেই অভাবিত সৌভাগ্য যখন সত্যই দেখা দিল তখন সে তাহা বুঝিতেই পারিল না; অনন্যসাধকের জীবনব্রত বিফল হইয়া গেল কেন? কেন সে চিনিল না তাঁহার চরণচিহ্ন? ব্রতসাধনার এই বিরাট্ ব্যর্থতাই এই কবিতায় উপলক্ষিত। দীর্ঘ দিনের অতন্দ্র সাধনার পরেও যখন কামনার ধন ধরা দিল না, তখন অন্তরে আশার দীপভাতি নিভিয়া গেল; কিন্তু এতদিনের খোঁজার অভ্যাস তবুও গেল না। যে-প্রেরণা তাহাকে পথে বাহির করিয়াছিল তাহার প্রাণ-বেগ নিঃশেষ হইলেও অন্ধ গতিবেগে তাহা চলিতে লাগিল, কিন্তু সে চলায় রহিল না কোন আনন্দের ছন্দ—আশা গেলেও নেশা রহিয়াই গেল; তাই তখনও সে অভ্যাসমত নুড়ি কুড়াইত এবং ঠন্ করিয়া 'শিকলের পরে ঠেকাইত', চাহিয়াও দেখিত না তাহার স্পর্শে লোহার শিকল সোনা হইল কিনা। জীবনের স্বচ্ছন্দ আনন্দ যখন প্রাণহীন অভ্যাসে পরিণত হয়—পথের মায়া যখন লক্ষ্যকে ঢাকিয়া ফেলে, তখন লক্ষ্যই উপলক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়, চলার জন্যই হয় চলা। তাই চলার পথে সহসা যখন বাঞ্ছিতের শুভ আবির্ভাব ঘটে তাহাকে আমরা হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে পারি না। চেতনা যখন জাগে তখন পাইয়া-হারানোর বেদনায় ক্ষুব্ধ হাহাকারে সমস্ত অন্তর গুমরিয়া উঠে—আশাহীন মন ও জ্যোতির্হীন চক্ষু লইয়া শ্লথমন্থরচরণে নূতন করিয়া পরশমণির সন্ধান চলিতে থাকে।

'শেষ খেয়া' কবিতার অর্থ লইয়াও ভাষ্যকারগণের মধ্যে মতদ্বৈধ অল্প নহে। এই কবিতার অন্তরতম ইংগিতটি ধরিতে হইলে—ইহার মর্ম-

কথাটি উপলব্ধি করিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি জানা আবশ্যক। কবি-চিত্তের বিবর্তনের অভিব্যক্তিই তো কাব্য; সুতরাং কোন কাব্যকে স্বরূপত বুঝিতে হইলে তাহার উৎস-ভূমির সন্ধান অবশ্যই লইতে হয়। স্রষ্টা হইতে সৃষ্টির অবচ্ছিন্ন সত্তা কল্পনা করা সম্ভব নহে।

আলোচ্য কবিতার রচনাকাল ১৩১২ সালের আষাঢ়। ইহার অনতিকাল পূর্বে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। এই প্রিয়তম পুত্রের বিয়োগে বিষাদের ঘন ছায়া আসিয়া কবির স্বাভাবিক আনন্দকে ম্লান ও স্তিমিত করিয়াছে। কি এক অনির্দেশ্য ভবিষ্যের পিছনে তাঁহার বিষয়-বিরক্ত উদাস চিত্ত উন্মুখ হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। যে দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনায় অনতিপূর্বে তিনি মাতিয়া ফিরিতেছিলেন—যে বস্তুমুখী সাধনার আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া তিনি তরংগ-সংকুল জীবন-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন—দেশ-মাতৃকার যে কল্প-মূর্তির চরণপ্রান্তে তিনি তাঁহার অগ্নিময়ী বাণীর অর্ঘ নিবেদন করিয়া বাঙালীর সুপ্ত জাতীয়তাকে উদ্বোধিত করিয়া ফিরিতেছিলেন, সহসা বুঝি এই অরুন্তুদ বেদনার নির্মম আঘাতে সে উন্মাদনার অবসান হইল। 'খেয়া' এই কর্ম-জীবন হইতে ধ্যান-জীবনে প্রয়াণের খেয়া, স্বভাব হইতে ত্যাগের পথে, প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তির পথে কবির অন্তর-পুরুষের অভিসার। 'শুভক্ষণ', 'ত্যাগ', 'আগমন', 'দান' প্রভৃতি কবিতায় এই ত্যাগ-সর্বস্ব সাধনার বৈরাগ্য-গীতিই বিচিত্রচ্ছন্দে বাজিয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ কবি—বিশ্ব-প্রকৃতি তাঁহার সহচরী, স্বদেশ-মন্ত্র তাঁহার মন্ত্র নহে। বিশ্ব-রহস্যের কেন্দ্র হইতে যে সর্বনাশা বাঁশীর ডাক আসিয়াছে, তাহারই নেশায় তিনি 'অকূল-ভাসা তরী'র হাল ধরিয়া অনির্দেশের উদ্দেশে বাহির হইয়াছেন। স্বদেশ-জননী তাঁহার এই অশান্ত দুলালকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না—'দুখ-যামিনীর বুকচেরা ধন' অন্তরে যাহার মায়া-পরশ বুলাইয়া দিয়াছে, 'কেনা-বেচা নানান হাটে হাটে' আর কি তাহার মন ভুলাইতে পারে? কবির চিত্ত এখন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে 'চাই-নে-কিছুর স্বর্গশেষে' সেই চিরশান্তিময়

'সব-পেয়েছির দেশে'। অজিতবাবু ইহার মধ্যে উপনিষদের 'আনন্দ-রূপমমৃতম্' 'এষ হ্যেবানন্দয়াতি' প্রভৃতি অধ্যাত্ম অনুভূতির অভিব্যক্তি দেখিতে পাইয়াছেন। যাহা হউক, স্বদেশের কর্মক্ষেত্রের কাছে কবি এবার সত্যই বিদায় লইতেছেন। তাঁহার বেদনা-দিগ্ধ অন্তরের বিদায়-বাণী কি করুণা-স্নিগ্ধ রূপেই না ফুটিয়া উঠিয়াছে!

'তোমরা তবে বিদায় দেহ মোরে,
অকাজ আমি নিয়েছি সাধ ক'রে।
মেঘের পথের পথিক আমি আজি,
হাওয়ার মুখে চ'লে যেতেই রাজি,
অকূল-ভাসা তরীর আমি মাঝি
বেড়াই ঘুরে অকারণের ঘোরে।
তোমরা সবে বিদায় দেহ মোরে।'

তাই আবার এক সূক্ষ্মতর অনুভূতির মধ্যে কবি ডুবিয়া গেলেন, খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতার মধ্যে কবি-চিত্ত চিরদিনের জন্য ধরা দিল না। 'খেয়া'র অবশিষ্ট কবিতাগুলি এক নূতন অবেক্ষার বেদনায় বেপমান। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ তাঁহার 'Philosophy of Rabindranath' গ্রন্থে সত্যই বলিয়াছেন, কর্ম-জীবনে সাফল্যের পরে এই যে অনাসক্তি ও অবসাদ ইহা মানুষের নির্বেদকে বর্ধিত করে এবং মনে একটা গভীর সংশয়ের ছায়াপাত করে। দার্শনিক শোপেন্‌হাউআরও (Schopenhauer) কতকটা অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যতই বৃদ্ধি পাইবে তাহার দুঃখও ততই উপচয় লাভ করিবে—ততই অশান্তি ও উদ্বেগ আসিয়া তাহার চিত্তকে অধিকার করিবে। এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণের একমাত্র পথ নিজস্বতাকে সংকুচিত করিয়া জগদতীত সত্তার মধ্যে প্রসারিত করিয়া দেওয়া। 'শেষ-খেয়া' মানবাত্মার সেই বিক্ষোভের চিত্র—ভূমার মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করিবার কথাই ইহাতে আভাসিত হইয়াছে। শুধু তন্ময়তা আসিয়াছে; সমাধি এখনো দূরে। 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে কবি-চিত্ত সম্পূর্ণ সমাহিত।

এইবারে রূপকের নির্মোক মুক্ত করিয়া ইহার গূঢ়ার্থটি উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা যাক। পূর্বেই বলিয়াছি, সমগ্র 'খেয়া' কাব্যে—বিশেষ করিয়া আলোচ্য কবিতায়—মধ্য-দিনের কর্মমুখর জীবন-যাত্রার অন্তে আনন্দলোকের সন্ধানে মানবাত্মার অভিসারের বাণীই ধ্বনিত হইয়াছে। চারুবাবু তাঁহার 'রবিরশ্মি'তে কবিতাটিকে অন্যান্য কবিতা হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিয়া "ওপার" বলিতে পরলোক বুঝিয়াছেন; কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখিলে এই অর্থ সংগত বলিয়া বোধ হয় না। 'ওপার' কবি-জীবনের পরবর্তী পরিণতি।

'দিনের শেষে' অর্থাৎ কর্মজীবনের অবসানে যে 'ঘুমের দেশে' যাইবার আগ্রহ ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বস্তুত মানব-কল্পনার স্বপ্ন-লোক, যেখানে অনন্ত আনন্দ, অনন্ত অমৃত বিরাজ করিতেছে। এই আনন্দ-লোক কবির সম্মুখে পূর্ণ প্রকাশিত নহে—যেন রহস্যের অবগুণ্ঠনে আবৃত, তাই সে না-পাওয়ার বেদনাকে বাড়াইয়া পাওয়ার আগ্রহকে জাগাইয়া তোলে। সেই মায়া-যবনিকার রন্ধ্র-পথে কচিৎ দু'একটি চূর্ণ রশ্মি এপারে আসিয়া পড়িতেছে। আলো-আঁধারের সেই দো-আলোয় কি এক অব্যক্ত সংগীত (কাজ-ভাঙানো গান) জীবনের দ্বন্দ্ব ও নিত্য-সংগ্রাম হইতে কবি-হৃদয়কে শান্তিলোকের ইংগিত করিতেছে।

দিন-যামিনীর এই সন্ধিক্ষণে অস্ত-সূর্যের নিলীয়মান কিরণে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ঘাটের কিনারা হইতে কবি দেখিতেছেন দূরে, বহুদূরে 'সাধন'-লোক (বাস্তব ও ধ্যান-লোকের মধ্যবর্তী) হইতে আনন্দ-সিন্ধুর উদ্বেলিত আলিংগনে বদ্ধ হইয়া দু'একখানি তরণী ভাসিয়া যাইতেছে অকূলের উদ্দেশে। কিন্তু ওখানে কি তাঁহার স্থান আছে? উহারা কি তাঁহাকে চিনিবে? কবির জীবন-দেবতা ছাড়া তাঁহার 'ব্যর্থ সাধনখানি'র কথা আর কে জানে? এই অপরিচিত খেয়ার মাঝিদের ভিতর এমন কেহ আছে কি যাহার করুণা-কটাক্ষে, তাঁহার মুক্তিপথের বাধা নিমেষেই দূর হইয়া যাইবে? 'Ancient Mariner'-এর স্বপ্ন-তরণীর (Phantom ship) মত অস্তাচলের কোলে কোলে—যেখানে সন্ধ্যার

অন্ধকার তরুচ্ছায়ার বহুলতায় ঘনীভূত হইয়াছে—ঐ যে ছায়াতরীগুলি ছুটিয়াছে মুক্তির প্রেরণায়, উহারা কি এই কর্মপথভ্রষ্ট, শোকভারাতুর শান্তিপিপাসু কবিকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে? পাড়ি দিবার বাসনামাত্র সম্বল করিয়া তিনি ঘাটে বসিয়া আছেন, পাথেয় তো সংগ্রহ হয় নাই!

যাঁহারা সংসারের সমস্ত দেনা-পাওনা শোধ করিয়া নিরাবিল শান্তির সন্ধানে বাহির হইয়াছেন, সেই আনন্দ-পথ-যাত্রীদের সহিত কবি আপন সত্তাকে মিলাইতে চাহিয়াছেন। জীবনের সন্ধ্যা তো ঘনাইয়া আসিল; এবার ক্ষুদ্র সুখ-নীড় ছাড়িয়া অকূল সাগর-সংগমে পাড়ি দিবার পালা। "ভাঁটার টান" সাগরের অভিমুখে তাই এই উক্তির সার্থকতা। কিন্তু যে 'ঘরেও নহে, পারেও নহে' অর্থাৎ সংসারেও যাহার মন বসিতেছে না, অথচ অজ্ঞাত অনাগতের মধ্যে পাড়ি দিবার সাহস যাহার নাই, তাহাকে কে সংগে লইবে? যে ফুল ফুটাইতেও পারিল না, ফল ফলাইতেও পারিল না,—জীবনে বিপুল ব্যর্থতাই যাহার একমাত্র সঞ্চয়, তাহাকে পথ দেখাইবে কে? অশ্রু ফেলিতে যাহার হাসি পায়, অর্থাৎ জীবনে স্থির প্রতিষ্ঠা-ভূমি যাহার নাই—সার্থকতার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া যে নিরন্তর স্রোতের শৈবালের মতই ভাসিয়া বেড়াইতেছে, জীবনে পরমপ্রাপ্তি ঘটিল না বলিয়া বিলাপ করা তাহার শোভা পায় না। 'দিনের আলো যার ফুরালো সাঁঝের আলো জ্বল্‌ল না'—বন্ধন-মুক্তির, ছায়া-আলোর মধ্যপথবর্তী সেই হতভাগ্য আজ দুর্লভের দুরাশায় কূলে বসিয়া। কর্মের প্রেরণা ফুরাইয়াছে, অথচ ধ্যানের মধ্যেও মন সমাহিত হইতে পারিতেছে না, এ অবস্থা সত্যই শোচনীয়। এই কারুণ্য-মিশ্রিত সংশয়ের সুরেই কবিতাটির পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

আমার মতে ইহাই কবিতাটির সংগত ব্যাখ্যা। 'ইহলোক, পরলোক' টানিয়া আনিয়া নিহিত ভাবটিকে ঘোরালো করা যাইতে পারে, কিন্তু সে সম্বন্ধে যুক্তি খুব জোরালো বলিয়া মনে হয় না।

রবীন্দ্র-কাব্যচ্ছন্দের ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ গীতি-কবি; সুতরাং তাঁর কাব্যচ্ছন্দের স্বরূপ নির্ণয় করতে গেলে গীতি-কবিতার ধর্মসম্বন্ধেও দু'এক কথা ব'লে নিতে হয়। নাম থেকেই বোঝা যায় এর মধ্যে আছে কাব্য ও সংগীতের যুগ্মরূপ। কাব্য এবং সংগীত দু'ই ছন্দোময় অর্থাৎ এদের চলনের মধ্যে শুধু বৈচিত্র্যহীন গতিবেগই নেই, আছে নেচে-চলার হিল্লোল। কাব্যই হোক্ আর সংগীতই হোক্, দু'য়েরই কাজ আমাদের অন্তরের চিন্ময় অনুভূতিকে বাঙ্‌ময় রূপ দেওয়া—আবেগের কম্পনগুলিকে ধ্বনি-তরংগে লীলায়িত ক'রে তোলা। এই ধ্বনিই হ'লো কাব্য ও গানের বাহন—ধ্বনির ভাষাতেই অমূর্ত অন্তরাবেগগুলি মুক্তি ও মূর্তি লাভ করে। কিন্তু কেবল ধ্বনিই তো কাব্য বা সংগীতের বাহন নয়; ধ্বনি-বিতানের মধ্যে থাকা চাই একটি সুস্পষ্ট ছন্দের সুষমা। কিন্তু এই ছন্দের লক্ষণ নির্দেশ করাও সহজ নয়। সামান্য অর্থে ছন্দ হচ্ছে প্রকাশের ক্রমিক পরম্পরা—সদৃশ-ধ্বনি-তরংগযুক্ত দুই বা ততোধিক অংশের শোভন সমাবেশ। গতির সংগে এই ছন্দের যোগে পাই নৃত্য, ধ্বনির সাথে এর মিলনে হয় কাব্য ও সংগীতের জন্ম। কিন্তু কাব্য ও গীতি ঠিক এক বস্তু নয়, উভয়ের মধ্যে একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। অব্যাকৃত, অনিরূপ্য ধ্বনিই শুধু সংগীতের ভাষা, কিন্তু এই ধ্বনি যখন অর্থবদ্ধ বিশিষ্ট শব্দে বিবিক্ত হয়, তখনই হয় তা' কাব্যের বাহন। তাই সংগীতের ক্ষেত্রে অর্থের প্রসংগই আসে না—ধ্বনি-তরংগের দোলায় চড়ে' আমাদের অন্তর্গূঢ় আবেগগুলি মর্মলোক থেকে বিশ্বলোকে ছড়িয়ে পড়ে। স্থির-শান্ত জলের বুকে ছোট একটি নুড়ি ছুড়ে দিলে সে যেমন স্পৃষ্টবিন্দুর চারিদিকে কতকগুলি বর্তুল আবর্ত রচনা করে এবং সেগুলি যেমন ব্যাপ্ত হ'তে হ'তে ক্রমে সমগ্র জলতলেই

পড়ে ছড়িয়ে, তেমনি আবেগের সংঘাতে আমাদের চেতনাকে ঘিরে যে ধ্বনিময় আবর্তচক্র রচিত হয় তার পরিধি প্রসারিত হ'য়ে ক্রমশ বিশ্ব-হৃদয়কে স্পর্শ করে। আমাদের অনুভূতির তো কোন অর্থ নেই, সে একটা আনন্দঘন সংবিৎমাত্র। সংগীতেরও কোন পরিস্ফুট অর্থ নেই—আছে শুধু ব্যঞ্জনা, ইন্দ্রিয়গম্য ধ্বনিসংযোগে অতীন্দ্রিয়ের দ্যোতনা। 'ধ্বন্যালোকে'র তৃতীয় উদ্দ্যোতে আনন্দবর্ধন বাচকত্ব ও লক্ষণানিরপেক্ষভাবে গীতধ্বনির ব্যঞ্জকতা ও রসসিদ্ধি স্বীকার করেছেন; "তথাহি গীতধ্বনীনামপি ব্যঞ্জকত্বমস্তি রসাদিবিষয়ম্। ন চ তেষাং বাচকত্বং লক্ষণা বা কথঞ্চিল্লক্ষ্যতে।" জীবনের একটি পরম মুহূর্তে হৃদয়ে যে পুলকের জোয়ার জাগে, ক্ষণলগ্নের সেই সান্দ্র আনন্দকে তো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; তাই তাকে প্রকাশ করবার যত প্রয়াসই করি না তা' সংকেতময় না হ'য়ে পারে না। কাব্যেরও প্রাণ এই সংকেত; কিন্তু যে ধ্বনিময় বিশ্লিষ্ট শব্দের সমবায়ে গঠিত হয় কবিতার চরণ তা সুস্পষ্ট অর্থের দ্বারা পরিমিত; কাজেই অব্যাকৃত-ধ্বনি-সংবদ্ধ (not articulated) সংগীতের ইংগিতময়তা কাব্যে আশা করা অসংগত। তবুও কবিতাতে এই গীতিধর্ম কিছুটা আছে, কারণ কেবল বাক্য তো কবিতা নয়, ছন্দোময়ী বাক্ই কাব্যরসের আসন। সাধারণ কথা, যা দিয়ে প্রাত্যহিক প্রয়োজন-সাধনের কাজ চলে, শ্রুতি যাকে ব'লেছেন, 'অফলা অপুষ্পা বাক্', কবিতার পক্ষে তা কখনই উপযোগী নয়। ছন্দের পাখা যখন লাগে এসে সেই বচনে তখনই সে উড়ে যায় অনির্বচনীয়ের রাজ্যে, অর্থের বন্ধন থেকে মুক্ত হ'য়ে চ'লে যায় রসের তুরীয় লোকে। একটি বিমল, বিরল অর্থ বিদ্যোতিত হয় তার অন্তরে, বাক্-পদ্মাসনে জাগে ভাবের 'ভদ্রালক্ষ্মী'। একই বাক্য কেবল ছন্দোযুক্ত হ'য়ে পঠিত হ'লে হয় ঋক্, উদাত্তাদি-স্বরসহযোগে উদ্গীত হ'লে হয় সাম। ঋক্-সামের এই পার্থক্যের ভিতরেই কাব্য ও গীতের প্রকৃত পার্থক্যটি নিহিত আছে।

প্রসংগত এখানে তালমানাদি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। সংগীতের 'মান' বস্তুটি কবিতার 'চরণ'-এরই অনুরূপ। যে পরিমিত ও নিয়মিত সময়ের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ ছন্দ তার অয়ন-চক্র পরিক্রমা করে সেই কাল-পরিমাণের নাম দেওয়া হয় মান। এই মান আবার 'তাল' অর্থাৎ মানাংশে বিভক্ত; তাল ও মানের সম্বন্ধ অংগাংগী। সংগীতে তাল ব'লতে যা বোঝায় কাব্যচ্ছন্দে তা'রই নাম দেওয়া হয় পর্ব। পরিশেষে এই তাল অথবা পর্বগুলিকে 'মাত্রা' অর্থাৎ অবম কালাংশে বিভক্ত করা হয়। তা ছাড়া, সুর বা ছন্দের প্রধান ঝোঁকগুলিও তাল নামে পরিচিত। বলা আবশ্যক ছন্দের 'স্ফোট' বা সমগ্র সংকল্প-রূপটি (getsalt) প্রথমে কল্পনায় প্রতিভাসিত হয়। অভিব্যক্তির পরে আসে বিবিক্তি অর্থাৎ তালমাত্রাদিতে তার বিশ্লেষ অথবা বিভক্তি। ছন্দোরূপকে একটি নিয়মের শৃংখলায় বাঁধবার জন্যই সচেতন মনের এই সযত্ন প্রয়াস। তাই বিশ্লেষের পরে ছন্দের ধ্বনি-রূপের মধ্যে যেখানে অপূর্ণতা লক্ষিত হয় সেখানেও গূঢ়রূপে পূর্ণতার আকাংক্ষা বর্তমান থাকে। আবৃত্তিকালে মাত্রার প্রসারের দ্বারা সেই আকাংক্ষার নিবৃত্তি করা হয়। এমনও হ'তে পারে যে অপূর্ণ ধ্বনিটিকে হয়তো সম্পূর্ণ প্রসারিত করা হয় না, কিন্তু পর্ব থেকে পর্বান্তরে অথবা এক চরণ থেকে অন্য চরণে পদক্ষেপের মধ্যে বিরতির দ্বারা সেই অপূর্ণতার পূরণ করা হয়। অতএব ছন্দে যে পর্বগুলিকে 'অপূর্ণ-পদী' বলে চিহ্নিত করা হয় আসলে তারা অপূর্ণ নয়। * সে যা হোক মাত্রা, তাল, মান সবই আছে কবিতা আর গানে। তফাৎ এই যে কাব্যের মাত্রাচ্ছন্দ তালপ্রধান অর্থাৎ পর্বের আদিতে তার ঝোঁকগুলি সুস্পষ্ট; আর 'মান'ই হ'লো সংগীতের প্রাণ। ধ্রুবপদ বা 'ক্লাসিক্' সংগীতের সংগে খেয়াল বা 'রোম্যান্‌টিক্' গানের পার্থক্য এইখানেই। ধ্রুবপদে মাত্রা-তাল-মান কোনটিরই বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করা চলে না; কিন্তু খেয়াল গানে মানের সম্মান

* 'উত্তরিবে যবে। নব প্রভাতের। তীরে'...এই চরণে ছয়মাত্রার দু'টি পর্বের পরে দ্বিমাত্র তৃতীয় পর্বটি দৃশ্যত অপূর্ণ হ'লেও বস্তুত অপূর্ণ নয়।

অক্ষুণ্ণ থাকলে মাত্রা-তালের সামান্য ব্যতিক্রম নিন্দনীয় ব'লে গণ্য হয় না। কাব্যের মত সংগীতে তাল অথবা পর্বের এই গ্রন্থিগুলি সুব্যক্ত নয়; কাজেই বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অন্যের কানে তা' সহজে ধরা পড়ে না; অনেক সময় স্বয়ং গায়কও সুর-লীলায় দোলায়িত হ'য়ে তালের দিকে লক্ষ্য রাখতে ভুলে যান। তাই সংগীতে অবনদ্ধ বা ঘন-যন্ত্রের সাহায্যে তালচিহ্নগুলি সুব্যক্ত ক'রবার রীতি প্রচলিত আছে। পূর্বেই বলা হ'য়েছে ন্যূনতম কাল-পরিমাণের নাম মাত্রা; ছন্দের রূপ-কল্প বা প্যাটার্ণ অনুসারেই অক্ষরের মাত্রা-মূল্য নিরূপিত হয়। এ ছাড়া ছন্দে 'লয়' ব'লে একটি বস্তু আছে; ভরতমুনির মতে লয়ের অর্থ শয্যা; গীত, গীতাংশ বা ছন্দ যেন এর উপর লীন থাকে। এই 'লয়' ব'লতে তিনি আরো বুঝিয়েছেন বিলম্বিত মধ্য ও দ্রুত গতিরূপ ভেদে তিন প্রকারের রূপায়ণ অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলা হয় 'tempo'।

কাব্যচ্ছন্দের প্রকৃতি ঠিক গীতচ্ছন্দের অনুরূপ নয়; চরণের চলনভংগির নামই ছন্দ। শব্দ যখন শব্দের গায়ে প'ড়ে জলতরংগের মত বেজে ওঠে, শব্দ-প্রবাহ যখন যেতে যেতে পথের মাঝেই যায় থেমে, যখন গতিবেগ অকারণেই হয় ত্বরিত অথবা মন্থর, তখন শব্দনর্তনের মধ্যে যে বৈচিত্রী—যে আন্দোলিত রূপটি ফুটে ওঠে তারই অন্যনাম ছন্দ। সুর তো নেচে চলে না, সে চলে উড়ে—তাই তার আছে একটি বিতত-ললিত কান্তি। ধ্বনিগুলি বিশ্লিষ্ট নয় ব'লে তার কারুরূপের মধ্যে নেই সেই সংহত সৌকুমার্য যা' কাব্যকে এত ঝংকারমুখর ক'রে তুলেছে। বিশুদ্ধ সংগীতের আলাপে অর্থের কোন স্থানই নেই, তাই ভাষা না জানলেও তার সুরের আবেদনটুকু আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। কাব্যে কিন্তু অর্থের দিকটাও উপেক্ষণীয় নয়—যদিচ শ্রেষ্ঠ কব্যের লক্ষ্যও হ'লো পদে পদে বাচ্যার্থকে এড়িয়ে একটি গূঢ়তর তাৎপর্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। তাই আলংকারিকরা কাব্যের প্রসংগে আর্থী এবং শাব্দী উভয়বিধ ব্যঞ্জনার কথাই উল্লেখ ক'রেছেন—এরই স্তুতি ক'রেছেন শ্রুতি 'ভদ্রালক্ষ্মী' ব'লে। এখানে একটা কথা বিশেষ ক'রে বলা আবশ্যক মনে করি; অনেকেই ভুলে যান যে কাব্য মনে

মনে পড়ার জিনিষ নয়, তার বাচ্য অথবা লক্ষ্য অর্থের উদ্ধারও তার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তার 'মংগলময়ী গুপ্তশোভাটি'কে যদি উপলব্ধি করতে হয় তাহ'লে ধ্বনিসংযোগে তার আবৃত্তি ক'রতে হবে; কারণ কবির আবেগ তাঁর অন্তরে যে রূপ নিয়েছে তা' বর্ণবদ্ধ শব্দচিত্র নয়, শব্দাহত ধ্বনিতরংগমাত্র।* সুতরাং কাব্যের স্বরূপনির্ণয়ে অর্থরূপ এবং শব্দরূপ দু'এর প্রতিই তুল্যরূপে সজাগ থাকতে হবে। অবশ্য একথা আমার প্রত্যয়ই হয় না যে রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতা ধ্বনিসংযোগে আবৃত্তি না ক'রে শুধু মনে মনে প'ড়েই তা থেকে পূর্ণ পরিতৃপ্তি কেউ পেয়েছেন। এরকম অভিজ্ঞতাও হয়তো কারো কারো আছে যে প্রথমত চয়নিকা অথবা সঞ্চয়িতাখানা খুলে মনে মনে কোন কবিতা পড়তে সুরু ক'রেছেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ছন্দের অব্যক্ত আহ্বানে মন এমন দুলে উঠেছে যে উদাত্তকণ্ঠে সেটি বারবার আবৃত্তি ক'রেছেন। আমার তো এমন কতদিন হ'য়েছে যে অর্থের দিকে কোন দৃষ্টি না রেখে, অথবা বিন্দুমাত্র অর্থ-গ্রহণ না ক'রেই কেবল ছন্দের যাদুতে ভুলে ঐ মেঘমন্দ্র শ্লোকগুলি একটির পর একটী আবৃত্তি ক'রে গিয়েছি, অথচ তাতে কবিচিত্তের আনন্দের প্রসাদকণিকাও যে না পেয়েছি তা' নয়। অর্থগ্রহণই যদি কাব্যপাঠের একমাত্র তাৎপর্য হ'তো, তা হ'লে শুধু স্বর-কম্পনের মধ্য দিয়ে চিত্ত কখনই বাস্তব থেকে বিযুক্ত হ'য়ে এক অপার্থিব ধ্যানময় নিঃসংগতায় পৌঁছতে পারতো না। যাহোক্, ভাবব্যঞ্জনায় ছন্দের যে একটি নিজস্ব ও বিশিষ্ট স্থান আছে তা' অস্বীকার করা যায় না। এই ছন্দের যাদুকর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কাব্যগ্রন্থের পাতায় পাতায় যে অজস্র ছন্দঃ-সুধা তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন তার সুষমায় আমাদের মন উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে গিয়েছে। সেই ছন্দের আকৃতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ ক'রে তার অন্তর্লীন আনন্দের পরিচয়

---

* বস্তুত, ধ্বনিবাদীরা শ্রূয়মাণ বর্ণে ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার ক'রেছেন এবং শব্দকেই কাব্যের আত্মা ধ'রে নিয়ে বাচ্যলক্ষ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনাকে ধ্বনিসংজ্ঞার দ্বারা সংকেতিত ক'রেছেন। ধ্বন্যালোকের 'লোচন'-নামক টীকায় অভিনব গুপ্ত ধ্বনিকে ঘণ্টাধ্বনির অনুরণনের সংগে উপমিত ক'রেছেন।

যদিচ দেওয়া যায় না, তবুও ব্যবহার-ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা কিছু আছে নিশ্চয়ই। ছানা-চিনিসহযোগে যে বিশেষ পাকপ্রকরণে সন্দেশ প্রস্তুত হয়, সেই প্রণালীটা জেনে রাখ্‌তে ক্ষতি অন্তত কিছু নেই, যদিও সোজা দোকান থেকে কিনে মুখে ফেলে দেওয়াতে আনন্দ অবশ্যই গভীরতর। প্রথম প্রকারের আনন্দ থাকে বুদ্ধিকে আশ্রয় ক'রে, আর কাব্যরসাস্বাদের যে আনন্দ সে হ'লো একান্ত মর্মগত।

যাহোক, আর অধিক ভূমিকা না ক'রে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে নামা যাক। ছন্দের বিচারে প্রথম প্রয়োজনীয় কথা হ'চ্ছে এই যে ছন্দ 'স্বর'-প্রধান, শ্বাসাঘাত-প্রধান এবং তাল-প্রধান এই তিন রকম হ'তে পারে। ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে কেবল গ্রীক্, ল্যাটিন্ এবং সংস্কৃতই কালমাত্রানুসারে গঠন ক'রেছে তাদের কোন কোন ছন্দ। বৈদিক ছন্দে 'স্বর' ছিল এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ছন্দস্‌শাস্ত্রে শব্দটির পারিভাষিক অর্থ পদমধ্যস্থ কোন অক্ষরের উচ্চারণগত প্রাধান্য। উদাত্ত (উচ্চ বা আরোহী) অনুদাত্ত (নিম্ন) এবং স্বরিত (অবরোহী) উচ্চারণের দ্বারা এই প্রাধান্য প্রকাশিত হ'তো। ঋক্‌সকল ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, জগতী, বৃহতী, গায়ত্রী, পংক্তি প্রভৃতি নানা ছন্দে রচিত। লৌকিক সংস্কৃতে ছন্দ দ্বিবিধ :—বৃত্ত ও জাতি। বৃত্তচ্ছন্দে কেবল অক্ষরসংখ্যা গণনা করা হয়; অবশ্য কোন্ ছন্দে কোন্‌সংখ্যক্ অক্ষর লঘু বা গুরু হবে, কোন্ ছন্দের অক্ষরসংখ্যা কত হ'বে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। জাতি-শ্রেণির ছন্দে মাত্রা বা কাল-পরিমাণের মানে ছন্দোরূপ নিরূপিত হয়; লঘুবর্ণ একমাত্র, গুরুবর্ণ দ্বিমাত্র—হ্রস্বস্বর একমাত্র এবং দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্র ব'লে গণ্য হয়। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে মাত্রাচ্ছন্দের প্রচলন অধিক দিনের নয়; এই ছন্দ যে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন তার প্রমাণ রামায়ণে, মহাভারতে (একটি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ব্যতীত) কিংবা তৎপরবর্তী ভাগবতে মাত্রাচ্ছন্দের কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না; গাথা, গীতি, উদ্‌গীতি, আর্যাগীতি প্রভৃতি নামগুলি থেকেই বোঝা যায় যে সুরসংযোগে গীত হ'বার জন্যেই পরবর্তী কালে

হ'য়েছিল এদের সৃষ্টি। 'গীতগোবিন্দ'-কাব্যের গীতগুলি এই মাত্রাচ্ছন্দে বিরচিত।

আধুনিক বাঙলায় যে সব ছন্দ প্রচলিত আছে তা'দের মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে—যেমন অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত। অবশ্য সব ছান্দসিকই এই নামকরণ সমর্থন করেন না।

আমার কিন্তু মনে হয় এই ছন্দোবিভাগ মোটের উপর বিজ্ঞানসম্মত। অক্ষর-সংখ্যা অনুসারেই 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দের বৃত্ত নিরূপিত হয়; সুতরাং নামটি যে সার্থক তাতে সন্দেহ নেই। বিবৃত ও সংবৃত উভয়বিধ অক্ষরকেই 'একমাত্র' ব'লে গণ্য করা হয়। সংস্কৃতে ছন্দস্‌শাস্ত্রে 'অক্ষর' শব্দটি প্রধানত বর্ণ (letter) অর্থে প্রযুক্ত হ'লেও, 'syllable' অর্থাৎ স্বর অথবা স্বরসংযুক্ত ব্যঞ্জন অর্থেও এর ব্যবহার অপ্রচলিত নয়। আলোচ্য প্রবন্ধে আমি বাঙ্‌লার প্রচলিত প্রথা-অনুসারে অক্ষরকে 'syllable' অর্থেই গ্রহণ ক'রেছি। শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মহাশয় ব'লেছেন (পরিচয়—কার্ত্তিক, ১৩৫২) এই ছন্দ (অক্ষরবৃত্ত) অস্থিরমাত্র, যে হেতু এই ছন্দে মুক্ত বা বিবৃত ধ্বনি সর্বত্র লঘু অর্থাৎ একমাত্র এবং সংবৃত বা বদ্ধধ্বনি ছন্দের আদল অনুসারে কোথাও গুরু (দ্বিমাত্র), কোথাও লঘু। বসু মহাশয়ের আশয় বোধ হয় এই যে যেখানে কোন চরণের অক্ষর-সংখ্যা অনিয়ত অর্থাৎ নির্দিষ্ট সংখ্যা থেকে ন্যূন, সেখানে অক্ষরের অসমতা সংবৃত ধ্বনিকে আবশ্যকমত দ্বিমাত্র ধ'রে, মাত্রাসমতার দ্বারা পূরণ ক'রে নিতে হবে। বস্তুত, এই ছন্দে মুক্ত-বদ্ধ-নির্বিশেষে প্রত্যেকটি অক্ষরের মাত্রামান সমান অর্থাৎ একমাত্রা, কাজেই ছন্দ অস্থিরাক্ষর না হ'লে অস্থিরমাত্র হবার কোন হেতু নেই। পয়ার প্রভৃতি প্রবাহশীল ছন্দমাত্রই এই শ্রেণিতে পড়ে; পয়ারের প্রত্যেক চরণ সাধারণত চৌদ্দ অক্ষরে গঠিত হয়; এদের কোন কোনটি যদি গুরু (দ্বিমাত্র) হয়, তাহ'লে বৃত্তবন্ধের বিপর্যয় অনিবার্য হ'য়ে ওঠে, চরণে চরণে মানের সমতা রক্ষিত হয় না। ছন্দ ব'য়ে চলে ব'লে বিবৃত ও সংবৃত অক্ষরে ওজনের সূক্ষ্ম তারতম্যটুকু সহজেই কানকে এড়িয়ে

যায়। এই জাতীয় ছন্দের চরণে অক্ষর-সংখ্যার ন্যূনতা ঘটে তখনই যখন পদান্তর্গত শব্দগুলির মধ্যে কোনটি ব্যঞ্জনান্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় এইরূপ ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত এত অধিক যে মনে হয় ব্যতিক্রমই বুঝি নিয়ম। প্রথমে পয়ারজাতীয় একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক :—

স্বপ্ন-রাজ্য ভেসে যাবে। খর অশ্রুজলে··· (কড়ি ও কোমল)

হায়্ যদি এত লজ্জা। কথায়্ কথায়্........... ,,

উদ্ধৃত চরণদু'টির মধ্যে প্রথমটিতে অক্ষর-সংখ্যা নিয়মিত অর্থাৎ চৌদ্দ, সুতরাং সংবৃত অক্ষরকে দ্বিমাত্ররূপে গণ্য করার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু দ্বিতীয় চরণটিতে তিনটি হলন্ত শব্দ থাকায় অক্ষর-সংখ্যা এগার; এখন ঐ তিনটি শব্দের হলন্ত অক্ষরগুলির প্রত্যেকটিকে দ্বিমাত্র না ধ'রলে মাত্রার সমতা রক্ষিত হয় না। এর পর মহাপয়ার-জাতীয় একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক :

দক্ষিণের দোলা-লাগা। পাখি-জাগা বসন্ত-প্রভাতে

উদ্ধৃত চরণটিতে অক্ষর-সংখ্যা নিয়মিত আঠারর পরিবর্তে সতের, অথচ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মাত্রা-গণনার নিয়মে বিবৃত ও সংবৃত ধ্বনি মিলিয়ে মাত্রার সংখ্যা আঠারর স্থলে কুড়ি। অতএব এখানে 'দক্ষিণের্' এই হলন্ত শব্দটির অন্তিম সংবৃত-অক্ষরটিই শুধু দ্বিমাত্র ব'লে গণ্য হবে। এর পরে, এর আগের চরণটি যদি বিশ্লেষণ করি তবে উভয়ের মধ্যে মাত্রাগত বৈষম্য সহজেই চোখে পড়ে; তাই ব'লে ছন্দোগত লয়ের বিলয় ঘটে না, আবৃত্তি-মুখে মাত্রার অসমতা সমীকৃত হ'য়ে যায়। পয়ারে প্রত্যেক চরণে অক্ষর-সংখ্যা যে সমান থাকে না রাজা রামমোহন রায়ও এটা লক্ষ্য ক'রেছিলেন এবং তৎপ্রণীত 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে'র শেষ পরিচ্ছেদে উদাহরণসহযোগে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তারপরে গোল বাধে 'মাত্রা'শব্দের পারিভাষিক অর্থ নিয়ে। প্রবোধ-বাবুর মতে 'মাত্রা' মানে 'unit' আর 'কলা' মানে 'mora' (আনন্দবাজার পত্রিকা—পূজা-সংখ্যা, ১৩৫২)। যে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে একটিমাত্র ধ্বনি বা অক্ষর উচ্চারিত হয় তা'র নাম 'mora'; ছন্দসশাস্ত্রে 'কলা' শব্দও অবিকল

ঐ অর্থেই প্রযুক্ত হয়। বাঙ্লায় মাত্রাবৃত্ত—প্রবোধবাবুর পরিভাষায় কলা-বৃত্ত—ছন্দে প্রত্যেক বিবৃত ধ্বনিতে একটি কলা এবং সংবৃত ধ্বনিতে দু'টি কলা থাকে এবং পর্বান্তর্গত কলার মানেই ছন্দের প্রকৃতি নিরূপিত হয়। মাত্রা-শব্দের অর্থও কাল-পরিমাণ; তাছাড়া, 'মান' অথবা 'unit' হিসাবেও এর প্রয়োগ আছে। সুতরাং মাত্রাবৃত্ত এই নামকরণে আপত্তির কোন হেতু নেই, বিশেষত সংস্কৃত ছন্দঃপ্রকরণে এই নামই যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গিয়েছে তখন অকারণ একটি নূতন নাম উদ্ভাবনের আবশ্যকতা কি? অবশ্য এ কথাও স্বীকার্য যে মাত্রাকে 'unit' অর্থে নিলে অক্ষরমাত্রিক, কলামাত্রিক প্রভৃতি নামকরণে যুক্তিসংগত কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

পরিভাষা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বলা যেতে পারে যে বাঙ্লা ছন্দের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ ক'রে মাত্রা বা কালপরিমাণের হিসাবে কল্পিত; সেগুলিতে অক্ষরের সংখ্যা গণনা ক'রে ছন্দ নিরূপিত হয় না। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রত্যেক সন্ধ্যক্ষর ও হলন্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রার মর্যাদা দেওয়া হয়, কিন্তু একেবারে সংস্কৃত ছাঁচে ঢালা না হ'লে হ্রস্ব-দীর্ঘের মধ্যে কোন মাত্রাভেদ স্বীকৃত হয় না। বাঙ্লা ছন্দের প্রকৃতি-নির্ণয়ে সর্বদাই মনে রাখ্তে হবে যে বাঙ্লা ছন্দের উচ্চারণের যে স্বাভাবিক পদ্ধতি সচরাচর তার ব্যতিক্রম করা চ'ল্বে না। আবৃত্তি-পদ্ধতিতে সংস্কৃতানুযায়ী দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ শিশির ভাদুড়ি মহাশয় প্রবর্তন ক'রলেও অমিত্রাক্ষর ছন্দের বক্তৃতা ব্যতীত ছন্দোবদ্ধ অন্য কোন রচনায় ঐ ঢঙ্টি অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হয়। সীতাহারা রাম যখন দীর্ঘায়ত ছন্দে 'সীতা, সীতা' ব'লে বিলাপ করেন তখন সেই আর্ত আহ্বান ভাবালু চিত্তকে হয়তো চঞ্চল করে, কিন্তু 'ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর' এই চরণটির আবৃত্তির সময় যদি প্রত্যেক দীর্ঘ স্বরটিকে টেনে টেনে পড়া যায়, তাহ'লে, ভূতের চেহারা যেমনই হোক্, আবৃত্তির চেহারা যে নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া হ'য়ে পড়ে তা বলাই বাহুল্য। বাঙলা ছন্দ সাধারণত স্বভাবমাত্রিক; ছন্দের বিচারে এই মূলকথাটি স্মরণ

রাখা আবশ্যক। এই প্রসংগে আরও একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ছন্দ উপরি-উক্ত তিনটি শ্রেণির মধ্যে যে কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত হোক, কাল-পরিমাণের সুষমতা ব্যতীত কোন ছন্দই শ্রুতিসুভগ হ'তে পারে না। মাত্রা-বৃত্ত ছন্দে প্রত্যেকটি পংক্তি যেখানে সুনির্দিষ্ট মাত্রানুসারে গঠিত হয়, অক্ষর-বৃত্তে সেখানে পংক্তিগুলির অক্ষর তথা মাত্রার অসমতা সুরললিত আবৃত্তি-মুখে সমীকৃত হয় এবং স্বরবৃত্ত ছন্দে তাদের হ্রস্বতা অথবা দীর্ঘতা 'স্বর'-বিন্যাসের কৌশলে সমতাপ্রাপ্ত হয়। কাজেই ছন্দের উপরি-উক্ত শ্রেণীকরণ যে কতকটা ব্যাবহারিক উপযোগিতার দিক থেকে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অমূল্যবাবু তাঁর 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থে বাঙ্‌লা ছন্দের প্রকৃতি পর্যালোচনা ক'রতে গিয়ে ব'লেছেন, এর 'সবই সংখ্যার উপর নির্ভর করে', এই ছন্দ 'quantitative বা মাত্রাগত'; যদিও তিনি একটু পরেই স্বীকার ক'রেছেন যে, 'পাঠের সময় কখনও কখনও এক একটা অক্ষরে অতিরিক্ত জোর দিয়া উচ্চারণ করা হয়' এবং ঘুম-পাড়ানি মাসী-পিসীর দৃষ্টান্ত দিয়ে ব'লেছেন, 'চরণটির প্রথমে যে ঘুম-অক্ষরটি আছে, তাহার উপর অন্যান্য অক্ষরের তুলনায় অনেক বেশী জোর পড়ে। এই জোর-পড়াকে তিনি শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত বা বল ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন। প্রথম কথা, শ্বাসাঘাতকে (stress accent) স্বরাঘাত নাম দেওয়া সংগত কি? শ্বাসাঘাতের অর্থ আবৃত্তি-কালে কোন অক্ষরকে শ্বাসের আঘাত দিয়ে অর্থাৎ সজোরে উচ্চারণ করা; কাজেই এর পর্যায়-শব্দ-হিসাবে 'স্বরাঘাত'-সংজ্ঞাটি সার্থক ব'লে মনে হয় না। 'স্বর'-এর অর্থ স্বরধ্বনির উদাত্ত (উচ্চ), অনুদাত্ত (নিম্ন) ও স্বরিত (মধ্য) ভেদে উচ্চারণ। স্বরের উচ্চাবচতা—আরোহ-অবরোহ, গাম্ভীর্য ও তীক্ষ্ণতা—সূচিত হয় এই 'স্বর'-বিন্যাসের ফলে; শ্বাসাঘাতের সংগে এর কোনই সম্বন্ধ নেই। তা ছাড়া, বাঙ্‌লা ছন্দকে, 'quantitative বা কেবল মাত্রাগত' ব'ল্‌লেও ঠিক বলা হয় না; কারণ কোন ছন্দোরূপই কেবল মাত্রার মানে কল্পিত হ'তে পারে না। ছন্দের অর্থই তরংগ—ধ্বনির উত্থান-পতন; যেখানে আবির্ভাব-স্থিতি-তিরোভাবশীল

ধ্বনি-রূপ নেই সেখানে ছন্দও নেই। ছন্দস্-শাস্ত্রে বিশ্লেষের সুবিধার জন্য গুরু লঘু বর্ণকে মাত্রামানের দ্বারা চিহ্নিত করা হ'লেও আসলে ওদের পার্থক্য কালগত নয়, ধ্বনিগত অর্থাৎ গুণগত। ঘোষ এবং অঘোষ, মহাপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ বর্ণের মধ্যেও ধ্বনিগত প্রভেদ সুস্পষ্ট। বাঙ্‌লা ছন্দের আদর্শ বা রূপকল্পও ত্রিবিধ: সাধারণ প্রবাহশীল* ছন্দের নাম 'অক্ষর-বৃত্ত'; ঝোঁক-প্রধান ছন্দ 'মাত্রাবৃত্ত' এবং স্বর-প্রধান ছন্দ 'স্বরবৃত্ত' নামে কথিত। শেষ প্রকারের ছন্দে ঝোঁক থাক্‌লেও তা অনিয়ত ও অনতিস্পষ্ট। মাত্রাবৃত্তের সংগে এর প্রধান পার্থক্য, এর পর্বে পর্বে মাত্রাসংখ্যার অস্থিরতা; একই চরণে কোন পর্বে চার, কোন পর্বে পাঁচ, কোনপর্বে বা ছয় মাত্রা। 'স্বর'-সংযোগে উদীরিত হওয়ায় এই অসমতা মসৃণিত হ'য়ে যায়। আমরা এই প্রবন্ধে তিন প্রকার ছন্দেরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা ক'রেছি।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাঙ্‌লায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ছিল না ব'ল্‌লেই চলে, অক্ষর-সংখ্যা গণনা ক'রেই কবিতার ছন্দোবন্ধ রচিত হ'তো। পয়ারের প্রত্যেক চরণ ছিল চৌদ্দ-অক্ষরের এবং অক্ষর-গণনায় লঘুগুরুর কোন তারতম্য করা হ'তো না। অবশ্য যতি এবং পর্ববিভাগ সুনির্দিষ্ট ছিল। রবীন্দ্রনাথই প্রথম লক্ষ্য ক'রলেন যে সুর ক'রে পড়ার জন্যে পয়ার প্রভৃতি ছন্দে মুক্ত ও যুক্ত অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য অনুভূত না হ'লেও আসলে ওরা সমান ওজনের নয়; মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর, এবং যৌগিক স্বরগুলিকে দ্বিমাত্রার মর্যাদা না দিলে ছন্দোভংগ-দোষ হয়। তাই চিরাচরিত রীতি পরিহার ক'রে তিনি বাঙ্‌লায় মাত্রানুযায়ী এক অভিনব ছন্দোবন্ধ উদ্‌ভাবন ক'রেছেন। মাইকেল পয়ারের অন্ত্যানুপ্রাস তুলে দিয়ে এবং বাক্যকে প্রত্যেক চরণে সমাপ্ত না ক'রে

---

* প্রকৃত প্রস্তাবে ছন্দের প্রবাহ বা গতি বাস্তব নয়, প্রতীয়মানমাত্র। ছন্দের শুধু তরংগ বা উত্থান-পতনই আছে। ধ্বনিগুলি পর পর আবির্ভূত, মুহূর্তকাল অবস্থিত এবং তিরোহিত হওয়ায় চলচ্চিত্রের মত একটি গতির প্রতীতি হয়। একটি স্থির আধার বা 'লয়ে'র উপর এই ছন্দো-লীলা চ'ল্‌তে থাকে। এ যেন হ্রদ-জলের ঊর্মি-নর্তন—স্রোতস্বিনীর স্রোতোবেগ এ নয়।

পরবর্তী চরণগুলিতে প্রবাহিত হ'তে দিয়ে এর মধ্যে এক অপূর্ব গতিবেগের সঞ্চার করেছেন। তিনিও কিন্তু তাঁর ছন্দকে মাত্রাপ্রধান করেন নি; করা বোধ করি সম্ভবও ছিল না। ফলকথা, পয়ারের পরিমিত ও নিয়মিত চরণগুলিকে প্রবাহিত ও হিল্লোলিত ক'রে তা'র মধ্যে তিনি এনে দিয়েছেন একটি স্বচ্ছন্দ প্রকাশের আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ আবার এই পয়ারকে কত বিচিত্র ভংগিতেই যে সাজিয়েছেন তা' বলা যায় না। অবশ্য পয়ারকে যেখানে তিনি খাঁটি পয়ারই রেখেছেন সেখানে ঢঙ্ তার সম্পূর্ণ পুরাতন অর্থাৎ ছন্দ সেখানে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত নয়; পয়ারছন্দে লেখা 'কড়ি ও কোমলে'র একটি কবিতার কয়েকটি চরণ এখানে আলোচনা করা যাক্ :—

কোথা সেই হাসিপ্রান্ত। চুম্বন-তৃষিত
রাঙা পুষ্পটুকু যেন। প্রস্ফুট অধর
কোথা কুসুমিত তনু। পূর্ণ বিকশিত
কম্পিত পুলকভরে। যৌবনকাতর

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এখানে সংবৃতাক্ষরকে দ্বিমাত্র ধরা হয় নি—বোধ করি তা' সম্ভবও নয়; কারণ পয়ারের প্রকৃতিই এমনি যে সে সুরের বেগে চলে—ঝোঁকের চালে নয়; অর্থাৎ শব্দগুলি পরস্পরের গায়ে আঘাত ক'রে ঝংকার তুলে চলে না, চলে সুরের স্রোতে ভেসে ভেসে। কিন্তু এই পয়ারকেই যখন তিনি ঝোঁকের চালে চালিয়েছেন তখন আপনা থেকেই তার উপর এসে পড়েছে মাত্রার প্রভাব। যতির অবস্থান-ভেদে ও চাল বা চলন-ভংগির তারতম্যে এই পয়ারের মধ্যেই যে কি অজস্র বৈচিত্র্য আনা যায় রবীন্দ্রনাথের রচনাতে তার ভূরি ভূরি উদাহরণ মেলে :

ছিলাম নিশিদিন। আশাহীন প্রবাসী।

বিরহ-তপোবনে। আনমনে উদাসী।

এখানে পর্বগুলি সাতমাত্রার এবং প্রত্যেক পর্বের গোড়ার দিকে ঝোঁক

সুস্পষ্ট। ঝোঁকের চালে চলায় ছন্দোবদ্ধ দ্বি-পর্বিক সাতমাত্রার, চৌদ্দ অক্ষরের নয়। আবৃত্তি কালে মনেই হয় না এও পয়ারেরই একটি প্রকারমাত্র। আর একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্—

এ́মন সময়। অ́রুণ-ধূসর। প́থে
ত́রুণ পথিক। দে́খা দিল রা́জ। র́থে
শুধাল কাতরে। সে কোথায় সে কো। থায়
ব্যগ্রচরণে। আমারি দুয়ারে। নামি'

অথবা

মু́দিত আলোর। ক́মল-কলিকা। টি́রে
রেখেছে সন্ধ্যা। আঁধার পর্ণ। পুটে

এও মাত্রাচ্ছন্দ—চৌদ্দ-মাত্রার চরণ, প্রতি চরণে তিনটি ক'রে পর্ব—প্রথম দু'টি ছয়মাত্রার এবং তৃতীয়টি দৃশ্যত দুই কিন্তু আসলে তিন কিংবা চারমাত্রার। ঝোঁক পর্বের প্রথম দিকে। চতুর্থ চরণে 'ব্যগ্র' শব্দটি দ্ব্যক্ষর হ'লেও একে তিন মাত্রার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ; অনুরূপভাবে 'সন্ধ্যা', 'পর্ণ' শব্দ দু'টিও তিনমাত্রার। 'ব্যগ্র-চরণে'র স্থলে 'ব্যগ্র চরণেতে' লিখলে ছন্দোভংগ হ'তো নিশ্চয়ই। বলা আবশ্যক বাঙ্‌লা ভাষায় ছন্দের ঝোঁক পর্বের আদিতে পড়াই নিয়ম।

আবার এই পয়ারেরই দ্বিতীয় পর্বের একটিমাত্র অক্ষর সংক্ষেপ ক'রে কবি তাঁর ছন্দে এনে দিয়েছেন এমন একটি ক্ষিপ্র গতিবেগ যা বর্ষাকালীন নদীস্রোতের মতই তূর্ণ ও চঞ্চল। তাঁর 'সোনার তরী' কবিতার দু'এক চরণ আলোচনা ক'রলেই তা' স্পষ্ট ধরা প'ড়বে।

গ́গনে গরজে মেঘ। ঘ́ন বরষা
কূলে একা বসে আছি। নাহি ভরসা

চরণের প্রথম পর্বে পয়ারের নিয়মমত আট অক্ষর ঠিকই বজায় আছে—কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে গিয়ে অক্ষর-সংখ্যা হ'য়েছে ছয়ের জায়গায় পাঁচ। অথচ এই

সামান্য পরিবর্তনেই ঝোঁকের চালে চলার জন্যে ছন্দের গতিতে কি আশ্চর্য বেগের সঞ্চার হ'য়েছে। স্তবকের তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে আছে কেবল আট অক্ষরের একটি ক'রে পর্ব, পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণ পূর্বের মতই ত্রয়োদশাক্ষর। চরণ-দু'টিকে খাঁটি পয়ারে রূপান্তরিত ক'রে দেখালে পার্থক্যটা নিশ্চয়ই প্রকট হ'বে। পড়ুন—

গগনে গরজে মেঘ। নিবিড় বরষা
কূলে একা বসে আছি। নাহিক ভরসা

ভরসা করি এর পর আমার উক্তি সম্পর্কে পাঠকের মনে আর কোন সংশয়ই থাকবে না।

রবীন্দ্রনাথ পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরের সংগে এক, দুই, চার বা তদধিক মাত্রা বা অক্ষর যোজনা ক'রে বহু বিচিত্র ছন্দের সৃষ্টি ক'রেছেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে অষ্টাদশ-অক্ষর-বা-মাত্রাযুক্ত ছন্দের প্রয়োগ সুপ্রচুর। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্ :

হে আদি জননী সিন্ধু। বসুন্ধরা। সন্তান তোমার।

চরণটি স্পষ্টই অক্ষরবৃত্ত। এখানে পয়ারের আট এবং ছয়-অক্ষরের দু'টি পর্বের মধ্যে চার-অক্ষরের একটি তৃতীয় পর্ব সংযোজিত হ'য়েছে। সমুদ্রের ব্যাপ্তি ও গাম্ভীর্যের ব্যঞ্জনার পক্ষে এই দীর্ঘায়ত ছন্দ খুবই সুষ্ঠু এবং সংগত সন্দেহ নেই। ঝোঁকের চালে চলে না ব'লে প্রসারের রূপটি এতে সহজে ফুটে ওঠে। ঠিক এই ছন্দেই লেখা কবি সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রচিত শোক-গাথাটি ; 'উর্বশী', 'তপোভংগ' প্রভৃতি তাঁর অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতাই এই আঠার-অক্ষরের ছন্দে লেখা। কিন্তু এই নূতন পর্বটিকে পৃথক্ না ক'রে ছয়-অক্ষরের দ্বিতীয় পর্বটির সংগে মিলিয়ে দেওয়াই বোধ হয় ভালো, কারণ তাতে ছন্দো-রচনায় স্বাধীনতা অনেক বেড়ে যায়, অথচ শ্রুতি-মাধুর্যের দিক থেকেও বিশেষ কোন হানি হয় না। রবীন্দ্রনাথের এইজাতীয় রচনায় সংযোজিত নূতন অংশটিকে স্বতন্ত্রভাবে দেখান গেলেও অনেকস্থলেই তাকে দ্বিতীয় পর্বের

অংগীভূত করা হ'য়েছে। 'তপোভংগ' কবিতাটির প্রথম চরণটি আলোচনা ক'র্লেই তা বোঝা যাবে। তিন পর্বে বিভক্ত ক'রলে লাইনটি দাঁড়ায় এইরূপ :—

যৌবন-বেদনা-রসে। উচ্ছল আ। মার দিনগুলি

কিন্তু 'উচ্ছল আ' এই অংশটিকে একটি স্বতন্ত্র পর্বরূপে গণ্য করা শুধু অসংগত নয়, অসম্ভবও।

এখন দেখা যাক্ পর্বে পর্বে শ্বাসাঘাত দিলে এই ছন্দই কেমন ক'রে চতুষ্পর্বিক পাঁচমাত্রার ছন্দে নব সৌন্দর্যে ঝংকৃত হ'য়ে ওঠে :

এ´কদা তুমি। অ´ংগ ধরি'। ফি´রিতে নব। ভু´বনে

কুসুম-রথে। মকরকেতু। উড়িত মধু। পবনে

শেষ পর্বটী পূর্ণ পাঁচমাত্রার না হওয়ায় একে অপূর্ণপদী বলা হয়। 'তোমারে পাছে সহজে বুঝি', 'আবার মোরে পাগল কোরে,' 'শ্রাবণ-ঘন গহন মোহে,' প্রভৃতি কবিতায় এই ছন্দ নব নব রূপধেয় ধারণ ক'রেছে। এর পর ছ'মাত্রার আরো দু'টি ছন্দ পরীক্ষা করা যাক্ :

ন´মো নমো নম। সু´ন্দরী মম। জ´ননী জন্ম। ভূ´মি

গংগার তীর। স্নিগ্ধ সমীর। জীবন জুড়ালে। তুমি

এবং

রু´দ্র, তোমার। দ´ারুণ দীপ্তি। এ´সেছে দুয়ার। ভে´দিয়া

বক্ষে বেজেছে। বিদ্যুৎ-বাণ। স্বপ্নের জাল। ছেদিয়া

ছন্দ দুটি স্পষ্টই মাত্রাবৃত্ত অর্থাৎ এখানেও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ব'লে ধরা হ'য়েছে ;—যেমন 'রুদ্' এবং 'র' এই দুটি অক্ষরকে তিনমাত্রা ব'লে গণ্য করা হ'য়েছে। নীচে নমুনাহিসাবে কবির রচনা থেকে সাত, আট ও দশমাত্রার কয়েকটি ছন্দ তুলে দিলাম :—

সাতমাত্রার যথা : কেবল আঁখি দিয়ে। আঁখির সুধা পিয়ে।

হৃদয় দিয়ে হৃদি। অনুভব

আটমাত্রার যথা : নিদ্রালস আঁখিসম। ধীরে যদি মুদে আসে।
শ্রান্ত এ জীবন

অথবা,

ভরাপালে চলে যায়। কোনদিকে নাহি চায়।
ঢেউগুলি নিরুপায়। ভাঙে দুধারে

দশমাত্রার যথা : হের ঐ ধনীর দুয়ারে। দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।

'বলাকা' প্রভৃতি কাব্যের অসমমাত্রিক ছন্দে প্রত্যেক চরণে পর্ব-সংখ্যার এবং প্রতিপর্বে মাত্রা-সংখ্যার সমতা নেই ; কিন্তু কবির রূপদক্ষতা এমনি অপূর্ব যে ছন্দোবন্ধে বিন্দুমাত্র অসংগতি কোথাও কানে বাজে না, অথচ একই ছন্দের পৌনঃপুনিকতা থেকে যে অবসাদ আসা স্বাভাবিক তা' থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। ছন্দের অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য থেকে ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা আপনিই এসে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দেও অন্ত্যানুপ্রাস তুলে দেন নি। চরণে চরণে মিল থাকায় সুরটা শেষ হয়ে গেলেও তার রেশটা সহজে মিলিয়ে যায় না। দৃষ্টান্ত :—

সন্ধ্যার কবরী হ'তে খসা ।১০
একটি রঙিন আলো। কাঁপি থরথরে ।৮।৬
ছোঁয়ায় পরশমণি। স্বপনের পরে। ।৮।৬
সেই আলো। অজানা সে উপহার ।৪।৮
সেই তো তোমার ।৬

বাঙ্‌লা ভাষার নিজের একটি বিশেষ ধ্বনি-স্বরূপ আছে। কবি ব'লেছেন এই ধ্বনিবৈশিষ্ট্য সে পেয়েছে হসন্তবর্ণের সংযোগে। হিন্দি, ওড়িয়া প্রভৃতি অন্য কোন প্রাদেশিক আর্যভাষায় হসন্ত-বর্ণের এত সমারোহ নেই। বাঙ্‌লা ছন্দে এই হসন্ত-ধ্বনিগুলি ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারলে ছন্দের আদল যায় বদলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ হসন্তধ্বনিতে স্তনিত একটি প্রসিদ্ধ কবিতার দু'এক চরণ তুলে দিলাম :—

দুঃখের্ বর্ষায়্ । চক্ষের্ জল্ যেই । নাম্লো
বক্ষের্ দর্জায়্ । বন্ধুর্ রথ্ সেই । থাম্লো

কিংবা তাঁরই রচিত আর দু'টী চরণ নেওয়া যাক্ :—

দূর্ সাগরের্ । পারের্ পবন্ । আস্বে যখন্ । কাছের্ কূলে
রঙীন্ আগুন্ । জাল্বে ফাগুন্ । মাত্বে অশোক্ ।
সোনার্ ফুলে ।

হসন্তের ধাক্কায় এদের ছন্দ উপলহত স্রোতের মতই উচ্ছলবেগে ছুটে চ'লেছে।

তাঁর বিখ্যাত জাতীয় সংগীত—

'জনগণ. মন অধি । নায়ক. জয় হে । ভারত. ভাগ্যবি । ধাতা'র চরণগুলি বিশ্লেষণ কর্লে আমরা এতে সংস্কৃত ছন্দের প্রভাব স্পষ্টই লক্ষ্য করি। এটি আটমাত্রার ছন্দ, সংস্কৃতের নিয়মানুসারে এখানে 'আ'কার, 'এ'কার প্রভৃতি দীর্ঘস্বরগুলিকে দ্বিমাত্রার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ; যেমন 'নায়ক জয়হে' এই পর্বে 'না' এবং 'হে'-কে দ্বিমাত্র ধরা হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথের খুব কম রচনাতেই কিন্তু এই প্রভাবমাত্রিক রীতি অনুসৃত হ'য়েছে। 'নায়ক' 'ভারত' প্রভৃতি পদগুলি বাঙলায় ব্যঞ্জনান্তরূপে উচ্চারিত হ'লেও সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী স্বরান্ত ক'রেই প'ড়তে হবে।

আর একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্ :

নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র
তব—লৌহ গলন । শৈল দলন । অচল চলন । মন্ত্র
কভু—কাষ্ঠ লোষ্ট্র । ইষ্টক দৃঢ় । ঘন পিনদ্ধ । কায়া
কভু—ভূতল জল । অন্তরীক্ষ । লঙ্ঘন লঘু । মায়া ।

দীর্ঘস্বরের নিয়মিত বিন্যাসে এবং যুক্তাক্ষরের বাহুল্যে ছন্দটি হিল্লোলিত এবং গঠন-সৌষ্ঠবে প্রাকৃতপিংগলের 'হীর'-ছন্দের অনুরূপ। ব্রজবুলি ছন্দেও দীর্ঘ-

স্বরের দীর্ঘতা প্রায়ই উপেক্ষিত হয় না এবং ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরকে সাধারণত দ্বিমাত্র ব'লেই গণ্য করা হয়; যতি-নির্দেশক ঝোঁকও সেখানে সুস্পষ্ট: তবেকোন কোন সময়ে দীর্ঘস্বরগুলি সংকোচ-হ্রস্ব এবং হ্রস্বস্বরগুলি প্রসারদীর্ঘ হয়। দৃষ্টান্ত:

পতিবরতা বিনু। ভীখ যব লেয়ব।
যোগি-বরত হোয়ে। নাশ।
তাকর বচন শু। নিতে তনু পুলকিত।
ধাই কহল বধূ। পাশ।

উদ্ধৃত চরণগুলির প্রথমটীতে 'তা'-এর আকার এবং 'লেয়ব'র 'এ'কারকে দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্র ধরা হয়েছে; কিন্তু 'ভীখ' শব্দের 'ঈ'কার একমাত্র বলে গণ্য হ'য়েছে। নিম্নলিখিত চরণদুটিতে কিন্তু নিয়মের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমও লক্ষিত হয় না:

মন্‌দির। বাহির। কঠিন ক। পাট্‌
চলইতে। পঙ্‌কিল। শঙ্‌কিল। বাট

ভানুসিংহের পদাবলিতে রবীন্দ্রনাথ এই 'ব্রজবুলি' ছন্দই নিরতিশয় নিষ্ঠার সংগে অনুসরণ ক'রেছেন। যথা—

গোপবধূজন। বিকশিত যৌবন।
পুলকিত যমুনা। মুকুলিত উপবন।
নীল নীর পর। ধীর সমীরণ।
পলকে প্রাণমন। খোয়।

এটি আটমাত্রার ছন্দ—দীর্ঘস্বরকে সর্বত্রই দ্বিমাত্র ধরা হয়েছে।

এইবারে স্বরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে দু'এক কথা ব'লে এই প্রবন্ধের উপসংহার ক'রবো। স্বরবৃত্ত ছন্দকে অতবড় একটা গালভরা নাম না দিয়ে ছড়ার ছন্দ ব'ললেও মন্দ হয় না। এই ছড়াজাতীয় ছন্দের বিশেষত্ব এই যে এগুলি আবৃত্তি করা হয় কতকটা সুরের ধরণে। মাত্রার অসংগতি যেখানে যেখানে থাকে—এবং প্রায়ই থাকে—সেখানে হ্রস্ব স্বরগুলিকে টেনে দীর্ঘ অথবা প্লুতরূপে উচ্চারণ

ক'রে মধ্যেকার ফাঁকগুলি ভরে' দেওয়া হয়, পাঁপ বড় থাক্‌লে ধ্বনিগুলিকে গায়ে গায়ে লাগিয়ে ছোট করে আন্‌তে হয়। বৈদিকেও এইরূপ 'স্বর' দিয়ে হিল্লোলিত ক'রে সামমন্ত্রগুলি গান করা হ'তো। এই প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতাটি থেকে দু'এক চরণ উদাহৃত হ'লো :—

আকাশ জুড়ে। মেঘের খেলা। কোথায় বা সী। মানা
দেশে দেশে। খেলে বেড়ায়। কেউ করে না। মানা
তারি সংগে। মনে পড়ে। ছেলেবেলার। গান্‌
বিষ্টি পড়ে। টাপুর টুপুর। নদেয় এল। বান্‌

এখানে না আছে অক্ষর-সংখ্যার স্থিরতা, না আছে মাত্রার সমতা; পর্বগুলি সব সমান-ওজনের নয়,—পর্বারম্ভে ঝোঁকেরও সুস্পষ্ট চিহ্ন নেই। অথচ এমনি টেনে টেনে, প্রয়োজনমত কখন ছোট ক'রে কখন বা বড় ক'রে, উঁচু ক'রে কিংবা নীচু ক'রে পর্বগুলি পড়া হয় যে কোন ফাঁক বা ফাঁকিই ধরা পড়ে না।

নিম্নোদ্ধৃত চরণগুলি ঐ ছড়াজাতীয় :—

আজকে দিনের। মেলা-মেশা।
যত খুসী। যতই নেশা।
সবার চেয়ে। আনন্দময়। ঐ মেয়েটির। হাসি।
এক পয়সায়। কিনেছে ও। তালপাতার এক। বাঁশী

এখানেও পর্বগুলি স্পষ্টতই ছয়মাত্রার, অথচ অক্ষর অথবা মাত্রা-সংস্থানের নিরিখে বিচার ক'র্‌লে তাদের মধ্যে সমতা অল্পই পাওয়া যাবে। কারুরূপের মধ্যে এমন একটি আশ্চর্য স্থিতিস্থাপকতা আছে যে অংগ-বিন্যাসের কোন অসংগতিতেই তার সুষমার হানি হয় না। সব ভাষাতেই এই ছড়াগীতির প্রচলন আছে, আমাদের দেশে তো এর ছড়াছড়ি। ঘুমপাড়ানি গান শুনে শুনে অতি শৈশব থেকেই আমাদের কান এতে অভ্যস্ত হয়ে আছে; কবির ভাষায়, এগুলি যেন আমাদের "শৈশবের মেঘদূত।"

সন্ধ্যা-সংগীত সম্বন্ধে কবি তাঁর জীবন-স্মৃতিতে লিখেছেন, "এইরূপে যখন

আপনমনে একা ছিলাম তখন, জানিনা কেমন করিয়া, কাব্য-রচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল।

এই স্বাধীনতার আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন একটা খালের মধ্যে সীধা চলে না—আমার ছন্দও তেমনি অঁাকিয়া বাঁকিয়া নানা মূর্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল।"

কবির জীবন-প্রভাতের সেই বন্ধনমুক্তির আনন্দ উত্তরকালে বাঙ্‌লা ছন্দে সৌন্দর্যের যে অপরূপ হিল্লোল তুলেছে—প্রকাশ-শৈলীর যে অতুলনীয় বৈচিত্র্য সম্পাদন ক'রেছে, বহুবর্ষ ধ'রে তা বাঙ্‌লা কাব্যকে রমণীয় ও বরণীয় ক'রে রাখ্‌বে।

রবীন্দ্র-কাব্যে প্রতীচ্য প্রভাব

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বহিঃপ্রভাবের কথা বলিতে গিয়া স্বভাবতই কুণ্ঠা বোধ করিতে হয়। এত বড় একজন কবি-পুরুষ যাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার রশ্মিসম্পাতে সাহিত্যের প্রত্যেকটি দিক আলোকিত হইয়াছে, তাঁহার কাব্য-রূপায়ণে আবার প্রভাব কিসের? বস্তুত, যাহা-কিছু তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাকেই রস-রক্তে পরিণত করিয়া আপনার করিয়া লইয়াছেন, কাজেই পংক্তি ধরিয়া অন্য কবির সহিত তাঁহার মিল খুঁজিতে গেলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

অনেক সমালোচক কীট্‌সের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা করিয়া রবীন্দ্র-কাব্যে কীট্‌সের প্রভাব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সে প্রয়াস বিশেষ সফল হয় নাই, কারণ উভয়ের কাব্য-ধর্মের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রকৃতির যে রূপ-সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়-পথে তাঁহার স্বপ্নাচ্ছন্ন কবিচিত্তকে স্পর্শ করিয়াছিল কীট্‌সের কাব্যে প্রধানত তাহারই বর্ণোজ্জ্বল আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মানুষের অভ্যন্তরে যে অদৃশ্য অস্পর্শ্য অতীন্দ্রিয় শক্তি বিরাজ করিতেছে, ইন্দ্রিয়সমূহের সমবেত শক্তিও যাহার তুলনায় একান্তই তুচ্ছ, তাহার অভিব্যঞ্জন তাঁহার কাব্যে অল্পই পাওয়া যায়। অপর পক্ষে, রবীন্দ্রনাথ রহস্যবাদী কবি, অদৃষ্ট-দ্রষ্টা ঋষি—বিশ্বচরাচরের প্রত্যক্ষগোচর রূপের অন্তরালে তিনি এক সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্ নিয়ন্তার অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন; তাঁহার কাব্যে সেই দিব্য অনুভূতির পরিচয় জ্বলন্ত অক্ষরে উৎকীর্ণ। অতএব তাঁহার কাব্যের মূল প্রেরণার মধ্যে কীট্‌সের কোন প্রভাব নাই। কেবল কয়েকটি গৌণ বিষয়েই কীট্‌স্ তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

অনেকে আবার তাঁহাকে শেলীর সগোত্র বলিয়াছেন। একসময় তাঁহার উপাধি হইয়াছিল 'বাঙ্‌লার শেলী'। কিন্তু শেলী ও রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির তুলনা

করিলে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই সুপ্রকট হইয়া উঠে। শেলী ছিলেন সর্বসংস্কারমুক্ত; রাজনৈতিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার ন্যায় চরমপন্থী বিপ্লবী অল্পই দেখা গিয়াছে। প্রচলিত রীতি-নীতিসমূহের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। প্লেটোর মতই তিনি প্রাচীনের ধ্বংস-স্তূপের উপর এক আদর্শ গণতন্ত্র গড়িয়া তোলার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। শেলীর সংগ্রামী মন ছিল কোন প্রকার আপোষ-মীমাংসার ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি? তিনি জাতীয় অগ্রগতির পরিপন্থী, অন্তঃসারশূন্য, জরাজীর্ণ প্রাচীন সংস্কারগুলিকে সমূলে উৎপাটনের সপক্ষেই মত দিয়াছেন সত্য, কিন্তু যে সকল প্রাচীন প্রথা মহান্, সুন্দর ও নির্দোষ, তাহাদের প্রতি তিনি অকুণ্ঠচিত্তে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বদেশের গৌরবময় ঐতিহ্য সম্বন্ধে দেশবাসীর ব্যাপক অবজ্ঞা এবং বিদেশীর অন্ধ অনুকরণই ভারতের বর্তমান অধোগতির জন্য সর্বতোভাবে দায়ী, ইহাই ছিল তাঁহার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। শেলীর সহিত রবীন্দ্রনাথের মৌলিক অনৈক্য এইখানেই। প্রগাঢ় প্রজ্ঞার বলে রবীন্দ্রনাথ এই পরম সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন যে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা-গুলিকে নির্বিচারে নির্বাসন দিলেই জাতীয় উন্নতি আসিবে না, তাহার জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির সমুচ্চয়। শেলীর মত তিনি বর্তমান ব্যবস্থার আমূল উচ্ছেদ কামনা করেন নাই। বহু রচনার মধ্যেই তাঁহার এই বিশ্বাসের প্রতিবিম্বন দেখিতে পাই।

শেলী সগর্বে তাঁহার ঈশ্বরে অবিশ্বাসের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তরুণ বয়সে অক্সফোর্ডে অধ্যয়নের সময় নাস্তিকতার সমর্থনে একটি পুস্তিকাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যসৃষ্টির মধ্যে তাঁহার ঘোষণার বিপরীত সুরটিই ধ্বনিত হইয়াছে; এক অলক্ষ্য অজ্ঞেয় শক্তিতে অটুট আস্থাই তাঁহার তথাকথিত নাস্তিকতাকে আচ্ছন্ন করিয়া আপনার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে। তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'Epipsychidion' পাঠ করিলে তাহার বহুস্থলেই আমরা কবির গভীর অতীন্দ্রিয় অনুভূতির পরিচয় লাভ করি।

এই দিক দিয়া শেলী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি সাদৃশ্য অনুভূত হয়। কীট্স্ শেলীর গুণানুরাগী ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কাব্য পূর্ব্বসূরির প্রভাবমুক্ত ও স্বতন্ত্র। কম্প্‌টন্ রিকেট্ বলিয়াছেন, "কীট্স্ সৌন্দর্য-ধর্ম ভিন্ন অন্য কোন ধর্মই মানিতেন না ; এই ধরণীই ছিল তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনার স্থল এবং এরূপ প্রগাঢ়ভাবে তিনি ইহাকে ভালবাসিতেন যে অন্য কোন চিন্তাই তাঁহার কাব্যে প্রতিমূর্ত হয় নাই।" অবশ্য এই মন্তব্যকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। কীট্‌সের কাব্যেও যে কোথাও অমর-জীবনের সম্বন্ধে কোন ইংগিত নাই তাহা নহে। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "Ode on a Grecian Urn" কবিতায় কি এই ভাবেরই আভাস মিলে না ?

জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল ভাব-রূপের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটিয়াছে, কবি-চিত্তের বিচিত্র চিত্র-শালায় তাহারা চিরকালের জন্য সংরক্ষিত হইয়াছে : কখন কোনটি হয়তো চেতনার স্তরে উদ্ভাসিত হইয়া কাব্যে রসায়িত হইয়াছে, কখন বা তাহারা অন্তরের অন্তস্তলে নিলীনই রহিয়া গিয়াছে। এমন কি তাঁহার কাব্যের স্তরবিভাগ করিয়া কোন বিশেষ যুগকে 'প্রভাবের যুগ' বলিয়া চিহ্নিত করাও সম্ভব নহে। জীবনের সর্বাপেক্ষা সৃষ্টি-সমৃদ্ধ অধ্যায়েই হয়তো অভাবিতরূপে একটি প্রভাব-চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই কালগত স্তর-বিভাগের দ্বারা প্রভাব-নির্ণয়ের চেষ্টা সফল হইবার নহে ; তথাপি আলোচ্য সন্দর্ভটিকে শৃঙ্খলা-সূত্রে গাঁথিবার জন্য কাব্য-রচনার কালক্রমটি যথা-সম্ভব অনুসরণ করা গেল।

কবিমানসের ক্রমবিকাশের ধারাটি অনুবর্তন করিলে আমরা কবির প্রথম-দিককার কাব্যগুলিতে পরবর্তী জীবনের সুগভীর অধ্যাত্মবোধের অস্তিত্বের কোন আভাসই পাই না। এইগুলির মধ্যে তিনি এমন সব বিষয়বস্তু নির্বাচন করিয়াছেন, যাহাদের আবেদন বিশেষ করিয়া কান্তিবৃত্তির কাছেই। উদ্দাম উচ্ছ্বাসের বর্ণরাগে রঞ্জিত করিয়া তরুণ কবি কল্পনার পটে চিত্রের পর চিত্র আঁকিয়া চলিয়াছেন, যেন গিরি-নির্ঝরিণী তরংগ-রংগে স্বত-উচ্ছুসিত কল-

সংগীত গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। তখন পর্যন্ত কবির কল্পনা বায়বীয় স্তর অতিক্রম করিতে পারে নাই, তাই উচ্ছল আবেগই হইয়াছে তাঁহার এই যুগের কাব্যের প্রধান অবলম্বন। মরিস্‌, রসেটি প্রভৃতি কবিগণের প্রভাব-চিহ্ন ইহাদের মধ্যে পরিস্ফুট। প্রাগ্‌-র‍্যাফেইল্‌ কবিগণ জীবনের বাস্তবতার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া মধ্য-যুগের লোক-গাথা ও রূপ-কথার মধ্যে ডুব দিয়াছিলেন; কীট্‌সের স্বপ্নাতুরতা ছিল তাঁহাদের নয়নে। তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখি এই স্বপ্ন-মগ্নতা। রূপ-কথা তথা অতীতের কল্প-লোকে ফিরিয়া যাইবার জন্য একটি অধীর আগ্রহ তঁহার বহু কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কড়ি ও কোমলে'র 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান' এবং 'মানসী'র 'একাল ও সেকাল' কবিতাদুইটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এইটি ছিল তাঁহার শিক্ষানবিশির কাল; যাহা-কিছু তাঁহার কল্পনার ক্ষুধা মিটাইয়াছে তাহাকেই কবি মায়া-রসায়নে রূপান্তরিত করিয়া নবীন বাণীমূর্তি দান করিয়াছেন।

'কড়ি ও কোমলে'র সংগে সংগেই রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের প্রথম-অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ধরা যাইতে পারে। 'মানসী' কাব্যখানি যুগ-সন্ধির সীমান্ত-ভূমির উপর অবস্থিত। প্রথম অধ্যায়ের কাব্যে কেবলমাত্র 'যৌবন-স্বপ্নের' সুরটিই আর সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া বিমূর্ছিত হইয়াছে, কিন্তু এই অধ্যায়ে কবি মর্ত্যভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং তাঁহার কাব্যে উদ্দাম উচ্ছলতার পরিবর্তে শান্ত সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ দীপ্তি বিকীর্ণ হইয়াছে। কবির কারু-কলা এই যুগে নীহারিকাবস্থা অতিক্রম করিয়া একটি সুনির্দিষ্ট সুস্থির রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহার এই যুগের রচনাতেও পূর্বোক্ত কবিদের এবং আরও কোন কোন্ কবির প্রভাব রহিয়াছে সত্য, কিন্তু কোথাও তিনি সচেতনভাবে বৈদেশিক কবিদের অনুকরণ করেন নাই। যেখানে তাঁহাদের কাব্যের সুর তাঁহার স্বকীয় কাব্যপ্রেরণার সহিত তালে তালে মিলিয়াছে, মাত্র সেইখানেই রবীন্দ্রনাথ তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। যাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার

প্রতিভার যাদুকরী শক্তিতে তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন; তাঁহার মৌলিক ভাবধারার সহিত আত্মীকৃত এই ভাবের কোন অসংগতিই কোথাও অনুভূত হয় না।

কবির এই যুগের কাব্যে আমরা রোম্যান্‌টিক পুনর্জাগরণের ও ভিক্‌টোরীয় যুগের কাব্যের লক্ষণগুলিই বিশেষভাবে বর্তমান দেখি। এই লক্ষণগুলিকে সংক্ষেপে এইভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :—(ক) প্রকৃতিকে চেতনা, বুদ্ধি ও অধ্যাত্ম-অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করা (যাহার নিদর্শন মিলে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌ ও কোলরিজের রচনায়), (খ) ধী-প্রসূত ঔৎসুক্য(intellectual curiosity) এবং সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক সত্যের ও পদ্ধতির উপযোজনা (টেনিসন্‌ যাহার দৃষ্টান্ত-স্থল), (গ) যাবতীয় প্রাচীন প্রথা এবং অন্ধসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (শেলী ও সুইন্‌-বার্ণের কবিতায় যাহার পরিচয় মিলে,—যদিও সুইন্‌বার্ণ্‌ কেবলমাত্র প্রাচীনত্বের জন্যই কোন প্রথার উচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন না, এবং এইখানেই শেলীর সহিত তাঁহার প্রধান পার্থক্য ও রবীন্দ্রনাথের সহিত সাদৃশ্য) এবং (ঘ) জীবনের সহজ-সরল প্রাথমিক সত্যসমূহের অকপট অনুভূতি।

উপরে রোম্যান্‌টিক্‌ ও ভিক্‌টোরীয় কবিদের যে সকল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হইল, তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট শেষোক্ত লক্ষণটি। রুসোর অনু-প্রাণনার ফলেই তাঁহারা এই দৃষ্টি-ভংগী লাভ করিয়াছিলেন। আধুনিক সভ্যতার জটিল রূপ, বড় বড় নগরীর যন্ত্র-জীবনের নিষ্প্রাণ কৃত্রিমতা রোম্যাণ্টিক্‌ কবিদের সুকুমার শিল্পচেতনাকে রূঢ়ভাবে আঘাত করিয়াছিল; তাই তাঁহারা তাঁহাদের কাব্যে প্রকৃতিমাতার ক্রোড়ে প্রত্যাবর্তনই যে সত্যকার অপাপবিদ্ধ আনন্দময় জীবনকে ফিরিয়া পাওয়ার একমাত্র উপায় এই সুরটি ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন। বর্তমান যুগের প্রথাসর্বস্ব প্রাণহীন জীবনের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণার এই সুরটি রবীন্দ্রনাথের যে কয়েকটি গীতি-কবিতায় অপূর্ব অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, 'মানসী'র 'বধূ' তন্মধ্যে অন্যতম। নগরের গণ্ডীবদ্ধ নিষ্প্রাণ জীবন-যাত্রায় অনভ্যস্ত গ্রাম্য বালিকা এই কৃত্রিম আবেষ্টনীর মধ্যে দিনের পর দিন

যাপন করিয়া ক্লিষ্ট ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার নিবিড় ক্লান্তি ও অপরিসীম মনোবেদনা কবিতাটিতে মর্মস্পর্শিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে,—

"হায়রে রাজধানী পাষাণকায়া!
বিরাট্ মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে,
ব্যাকুল বালিকারে নাহিক মায়া।
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথ-ঘাট,
পাখীর গান কই? বনের ছায়া?
কে যেন চারিদিকে দাঁড়ায়ে আছে,
খুলিতে নারি মন শুনিবে পাছে।
হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে!

* * *

কোথায় আছ তুমি কোথায় মাগো!
কেমনে ভুলে তুই আছিস্ হাঁ গো!

এই অংশটুকুর মধ্যে যেন ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থের "The Reverie of Poor Susan" কবিতার প্রতিধ্বনি মিলে,—

"'Tis a note of enchantment; what ails her? She sees
A mountain ascending, a vision of trees;
Bright volumes of vapour through Lothbury glide,
And a river flows on through the vale of Cheapside.
Green pasture she views in the midst of the dale,
Down which she so often has tripped with her pail;
And a single small Cottage, a nest like a dove's,
The one only dwelling on earth that she loves."

এই একই ভাব ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থের "Lines written in early Spring" নামক কবিতায় এবং "The world is too much with us" শীর্ষক

সনেট্‌টিতে বিশিষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। এই দুইটি কবিতায় প্রকৃতির প্রতি মানুষের উদাসীনতার জন্য কবি গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

মুক্ত বায়ুর জন্য আকুল আর্তি কীট্‌সের কাব্যেরও একটি বিশিষ্ট সুর। তাঁহার "To one who has been long in city pent" নামক সনেট্‌টিতে চিম্‌নির ধূম্রকলুষিত ইষ্টক-কাষ্ঠের কঠোর বেষ্টনী হইতে মুক্তি-লাভের আগ্রহ উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যেও এই সুরটি অনুস্যূত। ইহাকে কবির কল্পনা-বিলাস মনে করিলে ভুল হইবে, এই অনুভূতি তাঁহার অন্তরের গভীর প্রত্যয় হইতে উদ্ভূত। স্বীয় জীবনেই তিনি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়াছেন কর্মব্যস্ত নগরীর কোলাহল হইতে বহু দূরে বোলপুরে নিভৃত নীড় রচনা করিয়া। এইরূপে প্রকৃতিমাতার স্নেহসুকোমল অংকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তিনি আপনার অন্তরের প্রেরণাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন।

বাঙ্‌লার সামাজিক জীবন অন্ধ আবেগ, যুক্তিহীন সংস্কার আর বিচিত্র প্রথার সমাহার ; বাঙালী শুধু স্বপ্ন-জালবয়নেই পরিতৃপ্ত, স্বপ্ন সফল করিবার সাধনা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষ্যে উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন এবং ব্যংগ-কবিতাবলির মধ্য দিয়া এই কৃত্রিমতাদুষ্ট, হাস্যকর জীবনকে তীব্র আঘাত করিয়াছেন। 'মানসী'র এবং পরবর্তী কালের কল্পনার কৌতুক-কবিতাগুলি এই শ্রেণির রচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শেলীও তাঁহার 'Peter Bell the Third' নামক বিখ্যাত ব্যংগ-কবিতায় ইংলণ্ডের নাগরিক জীবনকে তীব্র শ্লেষের কশাঘাত হানিয়াছেন। এই কবিতাটি রবীন্দ্র-নাথের কৌতুক-কবিতাগুলিরই সগোত্র।

বাস্তবিক, বাঙালীর ক্ষতবিক্ষত আড়ষ্ট সভ্যতার বিরুদ্ধে অন্তরের বিরাগকে কাব্যে অভিব্যক্তি দান করিতে রবীন্দ্রনাথ কোন দিন পশ্চাৎপদ হন নাই। পল্লী-জীবনের সহিত নাগরিক জীবনের, প্রকৃতির সহিত যন্ত্রের, কলার সহিত বিজ্ঞানের সংঘর্ষই তাঁহার পরবর্তী কালে রচিত কয়েকটি বিখ্যাত সাংকেতিক নাটকের বিষয়-বস্তু হইয়াছে। তাই বলিয়া একথা যেন কেহ মনে না করেন

যে রবীন্দ্রনাথের সহজ প্রাকৃতিক জীবনের প্রতি আসক্তি এবং যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে এই বিরূপ মনোভাব পাশ্চাত্ত্য কবিদের প্রভাব ভিন্ন আদৌ গঠিত হইতে পারিত না। এই মনোভাব তিনি কতকাংশে প্রাচীন ভারতের তপোবনবাসী ঋষিদের চিন্তাধারা হইতেও উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন।

সরল প্রাকৃতিক জীবনের প্রতি অনুরাগ হইতেই পরে এক অভিনব মতবাদ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই মতবাদের প্রচারকেরা বলেন, প্রকৃতি মানুষের অনুভূতির জড় অবলম্বনমাত্র নহে, পরন্তু এক প্রবল জীবন্ত শক্তি যাহা মানুষের পরিবর্তমান ভাবধারার সহিত সুর মিলাইয়া আপনার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার 'The Modern Age' নামক প্রবন্ধে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন।

এই প্রকৃতি-প্রেম রোম্যান্‌টিক্ কবিদের কাব্যে 'মিস্‌টিসিজ্‌মে'র অংকুর হইয়া দেখা দিয়াছে। ইঁহাদের অনেক কবিতাতেই এই গভীরতর সুরের দ্যোতনা আছে। 'সোনার তরী' 'চিত্রা'র কোন কোন কবিতায় এই সুরের আভাসমাত্র লাগিয়াছে; কিন্তু তাহা এখনো পর্যাপ্ত গভীরতা ও স্থিরতা লাভ করে নাই। কীট্‌সের মতই, উদ্‌ভ্রান্ত কবি এখনো অশান্ত আবেগে সৌন্দর্যের স্তবগান করিয়া চলিয়াছেন। শুষ্ক যুক্তিবাদের (Cold philosophy) বিরুদ্ধে কীট্‌সের একটি স্বাভাবিক বিরাগ ছিল; ইহার পরুষ স্পর্শে মানুষের সুকুমার শিল্প-চেতনা ধ্বংস হইয়া যায় ইহা তিনি সত্যই বিশ্বাস করিতেন।* এই যুগে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও যেন এই বিশ্বাসেরই প্রতিবিম্বন দেখা যায়। 'মানস-সুন্দরী', 'বিজয়িনী' প্রভৃতি কবিতায় 'শোভন সংযমের' (fine restraint) পরিবর্তে 'মধুর

*দ্রষ্টব্য : Philosophy will clip an Angel's wings,
Conquer all mysteries by rule and line,
Empty the haunted air and gnomed mine-
Unweave a rainbow;—'Lamia'

অতিরেকে'র (fine excess) দ্বারাই তিনি শ্রোতৃ-হৃদয়কে মুগ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। ভাষা-বিলাসের দিক দিয়া একমাত্র সুইন্‌বার্ণের সংগীতময় ছন্দের সহিত এবং চিত্রাংকন-নৈপুণ্যের দিক দিয়া রসেটির অনবদ্য কাব্য-চিত্রাবলীর সহিতই ইহাদের তুলনা চলে।

কিন্তু জীবনের ক্রান্তি-কক্ষে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কবি যখন উপনিষদের অক্ষয় আলোকের সন্ধান পাইলেন—শেলী, ব্লেক্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্ প্রভৃতির অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সহিত যখন দিব্যদ্রষ্টা ঋষিদের অধ্যাত্মচিন্তার ধারাটি আসিয়া মিশিল, তখন প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাবে দেখা দিল অদ্ভুত পরিবর্তন। উপনিষদের ঋষি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুর মধ্যেও, মানব ও প্রকৃতির মধ্যে মিলন-সূত্র-রচনাকারী এক সর্বব্যাপী সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছিলেন। প্রকৃতির স্বরূপ-উপলব্ধির এই অভিনব পদ্ধতিটি একান্তভাবেই ভারতের নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথ পিতৃ-পিতামহের অমর চিন্তার অফুরন্ত উৎস হইতেই লাভ করিয়াছিলেন এই প্রকৃতি-দৃষ্টি, যদিও ব্লেক্ প্রভৃতির মধ্যেও অনুরূপ ভাবের আভাস মিলে। কবি এখন আর শুধু দূর হইতে প্রকৃতির সৌন্দর্য সম্ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত নহেন, তাহার সহিত আপন সত্তাকে সম্পূর্ণ মিশাইয়া দিয়া তিনি সেই নিঃসীম সৌন্দর্য-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছেন। 'বলাকা'র 'ছবি', 'উৎসর্গে'র 'প্রবাসী' প্রভৃতি কবিতা হইতে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এই বারে শেলীর প্রেম-বাদের সহিত রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-বাদের সাদৃশ্য সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। শেলীর নিকট 'প্রেম' একটি অন্তর্গূঢ় অতীন্দ্রিয় শক্তি যাহা সমস্ত পদার্থকেই অপার্থিব সৌন্দর্যে বিমণ্ডিত করিয়া তুলে। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার 'জীবনদেবতা'কে এক অলক্ষ্য অনির্দেশ্য শক্তিরূপেই কল্পনা করিয়াছেন, যাহা কবির অন্তরাত্মাকে অনুপ্রেরণা দান করে, 'দুঃখসুখের লক্ষ ধারা'র মধ্য দিয়া তাঁহাকে পূর্ণতার পথে লইয়া যায়, সুন্দরের মন্ত্রে তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া

তোলে। এই জীবনদেবতা কবির সত্তার মধ্যেই প্রসুপ্ত একটি প্রেরণা; ইহা হৃদয়ের নিরুদ্ধ বাণীকে অভিব্যক্তি দান করে, অন্তরে আনিয়া দেয় উত্তাল আলোড়ন। কবির জীবন-দেবতা সম্বন্ধে ধারণা 'অন্তর্যামী'র এই কয়টি পংক্তিতে বাঙ্ময় হইয়াছে,—

"নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়, ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়
নূতন বেদনা উঠে বেজে তায় নূতন রাগিণী ভরে।
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা, যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানিনা এনেছি কাহার বারতা কারে শুনাবার তরে!
কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার, কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বারবার দেখে তুমি হাস বুঝি!
কে গো কোথা তুমি রয়েছ গোপনে আমি বৃথা মরি খুঁজি!"

ইহার সহিত শেলীর "Hymn to Intellectual Beauty"র এই অংশটির তুলনা করিলেই উভয় কবির সাধর্ম্য স্পষ্ট হইবে,—

"The awful shadow of some unseen Power—
Spirit of Beauty, that dost consecrate
With thine own hues all thou dost shine upon
Of human thought and form,—where art thou gone?
Why dost thou pass away and leave our state,
This dim vast, vale of tears, vacant and desolate?"

শেলীর মানস-সন্ততির অন্যতম, ভিক্টোরীয় যুগের একজন বিশিষ্ট কবি স্যুইনবার্ণ রবীন্দ্রনাথের এই যুগের কয়েকটি অতিখ্যাত কবিতায় অল্পাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। 'উর্বশী'র কয়েকটি স্তবক স্যুইনবার্ণের গ্রীক-পুরাণোক্ত প্রেম-জননী 'আফ্রোদিতে'র বর্ণনাকে স্মরণ করাইয়া দেয়: উর্বশীর মত গ্রীক দেবীও সৃষ্টির আদি প্রভাতে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। স্যুইনবার্ণের কবিতা হইতে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করিলেই 'উর্বশী'র সহিত তাহার সাদৃশ্য যে কত চমকপ্রদ, তাহা উপলব্ধি হইবে, যেমন,—

"A perilous goddess was born ;
And the waves of the sea as she came
Clove, and the foam at her feet,
Fawning, rejoiced to bring forth
A fleshly blossom, a flame
Filling the heavens with heat
To the cold white ends of the north."

* * * * * *

"White rose of the white water, a silver splendour, a flame
Bent down unto us that besought her and earth grew sweet with her name.
For thine came weeping, a slave among slaves, and rejected but she
Came flushed from the full-flushed wave and imperial her foot on the sea.
And the wonderful waters knew her, the wind and the viewless ways
And the roses grew rosier and bluer the sea-blue stream of the bays."

উদ্ধৃত পংক্তিগুলি 'উর্বশী'র এই অংশটি স্মরণ করাইয়া দেয় না কি ?

"আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে
ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে,
তরংগিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজংগের মত
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি অবনত ;
কুন্দ-শুভ্র, নগ্নকান্তি, সুরেন্দ্র-বন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা !"

শুধু ভাববস্তু নহে, ধ্বনিলহরীর দিক দিয়াও উভয় কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য সুগভীর ; এই সাদৃশ্যকে আকস্মিক বলিয়া কিছুতেই মনে করা যায় না।

অভিনিবেশসহকারে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই একটা প্রবল আশাবাদের সুর তাহার মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। কঠিনতম সংকট, দুঃসহতম দুঃখের মধ্যেও একটি মংগলময় সত্তার প্রতি কবির অটল বিশ্বাস একমুহূর্তের জন্যও শিথিল হয় নাই। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, জীবনের তপস্যায় সাময়িকভাবে ব্যর্থতা আসিতে পারে, অন্তরের আশা-স্বর্গ ক্ষণিকের জন্য ম্লান হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু সংশয়ের কুহেলী-জাল ছিন্ন করিয়া, সব বিশৃঙ্খলাকে সংদমিত করিয়া একদিন অনন্ত-সম্ভাবনাপূর্ণ সৌরকরদীপ্ত ভবিষ্যতের আবির্ভাব হইবেই। আশা ও বিশ্বাসের এই ফল্গু-ধারাটি তাঁহার সমগ্র কাব্যে একটি অনির্বাচ্য শক্তি ও সৌন্দর্য সঞ্চার করিয়াছে।

কবি কোনদিনই বাস্তবজীবনের সংঘাত হইতে দূরে সরিয়া অলস কল্পনা ও নৈরাশ্যবাদের লূতাজাল বয়ন করেন নাই। দুঃখজর্জর মানবকে তিনি চিরদিন অক্লান্তভাবে আশা ও আশ্বাসের সঞ্জীবন-মন্ত্র শুনাইয়া গিয়াছেন। এই সুপ্রতিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ আশাবাদের দিক দিয়া তাঁহার সহিত ব্রাউনিঙের যথেষ্ট সাধর্ম্য ও সাদৃশ্য আছে। রবীন্দ্রকাব্যে ব্রাউনিঙের প্রভাবও নিতান্ত নগণ্য নহে, যদিও তাঁহার আদি পর্বের কাব্যগুলিতে এই প্রভাব-চিহ্ন বিশেষ লক্ষিত হয় না। কবি-মানস ও কাব্যকলা সুপরিণত রূপ ধারণ করিবার মুখেই ইহা সুস্পষ্টরূপে দেখা দিয়াছে। 'মানসী'র অনেকগুলি কবিতাতেই ব্রাউনিঙের সুর ওতপ্রোত হইয়া আছে। 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় অন্তরাবেগের মিস্টিক্ দিক্‌টি যেরূপ মনোজ্ঞ কাব্যরূপে মণ্ডিত হইয়াছে, তাহা ব্রাউনিঙেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। ব্রাউনিঙের 'Two in the Campagna', 'Evelyn Hope' প্রভৃতি কবিতায় এই মিস্টিক্ পরিমণ্ডলই বিরাজমান। নিছক সংবেদনার দিক দিয়া এই সমস্ত কবিতার সহিত 'অনন্ত প্রেমে'র বৈধর্ম্য নাই বলিলেই চলে। 'Two in the Campagna' এবং 'অনন্ত প্রেম' হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিলেই ইহা পরিস্ফুট হইবে।

Two in the Campagna :—

"I wonder do you feel today
As I have felt since hand in hand

We sat down on the grass, to stray
In spirit better through the land,
This morn of Rome and May ?
For me, I touched a thought I know
Has tantalised me many times,
(Like turns of thread the spiders throw
Mocking across our path) for rhymes
To catch and let go.
.................Only I discern
Infinite passion and the pain
Of finite hearts that yearn."

অনন্ত প্রেম :—

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির-রজনী ভেদিয়া
তোমারি মুরতি এসে,
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে !
আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে,
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হ'তে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহ-বিধুর নয়ন-সলিলে
মিলন-মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য-নূতন সাজে !

পরবর্তী অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ মাধুর্যরসপূর্ণ জীবন হইতে বিদায় লইয়া একটি ভাব-গভীর বেদনা-করুণ সুরে আপনার বীণা বাঁধিয়াছেন। 'কল্পনা'-কাব্যে আমরা কবি-মানসের একটি নূতন সুর-বিন্যাস লক্ষ্য করি। 'চিত্রা'-'সোনার তরী'-যুগের কাব্যপ্রেরণা তাঁহাকে যে রূপময় সৌন্দর্য-সৃষ্টির আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল কবি আজ বুঝিয়াছেন, 'এহ বাহ্'—ইহাই জীবনের চরম অথবা পরম প্রাপ্তি নহে। তাই বহুস্মৃতিচিহ্নিত পুরাতন পথ-রেখা মুছিয়া ফেলিয়া তিনি অপ্রমত্ত অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। যে পাখী দিনের দীপ্ত আলোকে রূপ-মৃগয়ায় দিক হইতে দিগন্তরে উড়িয়া বেড়াইয়াছে, সন্ধ্যার দো-আলোয় সেকি আপনার নিরালা নীড়টিতে ফিরিয়া স্মৃতির স্বর্ণতন্তু দিয়া শুধু স্বপ্নের ইন্দ্রজাল বুনিবে? 'দুঃসময়' কবিতায় যে সংশয়ের সুরটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, 'বর্ষশেষ' কবিতায় সেই সংশয়-জড়িমা কাটিয়া গিয়া একটি নির্দ্বন্দ্ব বলিষ্ঠ বিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। কালবৈশাখীর বাত্যা-নৃত্যে কবি একটি নূতন বার্তার সন্ধান পাইয়াছেন। তাই ক্লান্ত-কাতর কবি-চিত্ত বর্ষশেষের এই ঝড়কে নূতন জীবনের প্রতীকরূপে আহ্বান জানাইয়াছে। এই কবিতাটির মধ্যে বিপ্লবী কবি শেলীর 'Ode to the West Wind'-এর প্রভাব চিহ্ন সুস্পষ্ট। উভয় কবিতা একত্র রাখিয়া পাঠ করিলে আমরা স্বতই উপলব্ধি করি যে রবীন্দ্রনাথ শেলীর এই অপরূপ গীতি-কবিতাটির রসধারা আকণ্ঠ পান ও পরিপাক করিয়া আপন লেখনীতে তাহাকে নবজন্ম ও নবকলেবর দান করিয়াছেন। উভয় কবিতাই যেমন বাণী-বৈভব ও শিল্প-সৌষ্ঠবের চূড়ান্ত নিদর্শন, তেমনি তাহাদের অন্তর্নিহিত মানবিক সুরের ব্যঞ্জনাও আমাদের হৃদয়তন্ত্রীকে তুল্যরূপে ঝংকৃত করিয়া তুলে। উভয়ের মধ্যেই এরূপ উপাদান আছে, যাহার আবেদন আমাদের মস্তিষ্কের নিকট। উভয় কবিতার ভিতরেই একটি দুঃসহ ও দুর্বার প্রেরণা আছে, যাহা বাণী-বন্যায় ধরিত্রীর জীর্ণ, বিবর্ণ, পুরাতন রূপটির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিয়া নূতন জগৎ ও জীবনের সূচনা করিতে চাহে। উভয় কবিই ঝটিকার প্রচণ্ড শক্তিকে মানবের কর্মধারার প্রতিটি শাখাপ্রশাখায়

সঞ্চারিত হইবার আহ্বান জানাইয়াছেন। আমরা পাঠকদিগকে শেলী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্ধৃত অংশ-দুইটি তুলনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

Ode to the West Wind :—

" O wild West Wind, thou breath of autumn's being,
Thou from whose unseen presence the leaves dead
Are driven, like ghosts from an enchanter fleeing,
Yellow and black and pale and hectic red,
Pestilence-stricken multitude."

বর্ষশেষ :—

"গাও গান প্রাণভরা ঝড়ের মতন উর্ধ্ববেগে
অনন্ত আকাশে।
উড়ে যাক্, দূরে যাক্, বিবর্ণ, বিশীর্ণ, জীর্ণ পাতা
বিপুল নিঃশ্বাসে!"

'কল্পনা'র 'হতভাগ্যের গান' কবিতায় আর এক জন বিষাদ-বাদী কবি টমাস্ গ্রে-র প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। এই কবিতাটির কয়েকটি ছত্র গ্রে-র 'Hymn to Adversity'কে সম্মুখে রাখিয়া রচিত বলিয়াই মনে হয়। যেমন,—

Hymn to Adversity :—

"Scared at thy frown terrific, fly
Self-pleasing Folly's idle brood,
Wild Laughter, Noise, thoughtless Joy
And leave us leisure to be good.
Light they disperse, and with them go
The summer Friend, the flatt'ring Foe.

হতভাগ্যের গান :—

লুকোক্ তোমার ডঙ্কা শুনে
কপট সখার শূন্য হাসি।

পালাক্ ছুটে পুচ্ছ তুলে
মিথ্যে চাটু মক্কা কাশী ॥

'ক্ষণিকা' ও 'কল্পনা'র অল্পকাল পরেই 'শিশু'র কবিতাগুলি রচিত হয়। এই কাব্যটি কবি-মানসের মূল ধারা হইতে কতকটা বিচ্ছিন্ন হইলেও বিশিষ্ট; ইহার মধ্যেও, কল্পনা ও ক্ষণিকার মত, একটি স্বচ্ছ ও নির্লিপ্ত দার্শনিক দৃষ্টির পরিচয় মিলে। শিশুর উক্তিগুলি আসলে কবি-প্রৌঢ়োক্তি; শিশুর জন্ম ও জীবন-কথা তাহারই জবানি বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাব-কল্পনার উপর প্রৌঢ় 'রবি'র দার্শনিকতার রশ্মি-সম্পাত ইহাকে একটি রহস্যঘন অপরূপতা দান করিয়াছে। এই দিক্ দিয়া এই কাব্যের উপর ভিক্‌টোরীয় যুগের এক জন অপেক্ষাকৃত অখ্যাত কবি জর্জ্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড-এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ম্যাক্‌ডোনাল্ড্-এর কাব্য-প্রেরণা ছিল কেল্‌টিক্; কাজেই কেল্‌টিক্ দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও রহস্যময়তা তাঁহার কাব্যের সর্বাংগে বিচ্ছুরিত। তাঁহার শিশু-কবিতাগুলির সহিত রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'-কাব্যের কল্পনাগত সাধর্ম্য আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির সরলতা যেমন প্রকৃত নহে, প্রতীয়মানমাত্র এবং তাহাদের চারিদিকে যেমন একটি রহস্যময় পরিবেশ বিরাজিত, ম্যাক্‌ডোনাল্ড্-এর কবিতা-গুলিরও (Poems for children) অবিকল সেইরূপ। তাঁহার 'Where did you come from, Baby dear ?' কবিতাটি পাঠ করিলে রবীন্দ্রনাথের 'জন্ম-কথা'র কথা স্বতই মনে পড়ে। উভয়ের মধ্যে প্রকাশগত সাদৃশ্য বিশেষ না থাকিলেও অনুভূতির দিক দিয়া উহাদের ঐক্য উপেক্ষণীয় নহে। উভয় কবিতাই ভাগবত প্রত্যয়ের সুষমায় সমুজ্জ্বল; শিশু-জীবনকে উভয়েই দেখিয়াছেন বিশ্ব-জীবনের অংশরূপে : 'সবার ছিলি আমার হ'লি কেমনে ?' —এই প্রশ্নের উত্তর মিলে 'Out of the everywhere into here,' 'God thought about you and so I am here' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের শিশু যেমন 'জগতের স্বপ্ন হইতে আনন্দ-স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছে' এই শিশুর সৌন্দর্যও তেমনি আসিয়াছে 'Out of the same box as cherubs' wings'। তাহার

পর, রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' যেমন রাঙাঘোড়ায় চড়িয়া রাঙা ধুলায় মেঘ উড়াইয়া 'টগ বগিয়ে' ছুটিয়া বেড়াইবার স্বপ্ন দেখে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্-এর Willieও তেমনি বলে, 'I shall gallop and shout and call, waving my shining sword'। উভয় কবির মধ্যে এই প্রকৃতিগত ঐক্য কি একান্তই আকস্মিক?

ইহা ভিন্ন 'শিশু'-কাব্যের প্রেরণার মূলে মিষ্টিক্ কবি ব্লেকের 'Songs of Innocence & Experience'-এর প্রভাবও নগণ্য নহে। যথাক্রমে ব্লেক্ ও রবীন্দ্রনাথের দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিলেই বুঝা যাইবে উভয়ের মধ্যে কল্পনাগত সাদৃশ্য কত গভীর।

ব্লেক্ :

"But to go to school in a summer morn,
O! it drives all joy away;
Under a cruel eye outworn,
The little ones spend the day
In sighing and dismay."—The School Boy: Songs of Experience.

রবীন্দ্রনাথ :

"আজকে আমি লুকিয়েছি, মা, পুঁথিপত্তর যত
পড়ার কথা আর বোলো না! যখন বাবার মত
বড় হ'বো, তখন আমি প'ড়বো প্রথম পাঠ;
আজ বল্, মা, কোথায় আছে তেপান্তরের মাঠ।"

'শিশু'র 'বিদায়' কবিতাটির সহিত আবার টেনিসন্-এর 'New Year's Eve' কবিতাটির ভাবগত আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। মূঢ়-মধুর, গূঢ়-গভীর শিশু-মনের সুকুমার কল্পনাটি উভয় কবিই অপরূপ সৌন্দর্যে রূপায়িত করিয়াছেন। টেনিসন্-এর—

"Though I cannot speak a word,
I shall harken what you say,

And be often, often with you,
When you think I'm far away."

প্রভৃতি পংক্তিগুলি কি 'বিদায়ে'র—

"হাওয়ার সংগে হাওয়া হ'য়ে
যাব মা, তোর বুকে ব'য়ে,
ধরতে আমায় পারবি নে তো হাতে ;
জলের মধ্যে হ'ব মা, ঢেউ
জান্‌তে আমায় পারবে না কেউ,
স্নানের বেলা খেলব তোমার সাথে।"

প্রভৃতি চরণগুলি স্মরণ করাইয়া দেয় না ?

'নৈবেদ্য' হইতে কবি-জীবনের এক সম্পূর্ণ নূতন পর্যায় স্থরু হইয়াছে। এখন হইতে বাস্তব-জীবনের সহিত তাঁহার সংযোগ ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে ; তিনি 'সকল সত্যকে রসময় করিয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিবার সাধনায়, সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিকে, মানবপ্রকৃতিকে, মানব-ইতিহাসকে একের মধ্যে অখণ্ড করিয়া বোধ করিবার সাধনায়' নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন। 'গীতাঞ্জলি,' 'গীতিমাল্য' পর্যন্ত এই যুগের অনুবৃত্তি চলিয়াছে। এই যুগে কবি একান্তভাবে উপনিষদের মন্ত্রেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণে তাঁহার এই যুগের রচনায় প্রতীচ্য প্রভাব নিতান্তই অল্প। কিন্তু তাহা যে তাঁহার কবি-মানস হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয় নাই, 'গীতাঞ্জলি'র

"সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগিনি।
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী।"

গানটি হইতে তাহার প্রমাণ মিলিবে। ইহার বিষয়বস্তু 'নিউ টেস্টামেন্টে'র 'Parable of the Ten Virgins' এর কাহিনীর সহিত প্রায় অভিন্ন,

কেবলমাত্র রূপায়ণের বিশিষ্টতাই বহিঃপ্রভাবের ছায়াটিকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে।

'বলাকা'-কাব্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের পুনরায় দিক্-পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। বিশ্বসৃষ্টির অভ্যন্তরে কবি একটি অশ্রান্ত-গতি-ধারার অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন; সমগ্র বলাকা-কাব্য এই প্রত্যগ্র প্রত্যয়ের আলোকে উদ্‌ভাসিত। এই প্রসংগে স্বভাবতই গতি-বাদী (vitalist) দার্শনিকদের, বিশেষ করিয়া 'বের্গ্‌স'র, কথা আসিয়া পড়ে। 'গীতাঞ্জলি', 'গীতি-মাল্যে'র পরে সহসা এই দৃক্-পরিবর্তনে আমরা বিস্ময় বোধ করি, কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। 'নৈবেদ্য' এবং তৎপরবর্তী অধ্যাত্ম কাব্য-গুলির মধ্যে 'অনন্ত-প্রাণে'র (নৈ. ২৬) যে ধারণা উপনিবদ্ধ হইয়াছে, বের্গ্‌স'র 'elan vital'-তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তাহাই 'বলাকা'য় একটি অভিনব ভাব-রূপ লাভ করিয়াছে।

বের্গ্‌স'র মতে বিশ্ব-সৃষ্টির অভিব্যক্তির মূলে একটি সদা-সক্রিয়, নিত্য-বিবর্তমান প্রাণ-প্রেরণা (elan vital) নিহিত আছে। জড় ও চেতনের অন্তহীন দ্বন্দ্ব হইতেই এই বিবর্ত-বেগের উৎপত্তি। চঞ্চলতা বা বিক্ষেপের মধ্য দিয়া নিয়ত একটি সুস্থিত অবস্থায় (equilibrium) উপস্থিত হইবার চেষ্টা জড়-শক্তির ধর্ম; এই প্রাণ-প্রবাহের মধ্যে কিন্তু স্থিরতা বলিয়া কিছুই নাই— 'বেগের আবেগে' ইহা নব নব রূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে।* চলিষ্ণুতাই ইহার ধর্ম; বিকাশ-ধারায় চেতনার প্রত্যেকটি মুহূর্ত (durie vraie) অপরটি হইতে স্বতন্ত্র—যন্ত্র-জীবনের মত উহারা পরস্পর সদৃশ নহে। উদ্‌ভিদ্-জীবনের মন্থরতা, প্রাণি-জীবনের সহজ সংস্কার এবং মনুষ্য-জীবনের সচেতন চেষ্টার মধ্য দিয়া এই প্রাণ ত্রিধারায় আপনাকে নিরন্তর অভিব্যক্ত

---

* ব্রুনো, গ্যালিলিও প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের চিন্তাতেও গতি-বাদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। স্থিতি বা বিরতিকেও তাঁহারা অবম বা অব্যক্ত(minimal or potential) গতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

করিতেছে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় আমাদের চেতনা বুঝি কতকগুলি মানস-অবস্থার পরম্পরামাত্র—ব্যক্তিত্ব-সূত্রে-গ্রথিত ক্ষণ-মুহূর্তের মালা। কিন্তু এই প্রতীতি সত্য নহে। মানস-অবস্থাগুলিকে আমরা স্থির মনে করি বলিয়াই এই বিভ্রম ঘটে। একটি সাধারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা বের্গ্‌স্‌ এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "আমাদের ধারণাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুস্থির দৃষ্টি-ধারণার কথাই ধরা যাক। একই বস্তুকে একই আলোকে এবং একই দৃষ্টি-কোণ হইতে দেখিতেছি, তথাপি বিভিন্ন মুহূর্তের দর্শনের মধ্যে প্রতীতির বিভিন্নতা আসিয়া যাইতেছে, অবশ্য পূর্বমুহূর্তের ধারণা স্মৃতি-সংবাহিত হইয়া পরমুহূর্তে অংশত উপনীত হইতেছে।"

জড়ের সহিত চেতনের বৈপরীত্য ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত চিত্ত-বৃত্তির সমীকরণের দ্বারা আমরা বোধির উচ্চতম চূড়ায় (supreme intuition) আরূঢ় না হই। সেখানে উঠিলে এই দ্বৈত-বুদ্ধির বিনাশ ঘটে, জড় ও চেতনে আমরা অন্তহীন প্রাণ-প্রবাহের নব নব সৃষ্টির প্রকাশ লক্ষ্য করি। বোধির আলোকে আমরা স্বকীয় মানস-অবস্থার সহিত সৃষ্টির তাবৎ বস্তুর সাদৃশ্য অনুভব করি এবং এই সাদৃশ্য-বোধের দ্বারা অনাদি ও অনন্ত প্রাণ-ধারার ধারণা করিতে সক্ষম হই।

এই বোধি বা কল্পনাকেই চরম বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক কল্পনার মত ইহা লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপলক্ষ্যমাত্র নহে। ইহা সর্বাংশে কবি-কল্পনার অনুরূপ; বোধির সাক্ষ্যই এখানে একমাত্র প্রমাণ—আপনার হৃদয় দিয়া বিশ্ব-হৃদয়ের আবরণ-উন্মোচন। কাব্য ও দর্শনের সীমান্ত-ভূমির উপর ইহা অবস্থিত, তাই শুধু সাদৃশ্য-মূলক কল্পনার ভাষাতেই এই প্রতিবোধ-বিদিত সত্যের প্রকাশ সম্ভব; রবীন্দ্রনাথের উপমা-অনুপম কবি ভাষার সহিত ইহার সারূপ্য অল্প নহে।

বের্গসঁর মতে বিকাশই (growth) সৃষ্টি ; এই অন্তহীন গতি ও বিবর্তনের প্রতীতিই বোধি বা 'intuition'। বস্তু-সত্তাকে খণ্ডিত করিয়া অর্থাৎ দেশ-

কালের দ্বারা পরিমিত করিয়া দেখাই বুদ্ধির ধর্ম—মৌলিক অর্থে ইহাই 'মায়া'। প্রাণ-প্রবাহের অনন্তরতার অনুভূতি কেবল বোধির দ্বারাই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ও প্রকাশ-ভংগীও অবিকল এইরূপ।

রবীন্দ্রনাথের 'ছবি'-কবিতাটিতে অনেকটা এই ভাবেরই প্রকাশ দেখা যায়; স্থির ও নিশ্চল হইয়াও এই ছবি কবির দৃষ্টি-চেতনায় অনন্ত গতি-ধারার ইংগিত করে, মনকে বর্তমান হইতে অতীত ও অনাগতের মধ্যে ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই কবিতাটির ব্যাখ্যা-প্রসংগে কবি স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধান-যোগ্য। তাঁহার মতে এই তত্ত্ব আসলে 'আছি'র তত্ত্ব। কারুরূপের মধ্য দিয়া বিশ্বের এই শাশ্বত অস্তিত্বের ইংগিত করাই শিল্পীর কাজ;—কবির অনবদ্য ভাষায়, 'সুন্দর ব'লেই আছে তা' নয়, আছে ব'লেই সুন্দর'। এই সত্তাকে সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ও অব্যবহিতরূপে অনুভব করা যায় নিজের মধ্যে * এবং যেখানে 'আমি-আছি'র সহিত 'তুমি-আছ'র অনুভূতির অন্তরতম মিলন ঘটে, সেইখানেই 'সত্তা' পরিণত হয় 'সত্যে'। কিন্তু এই থাকার প্রমাণ কেবল 'চলা'য়; জগৎ চলে বলিয়াই ইহা সত্য—'এরা যে অস্থির তাই এরা সত্য সবি।'

উপরে মনীষী বেগ্‌স'র যে দৃষ্টান্তটি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতেই প্রতিপন্ন হয় স্থূল জড়-বস্তুকেও আমাদের চেতনা কিরূপ সজীব ও সচলরূপে গ্রহণ করে।

"পর্বত চাহিল হোতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি'
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দ-রেখা ধরি' চকিতে হইতে দিশাহারা।"

গিরি-তরুশ্রেণীর মধ্যেও এই যে 'রভস'-রসের অনুভূতি—'পুলকিত নিশ্চলের

---

*"The whole is of the same nature as the self and it is to be seized by a more and more complete absorption in oneself."—'L' Evolution creatrice.'

অন্তরে অন্তরে এই যে বেগের আবেগ', ইহার মধ্যে 'elan vital' এর একটু গন্ধ পাওয়া যায় বই কি! কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চলা একটি অলক্ষ্য লক্ষ্যের অভিমুখে, একটি নির্ভর নীড়ের প্রত্যাশায়; শুধু চলার জন্যই এই চলা নহে: 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'—ইহা কবির একান্ত অন্তরের কথা; এবং এইখানেই উভয়ের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে মৌলিক অনৈক্য।

'ছবি'র মত 'Grecian Urn' কবিতাতেও 'পুলকিত নিশ্চলে'র অন্তরে গতির সংগীত ধ্বনিত হইয়াছে। ঋজু-ও-বক্র-রেখায় উৎকীর্ণ পৌরাণিক চিত্রলিপিগুলি দেখিতে দেখিতে কীট্‌স্-এর চেতনায় একটি সজীব ছবি ভাসিয়া উঠিয়াছে—অজানা প্রেমের বেদনায়, অশ্রুত সুরের ঝংকারে তাঁহার অন্তর স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে।

কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'সাজাহানে'র মধ্যেও এই রূপ-ঋদ্ধ, লাবণ্য-ললিত কবিতাটির ছায়াপাত হইয়াছে। শিল্প-সৃষ্টির অবিনশ্বরত্বই কীট্‌স্-এর কবিতার প্রধান প্রতিপাদ্য। 'সাজাহানে'র প্রথম অংশেও এই ভাবেরই দ্যোতনা দেখা যায়।

কীট্‌স্ উপলব্ধি করিয়াছেন যে মানব-জীবন এবং তৎসংসৃষ্ট সমস্তই নশ্বর হইলেও কলা-লক্ষ্মীর মায়াদণ্ডের স্পর্শে তাহারা দিব্য সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া 'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল'-রূপে বিরাজমান থাকে। ভাব-কল্পনার দিক দিয়া 'সাজাহান' কবিতার সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। 'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া'—এই আশ্বাস-বাণীর মধ্যে কি 'For ever wilt thou love, and she, be fair' পংক্তিটির প্রতিধ্বনি শুনা যায় না? 'সেই কানে কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে অনন্তের কানে'—এই পংক্তি-দুইটি কি 'Pipe to the spirit ditties of no tone' উক্তিটি স্মরণ করাইয়া দেয় না? অপিচ 'কণ্ঠে তার কী মালা দুলায়ে করিলে বরণ রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে!'—এই পংক্তিগুলি কি 'Thou, silent form, dost tease out of thought As doth eternity'রই অনুরূপ নহে?

সর্বশেষে, রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ সাংকেতিক নাটক 'ফাল্‌গুনী'র উপর বেল্‌জিয়ান্‌ কবি মেটারলিংকের প্রভাব নিরূপণ করিয়া আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মেটারলিংকের আদর্শেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাংকেতিক নাটকগুলির রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন। উভয়েরই মাধ্যম গদ্য, সংলাপগুলি উভয়ত্রই শ্লিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধি-দীপ্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা শুধু এই আংগিকেই সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারে নাই, সংদমিত আবেগগুলি তাই অজস্র গীতোচ্ছ্বাসে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

মেটারলিংকের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য প্রধানত রূপগত হইলেও 'ফাল্গুনী'-নাটকে মেটারলিংকের ভাবগত প্রভাবও সুস্পষ্ট। ফাল্গুনীর মূল বিষয়-বস্তু বসন্তের আবির্ভাব এবং শীত-বৃদ্ধের সভয়ে অন্ধকার গিরি-গুহায় আশ্রয়-গ্রহণ। 'শীত-বুড়োটা'র শুভ্র-রিক্ত বেশ তাহার ছদ্মবেশমাত্র; এই ছদ্মবেশ খসাইয়া তাহার বসন্ত-রূপ প্রকাশ করাই এই নাটকের প্রতিপাদ্য। তাই কবি এই পালার নাম দিয়াছেন 'শীতের বস্ত্রহরণ'। 'যৌবনের দল' এই বৃদ্ধের পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাকে ধরিবে এই তাহাদের পণ।* এই আখ্যানটির সহিত মেটারলিংকের 'Double Garden' গ্রন্থের 'News of Spring' শীর্ষক রূপক-সন্দর্ভটির ভাব-ও-ঘটনাগত ঐক্য এতই অধিক যে ফাল্গুনী-নাটকের অনুপ্রেরণার মূলে ইহার প্রভাব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। ইহার যে অংশে 'কুসুম ও কিশলয়ের, মধুপ ও বিহঙ্গের, মলয় ও শিশিরের মহোৎসব' বর্ণিত হইয়াছে তাহারই প্রতিচ্ছবি মিলে ফাল্গুনী-নাটকের কেন্দ্রগত কল্‌পনায়। ফাল্গুনীর 'দাদা' চরিত্রটি এমন এক শ্রেণীর সৃষ্টিছাড়া মানুষ যে তাহার কাছে আনন্দ জিনিসটা হাস্যকর উৎকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই দাদার সহিত তুলনা চলে 'News of spring'-এর 'অতর্কিত-সুখ-সম্ভোগে সতর্ক, অতিবিজ্ঞ বৃদ্ধ লোকদের'। তাহার পর, 'নবযৌবন দলে'র উচ্ছল আনন্দোৎসব, 'ঋতুপতি

* 'Looking for Winter and the print of its foot-steps. Where is it hiding ?'—News of spring.

বসন্তের, ক্রীড়ারত বালকের মত, উপত্যকায় উপত্যকায়, কাননে কাননে, তুষারমুক্ত শৈলের শৃংগে শৃংগে অবাধ পরিভ্রমণের' চিত্রটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন এই নাটকে 'শীত-বুড়োর ছদ্মবেশ-খসানো'র কথা বলিয়াছেন, মেটারলিংকও তেমনি গাহিয়াছেন চির-বসন্তের (eternal summer) জয়গান, 'শীতের আতংক যাহাদের মজ্জায় মজ্জায়' তাহাদের দিয়াছেন কঠিন ধিক্কার। বনে এবং মনে এই বসন্তের চিরন্তন লীলা,—কবির কথায়, 'বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চল্‌ছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা।'

যাহা হউক, আর পুঁথি বাড়াইয়া লাভ নাই। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবির কাব্যে প্রভাব-চিহ্নগুলি সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করা সহজ নহে, কারণ বাহির হইতে যাহা-কিছু তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই আত্মীকৃত হইয়া তাঁহার একান্ত নিজস্ব হইয়া গিয়াছে। কবির স্বভাবের সহিত এই প্রভাব এমন নির্বিরোধ আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ যে তাহাদের পরস্পর পৃথক্ করিয়া দেখান একপ্রকার অসম্ভব।

দাশুরায়ের পাঁচালি

বাঙ্‌লা ভাষায় উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত রচনা করিয়া রবীন্দ্র-পূর্ব্ব যুগে যে কয় জন ভাবশিল্পী লোক-হৃদয়ে চিরন্তন আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহাদেরই এক জনের রচনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতেই হইবে, তরুণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই এই কালের সঙ্গীত-সাহিত্যের সহিত পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ নহে। তাহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি: প্রথম, এই সকল কবির রচনাবলী গ্রন্থাকারে বহুল প্রচলিত নহে এবং আজ-কালকার গানের আসরেও এই সকল মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীতের সুমধুর ধ্বনি ক্বচিৎ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে; দ্বিতীয়তঃ বাঙ্‌লা কাব্যেতিহাসের এই অতীত অধ্যায় সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলের অল্পতা। যাহা কিছু পুরাতন, তাহারই সম্বন্ধে মর্ম্মান্তিক অজ্ঞতা এখন বিজ্ঞতা বলিয়া বিবেচিত। নিধুবাবু, দেওয়ান রঘুনাথ, দাশরথি রায় প্রভৃতি সঙ্গীত-শিল্পী কথা ও সুরের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর মর্ম্মস্থলকে যেমন করিয়া স্পর্শ করিয়াছিলেন, আধুনিক যুগে কোনও কবি অথবা গায়ক সেরূপ করিয়াছেন কিনা জানি না। ছোট ছোট সাদা কথায় ইঁহারা যে নিগূঢ়ভাবের ইঙ্গিত করিয়াছেন, চটুল সুরের লীলায়িত হিল্লোলে প্রেমের যে ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান কালের কয়জন রূপকার পারিয়াছেন? ইঁহারা ছিলেন বাঙ্‌লার খাঁটি জাতীয় কবি—প্রতীচীর সহিত সংস্পর্শে যে বিপুল ভাববিপ্লব আজ সারা ভারতকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার ক্ষীণতম ছায়াও বোধ করি তাঁহাদের উপর পড়ে নাই; তাই তাঁহারা যে-সুরে বীণা বাঁধিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্‌লার একান্ত নিজস্ব।

এই সময়কার কবিকুলের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে যাঁহার নাম মনে পড়ে, তিনি দাশরথি রায়। দাশরথি পাঁচালি গাহিয়া অমর হইয়াছেন। পাঁচালির নাম শুনিলেই পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত-সম্প্রদায় নাসিকাকুঞ্চন করেন—তাঁহাদের বিশ্বাস, পাঁচালি-গান

অশ্লীল ও অশ্রাব্য। কিন্তু তাঁহারা যদি এই সংস্কারগত বিরাগ পরিহার করিয়া পাঁচালির আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহাদের অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে যাহাকে আবর্জ্জনা বোধে এতদিন দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এমন অমূল্য মণি অনেক আছে, যাহা বিশ্রুতকীর্ত্তি ভাবুক কবির রত্নভাণ্ডারেও সুলভ নহে। দাশরথি তাঁহার অনুপ্রাস-সমৃদ্ধ, সুললিত পদবিন্যাসে ভাবকুসুমের যে অনবদ্য মাল্য গাঁথিয়াছেন, তাহা বঙ্গভারতীর কণ্ঠে অম্লান সৌরভে চিরদিন দেদীপ্যমান থাকিবে। দাশরথির অনেক পদ প্রবাদবাক্যের মত আমাদের মুখে মুখে ফিরিতেছে, অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাহাদের রচয়িতার নাম আমাদের অজ্ঞাত।*

দাশরথি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে বাঁধমুড়া গ্রামে। জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসর তিনি নিজ গ্রামেই খেলাধূলায় অতিবাহিত করেন। ইহার পর তিনি মাতুলালয় পীলাগ্রামে গমন করেন এবং মাতুল রামজীবন চক্রবর্ত্তীর যত্নে লালিত হন। কবি এ বিষয়ে স্বয়ং এইরূপ লিখিয়াছেন—

---

* গোপীদিগের নিকট বৈদ্যবেশী শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :—

"ধনী! আমি কেবল নিদানে—
বিদ্যা যে প্রকার বৈদ্যনাথ আমার, বিশেষ গুণ বাখানে।
চারিযুগে মম আয়োজন হয়, একত্রেতে চূর্ণ করি সমুদয়,
গঙ্গাধর-চূর্ণ আমারি আলয়, কেবা তুল্য মম গুণে,
ওহে ব্রজাঙ্গনা কি কর কৌতুক, আমারি সৃষ্টি করা চতুর্ম্মুখ,
হরি বৈদ্য আমি হরিবারে দুখ, ভ্রমণ করি এ ভুবনে।"

অথবা,

"দোষ কারু নয় গো মা,
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরিগো শ্যামা
ষড় রিপু হ'ল কোদণ্ডস্বরূপ,
পুণ্য ক্ষেত্রমাঝে কাটিলাম কূপ"

প্রভৃতি গান সকলেই শুনিয়াছেন, অথচ কবির নাম হয়তো অনেকেরই জানা নাই।

"গ্রামনাম বাঁধমূড়া, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণচূড়া
দেবীপ্রসাদ দেবশর্ম্মা নাম।
অহং দীন তত্তনয়, পীলায় মাতুলালয়,
ইদানী মাতুল-ধামে ধাম ॥"

পীলার পাঠশালায় কিছু দিন অধ্যয়ন করিয়া ও বহরা গ্রামের হরকিশোর ভট্টাচার্যের নিকট সামান্য ইংরাজি শিখিয়া তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। যে অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভার নিত্যনূতন পরিচয়ে উত্তরকালে তিনি তাঁহার দেশবাসীর হৃদয়ে বিস্ময়াবহ প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার প্রথম স্ফুরণ আরম্ভ হয় এই কৈশোর কাল হইতেই। এই সময়েই তিনি কবি-সম্প্রদায়ের জন্য দুই-একখানি গীত রচনা করেন এবং ইহার অত্যল্প কাল পরে পীলাগ্রাম-নিবাসিনী অক্ষয়া পাটনীর কবির দলে গান ও ছড়া বলিয়া দিতে আরম্ভ করেন। মাতুল রামজীবন ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বিধিমতে চেষ্টা করেন। কিন্তু দাশরথির মনের গতি ফিরিল না। প্রতিভার প্রেরণা তাঁহাকে যে পথে পরিচালিত করিতেছিল, সে পথ হইতে ফিরিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। ইহার পরে দাশরথি রীতিমত কবির আসরে নামিয়া গেলেন এবং ক্রমে ক্রমে প্রভাস, চণ্ডী, লবকুশের যুদ্ধ, মানভঞ্জন, জন্মাষ্টমী, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি বাটটি পালা রচনা করেন; যদিও পরে একদিন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দল হইতে অত্যন্ত কটু গালি খাইয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া কবির দল ত্যাগ করেন, তথাপি সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার অনির্ব্বাণ অনুরাগ কোন দিনই স্তিমিত হয় নাই।

আমার মনে হয়, এই প্রসঙ্গে পাঁচালি-গানের একটু পূর্ব্ব পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, যদিও ইহার যথার্থ কুলজী নির্ণয় এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "কবির গান" বলিয়া এখন যে জিনিসটির কথা আমরা শুনিতে পাই—কিন্তু যাহার সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট ধারণা আমাদের অনেকেরই নাই—পাঁচালির বিবর্ত্তন-ধারাটি বুঝিতে হইলে সেই জিনিসটি সম্বন্ধে মোটামুটি

পরিচয় থাকা বিশেষ আবশ্যক; কারণ কবি-গানেরই একটা পরিণত সংস্করণ এই পাঁচালি। সঙ্গীতের একটা আবহাওয়া আমাদের দেশে চিরকালই ছিল, এবং আমাদের সামাজিক ও ধর্ম্ম-জীবনের সঙ্গীতই ছিল প্রধান অঙ্গ। চৈতন্ত ও তৎপরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য ও সঙ্গীত বহুদিন পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে মাধুর্য্যের যে অমৃতনির্ঝর মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, সেই মুক্ত উৎসের অজস্রধারায় স্নান করিয়া বঙ্গবাসী একদিন অমরত্বের অধিকারী হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। পরিতাপের বিষয়, বৈষ্ণবধর্ম্মের অবনতি ও গ্লানির সঙ্গে সঙ্গে সহসা সেই উৎসমুখ নিরুদ্ধ হইল। প্রেমের জোয়ারে ভাঁটা আসিল—বাণীর বীণানিক্কণ মধ্যপথেই থামিয়া গেল। কিন্তু বাঙ্‌লা সঙ্গীতের চিরলীলাভূমি, তাই ইহার পরেও রামপ্রসাদাদি শাক্ত ভক্তের আবেগ-বিগলিত গদ্‌গদ কণ্ঠের উদাত্ত আরাবে বাণীকুঞ্জ আবার মুখরিত হইল। রুদ্ধ প্রবাহ আবার বহিল—আবার পিপাসিত আর্ত্তের অধর-সম্মুখে স্বর্গ হইতে অমৃতের প্রসাদ নামিয়া আসিল। আজও পর্য্যন্ত এই সঙ্গীত-প্রবাহের বিরাম নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্লবও ইহাকে বিরত ও দমিত করিতে পারে নাই; যুগসন্ধির ভাগ্যবিপর্য্যয়, অনিশ্চয়তা ও সংশয় কিছু দিনের জন্য স্রোতের গতি ফিরাইয়াছিল মাত্র।

ঠিক এই সন্ধিক্ষণেই কবি-সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল—গভীর চিন্তাশীলতা অথবা সুদূরপ্রসারী কল্পনার লীলার পক্ষে সময়টি আদৌ অনুকূল ছিল না। লঘু ও তরল সাহিত্যের প্রতিই ছিল দেশের প্রবণতা, তাই যে কবি যত লঘু আমোদের রসদ জোগাইতে পারিতেন, তিনি ততই লোকপ্রিয় হইয়া উঠিতেন। কিন্তু এই তরল রসের ধারা চিরদিনের জন্য লোকচিত্তকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। "খেউড়ের" উদ্দাম ও অবাধ উচ্ছ্বাসে অল্পদিনের মধ্যেই লোকে হাঁপাইয়া উঠিল, তাহারা কাব্য-সরস্বতীর কাছে চাহিল এমন-কিছু যাহা আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আত্মাকে উন্মেষিত করিয়া তুলিতে পারে। তাই পরবর্ত্তী যুগের পাঁচালি সাহিত্যের মধ্যে আমরা ভক্তি-মূলক পুরাণ-বিষয়ক বিবিধ পালার সমাবেশ দেখিতে পাই। পাঁচালি-গায়কদের সুর-

বিস্তারের মধ্যে আবিলতা ও পঙ্কিলতা একেবারেই ছিল না, এমন কথা বলা যায় না বটে, তবে একথা নিশ্চয় যে তাঁহাদের কাব্যের মধ্যে আবেগমুখর, ভক্তিরসোজ্জ্বল পবিত্র ভাবেরও নিতান্ত অভাব নাই। 'কবিগান' লোকপ্রিয় হইলেও সাহিত্যহিসাবে উপেক্ষণীয়, সে হিসাবে পাঁচালির স্থান অনেক উচ্চে।

পাঁচালি জিনিসটি 'কবিগানের' অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই আমাদের দেশে বিদ্যমান ছিল সত্য, কিন্তু ইহার অর্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল সেই মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা কবিরই পরিবর্ত্তিত রূপ। পূর্ব্বে নানা ছন্দে গ্রথিত কাব্যাদি পাঁচজনে দাঁড়াইয়া চামর হস্তে এক সঙ্গে গাহিত বা সুরসংযোগে আবৃত্তি করিত, তাহারই নাম ছিল পাঁচালি। এই জন্যই কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণ-গ্রন্থও কবি-কর্ত্তৃক পাঁচালি বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু পরে পাঁচালির এই অর্থের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, পাঁচালির সহিত পাঁচের আর কোন সম্বন্ধই ছিল না। কবিগানেরই সামান্য প্রকারভেদের নাম হইয়াছিল পাঁচালি। উপস্থিত বুদ্ধি, মুখে মুখে ছন্দ-রচনা, গালাগালি দিবার সুতীক্ষ্ণ রসনা, এই সকলই ছিল 'কবি'র প্রধান অঙ্গ। প্রত্যেক পক্ষের একমাত্র চেষ্টা ছিল কি করিয়া প্রতিপক্ষকে মুখের জোরে বসাইয়া দিবে। শ্লোকাদি পূর্ব্ব হইতে রচিত থাকিত না, ঘটনা-স্থলে প্রয়োজন-অনুসারে প্রণীত হইত। 'কবি'র ন্যায় পাঁচালি-গানেও পূর্ব্ব ও উত্তরপক্ষ থাকিত, কিন্তু উভয় পক্ষই পূর্ব্ব হইতে পালা বাঁধিয়া লইয়া আসিত এবং পূর্ব্বাভ্যস্ত গান ও ছড়ার লড়াই আরম্ভ হইত। একই পালা শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে গাহিয়া অধিক প্রশংসা ও করতালি আদায় করিবার চেষ্টাও অনেক সময়ে থাকিত। উপস্থিত কবিত্বের জন্য কবিগানের মধ্যে ভাব ও ছন্দোবৈচিত্র্য প্রকাশের অবকাশ অতি অল্পই থাকিত, গালাগালির প্রতিযোগিতার ফলে ইহা 'খেউড়ের' স্তরে নামিয়া আসিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল 'খেউড়' তদানীন্তন শিক্ষিত-সমাজেরও নিতান্ত অরুচিকর ছিল না। উন্নত ও অভিনব পাঁচালির মধ্যে কাব্যের এই আবর্জ্জনা দূর হইয়াছিল,

জন- রুচিরও কথঞ্চিৎ সংশোধন হইয়াছিল ; সাময়িক প্রয়োজনের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া কাব্যধারা আবার লীলায়িত, বিসর্পিত গতিতে স্বীয় গন্তব্য পথে প্রবাহিত হইয়াছিল।

প্রায় শতবর্ষ হইল এরূপ পাঁচালির সৃষ্টি। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে এ পাঁচালির বড়ই আদর ছিল। সঙ্গতিশালী ব্যক্তিগণ এই পাঁচালি-গান শুনিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, সেই জন্য সে-সময়ে বহু পাঁচালির দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল দলে অনেক সুকবি 'বাঁধনদার' থাকিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তী, ঠাকুরদাস দত্ত, দাশরথি রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, দ্বারিকানাথ অধিকারী প্রভৃতির নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই শক্তিমান্ কবিকুলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ছিলেন দাশরথি। বর্ত্তমান সন্দর্ভে আমরা সংক্ষেপে তাঁহারই সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

দাশরথির প্রতিভা বহুমুখী ছিল। করুণ, ভক্তি, হাস্য প্রভৃতি নানা বিচিত্র রসের সমাবেশে তদীয় কাব্য এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছিল। অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া তাঁহার গান লোকের মুখে মুখে ফিরিত ; পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র সকল সম্প্রদায় ও স্তরের লোকই তাঁহার গান শুনিবার জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত। বাস্তবিক, লোক-মনের উপর এরূপ কল্পনাতীত প্রভাব বিস্তার করিতে খুব কম কবিই পারিয়াছেন। দাশরথির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তাঁহার শব্দ চয়ন ও বয়নের অপূর্ব্ব নিপুণতা তদীয় রচনাবলীর মধ্যে এমন একটি তাড়িত শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল যে, একবার যে তাঁহার রস-সুমধুর সঙ্গীতের আস্বাদ লাভ করিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে—কবির প্রতি একটি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার ভাবে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে পূর্ব্বতন রুচির বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; অনুপ্রাস ও যমকের ঘনঘটা আর আমাদের চিত্তকে তেমন করিয়া স্পর্শ করিতে পারে না, উপমা-সমৃদ্ধ রূপকের ভাষা আর আমাদের প্রাণের তারে পূর্ব্বের মত স্পন্দন জাগাইতে পারে না। কিন্তু এককালে এই ভাষা ও গানই নবদ্বীপের বিবুধসভায় যে উচ্ছ্বসিত ও অযাচিত প্রশংসার

দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছিল, তাহা অধুনাতন দিনে কয় জন কবির ভাগ্যে ঘটিয়াছে? পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্নমহাশয় বলিয়াছেন, "আমি ত সামান্য ব্যক্তি, নবদ্বীপের তাৎকালিক জগন্মান্য প্রাচীন যত অধ্যাপক ছিলেন, সকলেই দাশরথির গুণে তদ্‌গত ও মুগ্ধ ছিলেন। সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ে অনেক ব্যক্তিই সামান্য মানবের ন্যায় নায়কনায়িকার ভাবের বর্ণনা করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন, কিন্তু প্রতি রচনায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মভাবমিশ্রিত অপূর্ব্ব বর্ণনার দ্বারা দাশরথি রায় ভক্তি-প্রীতিরসে ভাবুকমাত্রকেই মোহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যযুগে প্রোভেন্স-এ (Provence) ট্রুবেডুরদের (Troubadours) সঙ্গীত যেরূপ লোকপ্রিয় হইয়াছিল, দাশরথির সঙ্গীতও আমাদের সমাজে সেইরূপ সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল। উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই তাঁহার পাঁচালি শুনিয়া মোহিত হইতেন। এই যে জনপ্রিয়তা, ইহার কারণ কি? দাশুরায়ের কাব্যের ভিতরে এমন কি আছে, যাহা আপামরসাধারণকে এইরূপ দুর্নিবার আকর্ষণে টানিয়া রাখিয়াছিল? বর্ত্তমান যুগের কাব্যসাহিত্যে ভাব ও ভাষার, কল্পনা ও অনুভূতির, রূপ ও রসের যে সলীল হিল্লোল দেখা যায়, বহীরূপের অপরূপতার অন্তরালে ভাবরূপের যে অনবদ্য মাধুর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায়, দাশরথির কাব্যভাণ্ডারে সেরূপ কিছু অন্বেষণ করিতে গেলে আমাদিগকে হতাশ হইতে হইবে। ছন্দের নিপুণতা, রুচির বিশুদ্ধতা দাশরথির নাই। অপিচ, এমন ভাবের সমাবেশ অনেক আছে যাহা রুচি অথবা নীতি কোনদিক দিয়াই সমর্থিত হইবার যোগ্য নহে। বলা বাহুল্য, এই রুচিবিকার দাশরথির নিজস্ব নহে—সেই সময়কার সকল কবিই এই দোষে অল্প-বিস্তর দোষী। কোনও দেশের সাধারণ রুচি যখন উন্নত থাকে, তখন সেই দেশে সাহিত্যেরও উৎকর্ষই আশা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ ইংরাজী-সাহিত্যে এলিজাবেথের যুগ এবং আমাদের দেশে বৈষ্ণব সাহিত্যের যুগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অপর পক্ষে, দেশে যখন

সাধারণ রুচিবিকার উপস্থিত হয়, তখন সাহিত্যও তাহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে ইংরাজী সাহিত্যে ড্রাইডেন্‌-এর যুগ এবং সেই সময়ে রচিত Congreve, Wycherley, Vanbrugh, Farquhar প্রভৃতি কবির দুর্নীতি-কলুষিত নাট্য-সাহিত্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল 'রীতি'-নাটকের মধ্যে আমরা ইংলণ্ডের তদানীন্তন বিকৃতরুচি সমাজের প্রকাম পরিচয় পাই। হৃদয়হীন অবিশ্বস্ততা, উচ্ছৃঙ্খল আমোদের পিছনে কামান্ধ মানবের দুঃসাহসিক অভিযান,—ইহাই হইল সেই সময়কার সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। কবি, টপ্পা, পাঁচালি প্রভৃতির যুগেও আমাদের সাধারণ রুচি বিশেষ উন্নত ছিল না, সুতরাং দাশরথি যে তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহাও বিচিত্র নহে। এই উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে যদি তিনি সহসা সুরুচিপূর্ণ সাহিত্যের অনিন্দ্য উপহার লইয়া উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গবাসী তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন জানাইবার জন্য এরূপ আগ্রহান্বিত হইয়া অপেক্ষা করিত কিনা সন্দেহ। রুচি-সংস্কার করিতে গিয়া Jeremy Collier-এর যে অবস্থা হইয়াছিল দাশরথির ভাগ্যেও যে সেইরূপ কিছু ঘটিত না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? যাহা হউক, সাধারণ রুচির অনুবর্তন করিয়া তিনি ভাল কি মন্দ করিয়াছিলেন সে আলোচনা এখন নিষ্ফল, তবে তিনি যে তাহাকে অবজ্ঞা করেন নাই, একথা নিশ্চয়; এবং অনেকটা এই কারণেই যে তিনি লোক-হৃদয়ে প্রীতির আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সে বিষয়েও সংশয় নাই। দীনবন্ধু ও মধুসূদনের প্রহসনের অশ্লীল উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলি সে-সময়কার লোকে অন্তরের সঙ্গেই উপভোগ করিয়াছিল এবং এখনকার দিনেও বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞানঘটিত (Psycho-analytical) অতি-আধুনিক সাহিত্যের সমাদর আমরা কম করিতেছি না। রুচির মৌলিক পরিবর্তন বিশেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, নগ্ন ভাবটার উপর শিল্প-চাতুর্যের একটি সূক্ষ্ম আবরণ টানিয়া দেওয়া হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ।

সে যুগের সকল কাব্যের ন্যায় দাশুরায়ের রচনাও প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছ—

ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'direct'। বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে অস্পষ্টতা আদৌ নাই। কবি হৃদয় দিয়া যাহা অনুভব করিয়াছেন, সহজ সরল ভাষায় তাহাকেই রূপ দিয়াছেন। অনুভূতি ও প্রকাশের দীনতা কোথাও লক্ষিত হয় না— অস্ফুট অতীন্দ্রিয়তার (mysticism) ছায়াপাতে তাঁহার রচনা হেঁয়ালি হইয়া উঠে নাই। হৃদয়-কানন হইতে সৌরভমধুর ভাবকুসুমগুলি আহরণ করিয়া ও মালাকারে গাঁথিয়া তিনি বাণীর চরণে রূপ-সুন্দর ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন।

দাশরথির ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি হৃদ্য ও অনবদ্য ; ভাষার মাধুর্য, ভাবের গভীরতা ও প্রকাশের কুশলতা যথেষ্ট আছে। পড়িলেই বুঝা যায় সেগুলি আন্তরিকতা ও বিশ্বাসে সমুজ্জ্বল, বাক্‌সর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর অন্তঃসারশূন্য ভাষার প্রহেলিকামাত্র নহে। একটি ভক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠকগণ স্বয়ং ইহার মূল্য অবধারণ করিবেন।

"দুঃখ বর্ণিতে নারি, ওহে হরি,
দুখবহ্নিতে দহে যেরূপ জীবন।
কৃপারূপ বারি, দাও হে দানবারি,
বিপদবারী হে বারিদবরণ॥
জলে গেলে জ্বালা না হয় নির্ব্বাণ,
দুখানল দিনে দিনে বলবান্‌,
কেমনেতে পাব পাবকেতে ত্রাণ
ও ভয় নাশিতে অভয় চরণ॥
পাপরূপ কাষ্ঠ করি আয়োজন,
অনল উজ্জ্বল করিছে ছ'জন,
না দেয় নিভাতে, নিরন্তর তাতে
অনুগত আশা-পবন॥
অবিচ্ছেদ ব্রতী হইয়ে কুমতি,
দিতেছে তাহে অধর্ম্ম আহুতি,

দুখালনে দগ্ধ হ'ল দাশরথি
স্বমনদোষে হে শমন-দমন ॥

কবির ভাষা অনুপ্রাস-সমৃদ্ধ, যমকের চমকও নিতান্ত কম নাই। অথচ তাঁহার রচনা পড়িয়া একবারও মনে হয় না, ভাষা ভাবকে ছাপাইয়া গিয়াছে। উদ্ধৃত শ্লোকের শেষ পংক্তিটি কি করুণ ও আন্তরিকতাপূর্ণ! কবি বলিতেছেন, "কুমতির প্ররোচনায় পাপ তো নিয়তই করিতেছি, কিন্তু হে বিধাতা, সুমতিও তো তোমারি দান, আমি সুমতির নির্দ্দেশ না মানিয়া কুমতিকে আশ্রয় করিয়াছি; ইহাতে তোমার দোষ কি? নিজের দোষেই আমি মজিলাম!" ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে কি গভীর বিশ্বাস! "কুমতি কেন দিলে, ভগবান্" বলিয়া তিনি অনুযোগ করিতেছেন না; তিনি আত্মস্থ ও সমাহিত-চিত্ত, তাই বুঝিয়াছেন যে "স্বমন-দোষেই" তাঁহার এই পতন।

দুঃখের বিষয়, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের ন্যায় মনস্বী সুধীও দাশরথির কাব্যসৃষ্টিকে নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে দাশরথির কাব্যে শাশ্বত সম্পদ্ কিছুই নাই; "উহা আদ্যন্ত কুরুচিপূর্ণ এবং ভদ্রসমাজের আলোচনার অযোগ্য। কেবলমাত্র কলা-নৈপুণ্য ও ভাষা-ভূষার জন্যই উহা আমাদের নিকট কতকটা ক্ষমার্হ বলিয়া মনে হয়।" এই বিরূপ ও কঠোর মন্তব্য আদৌ সঙ্গত নহে এবং ইহাকে 'খাদ' বাদ দিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। দাশরথির সমাজ-সম্বন্ধীয় ব্যঙ্গাত্মক গীতগুলির অধিকাংশই অশ্লীলতাদুষ্ট হইলেও তাঁহার ধর্ম্মমূলক পদগুলি অন্তরের অন্তরতম উৎস হইতে উৎসারিত এবং তাহাদের গভীর আবেদন অতিবড় কঠিন হৃদয়কেও করুণার্দ্র করিয়া তুলে। রামচন্দ্রের প্রতি গুহকের উদ্ধৃত উক্তিগুলি স্তোত্রের মতই উদাত্তধ্বনিময় —

ব'লে গেলি নে ব'লে রে ভাই ভেবেছিলেম আমি চিতে
দীনকে বুঝি ভুলে গেলি দিন পেয়ে ভাই রামা মিতে।

সতত নবঘন-রূপ জাগিছে মম অন্তরে,
গগনে হেরি' নবঘন ঘন ঘন নয়ন ঝরে,
বড় ভালবাসি রে মিতে তোরে প্রাণের সহিতে।

প্রভৃতি পংক্তিগুলি পাঠ করিলে আমাদের প্রাণের নিভৃত বেদনার উৎসটি কি স্বতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না? তাঁহার

হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি।
ওহে ভক্তপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধাসতী।

অথবা

ননদিনী বলো নগরে।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।
কাজ কি গোকুল, কাজ কিগো কুল,
ব্রজকুল সব হউক প্রতিকুল,
আমি তো সঁপেছি গো কুল অকূলকাণ্ডারী-করে।

প্রভৃতি গীতগুলি অধ্যাত্ম চিন্তার উচ্চতম গ্রাম স্পর্শ করিয়াছে বলিয়াই আমাদের ধারণা। এই ধর্মসঙ্গীতগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্রও উহাদের মধ্যে নাই। কবি শাক্ত, বৈষ্ণব অথবা রামাইত, তাঁহার কাব্য পাঠ করিয়া তাহা নির্ণয় করা কঠিন; একটি উদার উন্মুক্ত দৃষ্টি তাঁহার ধর্মসঙ্গীতগুলিকে অপূর্ব ব্যাপ্তি ও সমন্বয়-সুষমা দান করিয়াছে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র অকুণ্ঠকণ্ঠে যাঁহার প্রশস্তি-কীর্তন করিয়াছেন, নবদ্বীপের বিশ্রুত বিদগ্ধমণ্ডলী যাঁহার শব্দের উৎকট অপপ্রয়োগও (কোদাল অর্থে কোদণ্ডের প্রয়োগ) অনুমোদন করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহার কাব্য যে নিতান্ত অপাংক্তেয় ও অবজ্ঞেয় নহে তাহা বলাই বাহুল্য। দাশরথির কাব্যকে আধুনিক রুচিতে রুচির ও লোকপ্রিয় করিতে হইলে পালা ও গীতগুলির একটি সুনির্বাচিত সঞ্চয়ন প্রকাশ করা বিশেষ আবশ্যক। কারণ আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস, কেবল পদলালিত্যের জন্যই নহে, পরন্তু বর্ণনার সজীবতা ও স্বচ্ছন্দতায় এবং অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদ্

ও শক্তির বিচারে তাঁহার কাব্য বাঙ্‌লার সারস্বত সভায় একটি বরণীয় আসন দাবী করিতে পারে।

অলঙ্কারের ঝঙ্কার দাশরথির ভাষায় প্রচুর; ভক্তিগর্ভ, বৈরাগ্য-দীপ্ত ভাবেরও নিতান্ত অভাব নাই। কিন্তু তাঁহার নির্ব্বিরোধ শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার হাস্যরসোজ্জল ব্যঙ্গ-রচনায়—মধুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতর হুলের আভাসও পাওয়া যায় মধ্যে মধ্যে। কথাবার্ত্তায় সর্ব্বদাই দাশরথির পরিহাস-প্রিয়তা প্রকাশ পাইত। রহস্যবোধ তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল, চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে রসিকতা করিতে হইত না। ভ্রাতা তিনকড়ির সহিত মনোমালিন্যনিবন্ধন পৃথক্ বাটি নির্ম্মিত হইবার পর জনৈক ভদ্রলোকের "এ বাড়িটি কেন হইতেছে?" এই প্রশ্নের উত্তরে যিনি বলিয়াছিলেন "এটি বাড়াবাড়ি", তাঁহার পক্ষে রসিকতা কত সহজ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীতগুলি সেই জন্য এমন একটি চটুল হাস্যরসের দ্বারা অনুস্যূত যে সেই রসমধু পান করিয়া হুলের আঘাতের কথা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাইতে হয়। এখানে আমরা তাঁহার বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন সম্পর্কে রচিত পালা হইতে দু'একটী বিদ্রূপ-সঙ্গীত পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া তাঁহার রস-রচনার প্রকৃতি নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব।

"আমাদিগে দিতে নাগর, এলেন গুণের বিদ্যাসাগর,
বিদ্যাসাগর বিধবা পার কত্তে
তরীর গুণ ধ'রেছেন গুণনিধি।

*   *   *   *

আমাদিগের ঈশ্বরগুপ্ত অলপ্পেয়ে,
নারীর রোগ বুঝে না বৈদ্য হ'য়ে,
হাতুড়ে বৈদ্যতে যেমন বিষ দিয়ে দেয় প্রাণে বধি।"*

উদ্ধৃত কবিতাটিতে একদিকে প্রশংসাচ্ছলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর দোষারোপ এবং অপরদিকে তিরস্কারচ্ছলে গুপ্ত-কবিকে প্রশংসা করা

* 'বসুমতী' সংস্করণে রসশেখর চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়-ধৃত পাঠ।

হইয়াছে। উদাহরণ-দুইটি ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইহা ব্যতীত আর একটি গান আছে—

"দিলে দুঃখ রাধাকান্ত কাঁদত না তাতে অবলা,
যদি ভাই না থাকিত রাধাকান্ত-সুতের জ্বালা।
তিনি যে গুণের সদন, তাঁর যে পুত্র মদন,
তার জ্বালায় হ'য়ে জ্বালাতন
কুল রাখতে নারে কুলবালা।"

ইহাতে যে-রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা যথোচিত মার্জ্জিত না হইলেও রচনার সরসতায় ইহা যে আমাদের মনোহরণ করে, একথা অস্বীকার করা চলে না। ফল কথা, প্রাচীনপন্থী দাশরথি বিধবার পুনর্বিবাহ ব্যাপারটিকে কিছুতেই মানিয়া লইতে পারেন নাই; তাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তাঁহার এই উষ্মা নানা গানে ও কবিতায় উগ্ররূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।

একবার জনরব উঠিয়াছিল নবদ্বীপে গোপাল অবতার হইয়াছেন। তিনি অনুমতি করিয়াছেন, কার্ত্তিকের ১৫ই তারিখে মরা মানুষ ফিরিয়া আসিবে। দেশে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল; অনেক পতিহারা রমণী, পুত্রহারা জননী তাহাদের পতিপুত্র ফিরিয়া পাইবে এই আশায় সাগ্রহে উক্ত তারিখের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দাশরথি এই সময়ে এই বিষয় অবলম্বনে একটি সুন্দর ব্যঙ্গগীতি রচনা করিয়াছিলেন।

"দিদি, দিন পাব, শুভদিন হবে, ভেব না।
মরা মানুষ আস্‌বে ফিরে, গোল শুনে তাই বল্‌ছি তোরে
গোল হাতে আর কাল কাটাতে হবে না।
অনঙ্গ কল্লে কি রঙ্গ............
এ দুটো মাস যা দুর্গতি, কার্ত্তিক মাসে আস্‌বে পতি,
গোপালের এই অনুমতি, ঘুচ্‌বে তোদের একাদশী
ধনী লো!"

দাশুরায়ের অন্যান্য রস-রচনার ন্যায় ইহার রুচিও বেশ শোভন ও শুচি নহে, তথাপি তাঁহার হাস্যরসের সূক্ষ্ম অনুভূতি ইহার প্রত্যেক ছত্রে প্রতিবিম্বিত। সেকালের লোকে এইরূপ অশ্লীলতা-ঘেঁসা রঙ্গরসই পছন্দ করিত। কবি কালের নির্দ্দেশ অনুসারে চলিয়াছেন এইমাত্র।

দাশরথির ভাষা অলঙ্কার-সমুজ্জ্বল, ভাব হৃদয়াবেগসমুত্থ, প্রয়াসের স্বেদচিহ্ন কোথাও নাই। অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল, ভাষা তাঁহার করামলকবৎ নিজস্ব ছিল, রসিকতা, বিদ্রূপ প্রভৃতি কথায় কথায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। শ্রীমদ্‌ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, রাধাতন্ত্র, হরিবংশ, বাল্মীকি-রামায়ণ, বেদব্যাস-সঙ্কলিত মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক সাহিত্যের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল; তিনি সমাজের সর্ব্বদিগ্‌দর্শী ও সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। শব্দশিল্পের এমন বোদ্ধা ও নির্ম্মাতা অতি অল্পই চোখে পড়ে। বঙ্কিমবাবুর সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও বলি, "যিনি বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণরূপে ব্যুৎপন্ন হইতে চাহেন তিনি যত্নপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত দাশুরায়ের পাঁচালি পাঠ করুন।" *

* এই প্রবন্ধের তথ্যাংশ প্রধানতঃ বিশ্বকোষ ও 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। ২৫৬ পৃষ্ঠায় 'প্রায় শত বর্ষ হইল' ইত্যাদি অনুচ্ছেদটি বিশ্বকোষের ১৩০৭ সালে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে গৃহীত। সুতরাং সময়ের হিসাবে ৫০ বৎসর যোগ করিতে হইবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান

হাসিতে মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণী হাসতে পারে কিনা জানি না। ব্যঞ্জনে যেমন লবণ, মানুষের জীবনেও তেমনি হাসি। রচনা যতই ভাব-সমৃদ্ধ হোক্ না তার মধ্যে মাণিক্যের কুচির মত হাসির কুচি যদি ছড়িয়ে না থাকে তবে তা কখনই আমাদের হৃদ্য হয় না। হাসির লবণ আছে ব'লেই তো তার লাবণ্য—সহস্রবৈচিত্র্য সত্ত্বেও একমাত্র এইটির অভাবে রচনা হ'য়ে পড়ে নীরস ও নির্জীব। প্রাণশক্তি উচ্ছ্বসিত হয় এই হাসিতে—সেই শক্তি যা কাজের মাঝেই যায় না ফুরিয়ে, অকাজের লীলার মধ্যে যা' খোঁজে আপন মুক্তি। প্রাণ-ভাণ্ডারের সেই উদ্বৃত্ত সঞ্চয় উন্মুক্ত হয় যাঁর রস-সৃষ্টিতে তিনি আমাদের নমস্য। রসিকতা সহজসাধ্য বস্তু নয়; সমবেদনায় স্নিগ্ধ এর ললিত কান্তি—বুদ্ধির বিভায় এর অংগ ঝল্‌মল।

বিদ্রূপ করবার অধিকার আছে তাঁরই, বেদনার উৎস আছে যাঁর অন্তরে। দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয় ছিল মমতায় মেদুর; অশ্রুর কোমল মাধুর্যকে হাস্যের প্রসন্ন সৌন্দর্যে পরিণত করার ইন্দ্রজাল ছিল তাঁর। অন্তরের সমস্ত বেদনাকে দ্রাক্ষার মত দলিত ক'রে যে বিরল আসব তিনি পরিবেষণ ক'রেছেন তার নেশায় নেই উগ্র উন্মাদনার শেষে শ্রান্ত অবসাদ। কবির মায়া-রসায়নে যে করুণ রোদন হাসির রঙে হ'য়েছে রঞ্জিত, তার কুহক-স্পর্শে আমাদের প্রাণের সতর্ক-রক্ষিত ব্যথার স্থানটি নূতন বেদনায় গুম্‌রে ওঠে।

জাতির জীবনকে মধুর ও সুন্দর করাই সাহিত্যের কাজ; বিশেষত, যে জাতি বহুদিনের পরাধীনতার ফলে তার স্বাধীন আনন্দকে একরকম ভুলেই গিয়েছে, সেই দুঃখহত, দুর্ভাগ্য জাতির নির্বেদময় জীবনে নির্মল হাস্য-রস

যে কি অমূল্য সম্পদ্ তা' ব'লে শেষ করা যায় না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের এই হাসি কি কেবলই হাসি—চিন্তাশূন্য, প্রমোদসঙ্গী মনের অহেতুক, তরল উচ্ছ্বাস? না; এ হাসি অশ্রুরই রূপান্তর—এ যেন নীলাকাশের পটে স্বাতী নক্ষত্রের স্নিগ্ধ শোভা! বাইরে সুন্দর, কিন্তু বেদনার অণু-পরমাণু দিয়ে গড়া এর অবয়ব। দ্বিজেন্দ্রলাল আঘাত ক'রেছেন, কিন্তু সে আঘাত দ্বিগুণ হ'য়ে ফিরে এসে বেজেছে তাঁরই বুকে; তিনি হেসেছেন কিন্তু সে হাসির উজ্জ্বল ছটা যেন ক্রমশ ম্লান হ'য়ে করুণ বিষণ্ণতার মাঝেই গেছে মিলিয়ে! হাসি এবং কান্নাকে আপাতদৃষ্টিতে মানব-জীবনের সংবেদনার দুটি বিপরীত মেরু ব'লে মনে হ'লেও তাদের মধ্যে ব্যবধান খুবই সামান্য। তাই হাসিও সময় সময় হয় কান্নারই নামান্তর; কারুণ্যের উৎস-মুখেই তার উদ্ভব! বাহিরের রূপটি তার হীরকের মতই উজ্জ্বল, অথচ অন্তরে তার বেদনার প্রচ্ছন্ন ছায়া। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসি কতকটা এই জাতীয়। ব্যক্তিগত আঘাতের অসংবৃত উল্লাস এতে নেই—আছে সমাজ-জীবনের নানা অনাচারের বিরুদ্ধে বেদনাহত মনের ক্ষুব্ধ অসন্তোষ। এই সব সামাজিক ব্যাধির প্রতি অংগুলি-নির্দেশ ক'রেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, নির্মমভাবে চাবুক চালিয়ে তাদের দূর ক'রবার ক'রেছেন চেষ্টা, আর সে চাবুকের অনেকখানিই প'ড়েছে তাঁর নিজের পিঠে; কারণ তিনিও যে সমাজের একজন, সমাজের সে নিন্দা-গ্লানির স্পর্শ থেকে তিনিও তো নন মুক্ত! তাঁর রস-রচনা তাই Lampoon নয়, বিশুদ্ধ Satire.

এই প্রসংগে হাস্যরসের প্রধান প্রকার-ভেদগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক মনে করি। ইংরাজীতে Wit, Humour, Satire, Invective, Lampoon প্রভৃতি পরিভাষার সাহায্যে হাস্যরসের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারগুলি নির্দিষ্ট করা হয়। বাঙ্‌লা ভাষাতেও হাস্যরসের বিভিন্ন গ্রাম বা স্তরনির্দেশের জন্য রংগ, ব্যংগ, কৌতুক, শ্লেষ প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত আছে। নানা কারণে ইংরাজি অভিধাসমূহের নির্ভরযোগ্য প্রতিশব্দ হিসাবে এগুলি ব্যবহার করা চলে না; তা ছাড়া, শব্দগুলি আমরা অনেক সময়েই অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে ও

অসাবধানে ব্যবহার করি। সুতরাং ইংরাজি শ্রেণিবিভাগের অনুসরণই বোধ করি সংগত ও নিরাপদ্।

জীবনের নানা অসংগতি ও অসামঞ্জস্য কবি-হৃদয়ের সহজ সৌন্দর্য-বোধকে যে রূঢ় আঘাত করে তারই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি Humour. হাসির স্বচ্ছ আবরণ দিয়েই কবি জীবনের এই হাস্যকর অসংগতির দিকটা আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলেন। এর মধ্যে আছে উদার সহৃদয়তা ও গভীর করুণা; পূর্ণিমার প্রসন্ন কিরণে ধরণী যেমন মাধুরীময়ী হয়, আমাদের জীবনও তেমনি এই অনাবিল হাস্যধারায় হয় নিস্নাত ও নির্মল।

'Wit' এর মধ্যে আছে শব্দের তথা শব্দার্থের সূক্ষ্ম ও অপ্রত্যাশিত প্রয়োগ-কৌশলে কৌতুকের সৃষ্টি। পরিচিত পরিবেশের মধ্যে নূতনত্বের সম্ভাবনা নেই; তাই পলকের জন্য যখন এক ঝলক অচেনা আলোক বিজলীচমকের মত তার মধ্যে এসে পড়ে, তখন বিস্ময়-কৌতুকে মন হ'য়ে ওঠে চঞ্চল। Wit মনকে নাড়া দেয়, কিন্তু গহন মর্মতলে তার সাড়া জাগে না। আবেগ বা অনুভূতির চেয়ে বুদ্ধির তৃপ্তিবিধানের দিকেই তার অধিক লক্ষ্য। Pun, Epigram অথবা শ্লেষ, যমক প্রভৃতি এই শ্রেণিরই অন্তর্ভুক্ত।

Satire অনেকটা চক্রস্থ মধুরসের মত—সে রসের আস্বাদ পেতে হ'লে সংগে সংগে হুলের আঘাতকেও স্বীকার ক'রে নিতে হয়। কিন্তু Satire যেখানে কেবল রসবর্জিত নিষ্ঠুর আঘাতে পর্যবসিত, আঘাতের জন্যই যেখানে আঘাত, সেখানে তা' হ'য়ে দাঁড়ায় Invective; আর প্রকাশের দীপ্র মাধুর্য থেকে বঞ্চিত হ'লে তা' হয় ভাঁড়ামিরই নামান্তর। ব্যক্তিগত বিদ্বেষের তাড়নায় যে হাসির জন্ম, কান্তি-বৃত্তির প্রেরণায় নয়, তার নাম Lampoon। Lampoon-এ রচয়িতার চিত্ত-প্রকর্ষের অভাব সূচিত হয়, কারণ এর পিছনে নেই সমাজ-কল্যাণের কোন মহৎ পরিকল্পনা—অসূয়ার জারকরসে এ নিজেই জর্জর—সংকীর্ণ, বাঁকা পথে এর আনাগোনা।

Pope এবং Swift-এর মত দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় নেই প্রতিপক্ষের

অক্ষমতার প্রতি উপেক্ষা-কটাক্ষ, অথবা অধিক শক্তিশালী কবি-প্রতিভার প্রতি ঈর্ষ্যার বিষ-বর্ষণ।* 'Bickerstaff's Almanac' অথবা 'Dunciad'এ নয় —এর মধ্যে নেই বিদ্বেষের তীব্র জ্বালা—নেই সংস্কৃতি-শূন্য মনের রুচিহীন ব্যংগ-বিলাস। তরজা বা কবির লড়াই আমাদের দেশে ছিল চিরকালই এবং একটা সময় এসেছিল এদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে যখন এই গালাগালির সুর পৌঁছেছিল 'খেউড়' ও 'লহরে'র শেষ সপ্তকে। আণ্টুনি, ভোলা ময়রা, ঠাকুর সিংহ, রাম বসু প্রভৃতির ব্যংগ-রচনা সাহিত্যের পৃষ্ঠায় অতীতের সাক্ষি-রূপে আজও র'য়েছে অক্ষয় হ'য়ে। তাঁদেরই পায়ে-চলা পথ ধ'রে দ্বিজেন্দ্রলালও যদি মোটাসুরে শুধু খেউড়ের আলাপই ক'রতেন তবে তাঁকে আমরা অন্তরের পূজাসনে বসিয়ে শ্রদ্ধার নির্মাল্য নিবেদন ক'রতাম না।

বাঙ্‌লা সাহিত্যে বিশুদ্ধ Satire ডি. এল্. রায়ের নিজস্ব দান। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ, তাঁর দান অবিস্মরণীয়। অনেকেই হয়ত মনে করেন তাঁর নাট্য-প্রতিভা ছিল আরো বড় এবং নাটকের দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে গিরিশচন্দ্র ও তিনি এনেছিলেন উচ্চ-কোটির নাটকের বিপুল পরিপ্লব। একথা অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই যে তিনি ইতিহাসের—বিশেষত রাজপুত ইতিহাসের—শৌর্য-ও-গৌরবময় অধ্যায় থেকে সযত্নসংকলিত কাহিনী অবলম্বন ক'রে যে সব নাটক লিখে গিয়েছেন তার অনুপম সৌন্দর্যে বংগসাহিত্য চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। দেশ-প্রেমের উদাত্ত সুরে এগুলি বাঁধা—মুক্তির আনন্দ-স্বপ্নে উদ্বেল! আজও বাঙ্‌লার দূরতম পল্লীতেও এইসব নাটকের অভিনয় সহস্র সহস্র দর্শককে নিরাবিল আনন্দ ও তৃপ্তি দান ক'রছে। আজও চাণক্যের ভূমিকায় শিশিরবাবুর

---

*একমাত্র 'আনন্দ-বিদায়' নাটিকায় দেখা যায় এর ব্যতিক্রম এবং এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বিষোদ্গার আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং এই অভিযোগ অস্বীকার ক'রে ব'লেছেন, "এই নাটিকায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই। 'মি'র প্রতি আক্রমণ আছে। ন্যাকামি, জ্যেঠামি, ভণ্ডামি ও বোকামি লইয়া যথেষ্ট ব্যঙ্গ করা হইয়াছে।" এই উক্তি কিন্তু সত্য ব'লে মেনে নেওয়া কঠিন হয়; গানিকাগুলি এবং সংলাপের কোন কোন অংশ প'ড়লেই বেশ বোঝা যায় যে আক্রমণের উদ্দেশ্যটা উহ্য হ'লেও গুহ্য নয়।

অভিনয় দেখবার জন্য নাগরিক জনতার কি উৎকণ্ঠিত আগ্রহ! এই সব নাটকের লোকময়তা সত্ত্বেও একথা অসংকোচে বলা চলে যে নাটকের পক্ষে এগুলি একটু বেশিমাত্রায় আবেগধর্মী এবং এমন অনেকস্থলেরই উল্লেখ করা যেতে পারে যা সত্যিই 'clap-trap'। নাটকীয় চরিত্রের পরিস্ফুটনে যে নির্লিপ্ত দৃষ্টিভংগি থাকা একান্ত প্রয়োজন তার অভাব অনেকস্থলেই চোখে পড়ে। তাই চিতোরের রুক্ষ বন্ধুরতার মধ্যেও দেখি শ্যামা বাঙ্‌লার স্নিগ্ধ সুষমা। অবশ্য এদের ভাষা, স্থানে স্থানে মুদ্রাদোষ-দুষ্ট হ'লেও, সুন্দর, সাবলীল, বেগবান্ ও কবিত্ব-মণ্ডিত এবং বিশেষ ক'রে এই লীলায়িত, পুষ্পিত ভাষাই এদের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্র তাঁর চেয়ে উচ্চতর আসন দাবী কর্‌তে পারেন। মানব-জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল আরও গভীর ও ব্যাপক, সমাজের ছোট-বড় নানাস্তরের লোক-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল বিস্ময়কর; ইতিহাসের যে অতীত অধ্যায় নিয়ে তিনি নাটক রচনা ক'রেছেন তাকে পুনরুজ্জীবিত ক'রবার প্রতিভা ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ। যে সময়ের ও যে সব মানবের রূপ-ছবি কবি এঁকেছেন তাদের উপরে পড়ে নি একালের কোন স্পর্শ—এ যুগের মনকে নিয়ে গিয়েছেন তিনি আর এক যুগে—বিগত ও বর্তমানের মাঝে ক'রেছেন মিলনের দৌত্য। বিশ্ব-বৈচিত্র্যকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখবার শক্তি যা নাট্যকারের শ্রেষ্ঠ সম্বল, তা ছিল তাঁর পূর্ণমাত্রায়; তাই তিনি এত বড়! মাথা-গুণতি হিসাবের দিক দিয়ে নয়—তাঁর সৃষ্টির অন্তর্লীন মহত্ত্বের বিচারে।

মোট কথা, আমার বক্তব্য দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যকার হিসাবে বড়, কিন্তু তার চেয়েও তিনি বড় হাস্য-রসস্রষ্টা হিসাবে। 'হাসির গান' তাঁর অতুলনীয় অবদান—নিজস্ব ও অপূর্ব। অবশ্য এদের মধ্যে নেই শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত উদার রসরসিকতা যা' অন্তরের সহজ আনন্দে চঞ্চল, প্রাচুর্যের ঐশ্বর্যে ঝলমল, শেক্স-পীয়রের হাসির মত যা 'broad as ten thousand beeves at pasture'। থাকার কথাও নয়, যেহেতু এদের আকার এবং প্রকার দুইই ভিন্ন; এদের লক্ষ্য

হ'লো আঘাত দিয়ে জাগিয়ে দেওয়া; সুখসুপ্ত, আত্ম-বিস্মৃত জাতিকে জীয়ন-কাঠির পরশ দিয়ে বাঁচিয়ে তোলা—অনুকরণ-লোলুপ, অন্ধ সমাজকে দেশের সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহশীল ও অনুরাগী ক'রে তোলা। পেশাদার বিদূষকের সস্তা ভাঁড়ামি এ নয়, হাল্‌কা হাসির তরল উচ্ছ্বাসও নয়, বেদনার গভীরতম অনুভূতির উৎসমুখে এদের জন্ম। রবীন্দ্রনাথের হাসির মধ্যে যে স্বচ্ছ শুভ্রতা, যে দীপ্তি ও শালীনতা আছে, দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থে তা একান্ত দুর্লভ। অবশ্য অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস বুদ্ধির সন্তোষ-বিধান যে পরিমাণে করে, প্রাণকে নাড়া সে পরিমাণে দেয় না; এ কেবল রঙিন কথার আবির-খেলা! কোন কোন স্থলে এ উক্তি সত্য প্রমাণিত হ'লেও, এটা তাঁর রস-রচনার নিয়ম নয়, নিয়মের ব্যতিক্রমমাত্র। যাঁরা তাঁর 'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রভৃতি প্রহসন প'ড়েছেন তাঁরাই জানেন কি অনাবিল ও অনায়াস সেই হাস্যোচ্ছ্বাস। অসংলগ্ন ভাবের কলিকাগুলিকে সহসা একটি মিলনের মালিকায় গেঁথে তুলে মাঝে মাঝে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে চমৎকৃত করেন সত্য, কিন্তু তাঁর বিশদ হাসিতে আছে শুধু 'দন্তরুচি'র 'কৌমুদী-বিকাশ', দশনের দংশনস্পৃহা সেখানে আদৌ নেই।

'হিং টিং ছট্' রবীন্দ্রনাথের ব্যংগাত্মক কবিতার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু তার গঠন-প্রকৃতি ও বর্ণন-শৈলী দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যংগ-কবিতার অনুরূপ নয়। সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপের আঘাত সেখানে আছে, কিন্তু এর অন্তরতম ইংগিতটি এতই গূঢ় ও প্রচ্ছন্ন যে তার রসোপলব্ধি মর্মজ্ঞ পাঠকের অনুচিন্তনের অপেক্ষা রাখে। অথচ কবিতাটি আদ্যন্ত এমন অনুপম হাস্যধারায় অনুষিক্ত—এর ঘটনা-সংস্থান এত অদ্ভুত ও বিসদৃশ যে এর গভীরতম স্তরে না পৌঁছেও এর অনাহত রসধারার ঊর্মিলীলার তালে তালে আমাদের মন ভেসে চলে। 'কৌতুকে'র কবিতাগুলিও অনেকটা এই পর্যায়ের; সেখানেও আঘাত-দেওয়াটা গৌণ, আনন্দ-দানই তার প্রকৃত তাৎপর্য। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় কিন্তু আঘাতই অধিক, আনন্দাংশ অল্প। এক কথায়, রবীন্দ্রনাথ মূলত humorist, দ্বিজেন্দ্র-

লাল satirist। এই প্রসংগে আমরা পাঠকগণকে দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিলাত-ফের্তা' ও রবীন্দ্রনাথের 'উন্নতি-লক্ষণ' শীর্ষক কবিতা দুটি প'ড়ে দেখ্‌তে অনুরোধ করি।

তা ব'লে 'কৃষ্ণ-রাধিকা-সংবাদ' বা 'রাম-বনবাসে'র রুচির আমরা প্রশংসা করি না। যুগে যুগে যে সব নরচন্দ্রমা মানুষের মনে প্রীতির পুষ্পাসনে অধিষ্ঠিত, তাঁদের নিয়ে এরূপ ব্যংগ-বিদ্রূপ নিছক ছেলে-খেলা, আমার তো মনে হয় 'sacrilege' এর কোঠায় গিয়ে পড়ে। আর এতে লাভই বা কি? এ কেবল মজার জন্যই মজা—বড়কে শুধুশুধুই ছোট করা—মানুষের প্রাণের ঠাকুরকে পূজার বেদীপীঠ থেকে টেনে এনে ধূলার মাঝে লুটিয়ে দেওয়া। প্রশ্ন জাগে, গণনারায়ণের প্রতি কবির এ মর্মান্তিক পরিহাস কিসের জন্য? উত্তর খুঁজে পাই না। কৈফিয়ৎ স্বরূপ দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'কল্কি-অবতারে'র ভূমিকায় লিখেছেন, "স্থানে স্থানে দেবদেবী লইয়া একটু আধটু রহস্য আছে। তাহা ব্যঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে নহে। গ্রন্থখানির দেখান উদ্দেশ্য, সমাজ-বিভ্রাট। তাহা দেখাইতে গেলেই দেবদেবীবিষয়ক একটু আধটু কথার অবতারণা অপরিহার্য্য। বঙ্কিমবাবু ও দীনবন্ধুবাবুর লেখনীপ্রসূত দেবদেবী-বিষয়ক রহস্যে যখন কাহাকেও কখন আপত্তি করিতে শোনা যায় নাই তখন এ দীনের দুই এক স্থলে অতি সামান্য রহস্যগুলিতে কাহারও আপত্তি প্রকাশ করা রাগের কথা।" 'হিন্দুসমাজ ধর্মের সহিত দৃঢ় সংশ্লিষ্ট' অতএব দেবদেবী-দের নিয়ে রহস্য কর্‌তেই হবে অথবা 'বঙ্কিম-দীনবন্ধু তাঁদের নিয়ে রহস্য ক'রেছেন তাতে যখন আপত্তি হয়নি তখন আমার বেলায় হ'বে কেন' এরূপ যুক্তির মর্ম অনুধাবন ক'রতে আমরা অক্ষম। 'গীতার ব্যাখ্যা' সম্বন্ধে কিন্তু আমরা এ আপত্তি করি না। কথায় কথায় আমরা বেদ, উপনিষদ্‌, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের দোহাই পাড়ি, বড়াই করি, যদিচ এদের সংগে পরিচয়ের দৌড় অনেকেরই ঐ নামগুলি পর্যন্ত। সত্যই 'গীতার মত নাইক শাস্ত্র, গীতার পুণ্যে বাঁচি; বেঁচে থাকুক গীতা আমার—গীতায় মরে আছি'—এই ব্যংগোক্তি আমাদের অনেকের পক্ষেই একটুও অত্যুক্তি নয়। এই যে দায়িত্বহীন

অন্ধ আত্ম-প্রসাদ এতে দেশের সর্বনাশ ডেকে আনছে—জাতিকে মেরুদণ্ডহীন ক্লীবে পরিণত ক'রছে, এর উপরে চাবুক চালাবার প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। 'বিলাত-ফের্তা,' 'Reformed Hindoos', 'নন্দলাল,' 'জিজিয়া কর', 'পাঁচটি এয়ার', 'তা সে হবে কেন', 'ব'দ্‌লে গেল মতটা', 'হিন্দু', 'হ'তে পারতাম' প্রভৃতি গান ও কবিতা তাঁর এই ধরনের কবিতার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। কৃপাণের মত শাণিত এদের ভাব ও ভাষা, মহান্‌ কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত, বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল, আঘাতের নির্মমতায় অমোঘ। 'নন্দলাল'কে আমরা বাল্য হ'তেই জানি; তার আলেখ্যের মুকুরে আমরা আমাদের নিজস্ব রূপটিকেই প্রতিবিম্বিত দেখি। ভীরুতা আমাদের অস্থি-মজ্জায়, বাহিরের কোন সজ্জা দিয়েই তো সে লজ্জা ঢাকা যায় না! জীবনের জন্য এই যে মমতা, ভৌতিক দেহটার প্রতি এই যে লুব্ধ লালসা তা কি আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা চিহ্নিত দুর্বলতা নয়? যতই মোহমুদ্‌গরের শ্লোক আওড়াই প্রাণের মায়ায় আমরা পংগু ও নিশ্চল; কাজেই মুগুর যেখানে নিষ্ক্রিয়, শাণিত অস্ত্রের ব্যবস্থাই বোধ হয় সেখানে সংগত ও শোভন। নন্দলাল টাইপ্‌; তার আঘাতের বেদনা সমস্ত বাঙালীর মর্মে গিয়ে বাজে! "নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়; হাঁটিতে সর্প, কুকুর আর গাড়ি-চাপা-পড়া ভয়; তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল! সকলে বলিল—ভ্যালারে নন্দ বেঁচে থাক্‌ চিরকাল!" সকলের সম্মিলিত আশীর্বাদ নিষ্ফল হয় নি; বাঙ্‌লা সাহিত্যে নন্দলাল অমর হ'য়েই বেঁচে আছে!

দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বেও রংগনাট্যের কিছু কিছু নিদর্শন আমরা পাই। সাধারণত এগুলি প্রহসন নামে পরিচিত। উদাহরণস্বরূপ বাঙ্‌লার প্রথম নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের 'চক্ষুদান' প্রহসনখানির উল্লেখ করা যেতে পারে। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী', 'জামাই-বারিক্‌' প্রভৃতির নাম কে না জানে? তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যেও অনেকে সমাজ ও দেশের বহু অনাচারের কঠোর সমালোচনা ক'রে ব্যংগ বা কৌতুক-নাট্য রচনা ক'রেছেন। অমৃতলালের এই

শ্রেণীর 'রূপক'-রচনাগুলি এক সময়ে বাঙলার বিদগ্ধ-সমাজে সমাদর লাভ ক'রেছিল প্রচুর। কিন্তু এই জাতীয় সাহিত্যের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের রস-রচনার একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রহসনও তিনি লিখেছেন কয়েকখানি * কিন্তু এগুলি সেরূপ জনাদর লাভ করে নি। তার প্রধান কারণ স্বল্প পরিসরের মধ্যে ব্যংগগুলি যেমন সূচ্যগ্র হবার অবকাশ পেয়েছে এবং একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের চারিপাশে স্বতই বিকশিত হ'য়ে উঠেছে, দীর্ঘ ও বহু-চরিত্র-বিচিত্র রচনার মধ্যে সে সংহতি ও সুষমা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় নি। তা ছাড়া, দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মমূলক নাটকগুলি কারু-সৌন্দর্যে এতই হৃদয়হারী হ'য়েছে যে তাঁর প্রহসনের প্রকর্ষও তাতে অনেকখানি ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে। অমৃতলালের প্রহসনগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবি-কৃতি: দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে এর বিপরীত উক্তিই বোধ করি করা চলে। সমাজের দোষ-ত্রুটিগুলি নিয়ে নিছক কৌতুক করা তিনি পছন্দ করেন নি। তিনি যা লিখেছেন তা রংগ নয়, তীব্র ব্যংগ—অলস কৌতুক-বিলাস নয়, ক্ষুরধারনিশিত মর্ম-ভেদী সংকেত; লক্ষ্য তার—নির্মম অভিঘাতে জাতির অবনত মেরুদণ্ডকে ঋজু ও বলিষ্ঠ ক'রে তোলা। দেশের গৌরবই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য—দেশের প্রতি মমতায় ওতপ্রোত ছিল তাঁর অন্তর—তাই বেছে নিয়েছিলেন তিনি জীবনে জাতির কল্যাণ-সাধনের এই মহৎ ব্রত এবং তাই আজও আমরা তাঁকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি—এই ক্ষমাহীন আঘাতকারীকে অন্তরের পুজাসনে বরণ করি। যে অকৃত্রিম দেশানুরাগ প্রবুদ্ধ ক'রেছিল তাঁকে 'মেবার-পতন', 'রাণা প্রতাপ' প্রভৃতি আবেগ-মুখর নাটকগুলি লিখ্‌তে, সেই অনুপম দেশ-প্রীতিরই এক সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকাশ দেখি তাঁর ব্যংগ-রচনায়। সাহিত্য যদি জীবনের সমালোচনা হয়, তবে দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান' জাতির ভাব-ভাণ্ডারে বহুমূল্য রত্নের মতই সযত্নে সঞ্চিত থাকবে। কেউ যেন মনে না করেন যে এই সাহিত্য বিনাশধর্মী অথবা জাতির অগ্রগতিমাত্রকেই তিনি সংশয়ের চোখে দেখ্‌তেন। ধর্মান্ধতা বা গোঁড়ামি দূরে থেকেও

* ত্র্যহস্পর্শ, প্রায়শ্চিত্ত, কল্কি-অবতার, আনন্দ-বিদায়, পুনর্জন্ম

তাঁকে স্পর্শ করে নি কোন দিন, চিন্তায় ও কর্মে তিনি ছিলেন খাঁটি যুক্তিবাদী। যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে, দীপ্ত বুদ্ধিশ্রীই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। আবার অন্যদিকে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় আবেগ-প্রবণ, তাই যুক্তির সমস্ত সমারোহ সহজেই ভাবের কোমলতার মাঝে গেছে মিলিয়ে।

এই প্রসংগে একটি নাম বারবার মনে পড়ে। বাঙ্লা সাহিত্যে হাস্য-রসের আলোচনা অংগহীন হ'বে তাঁকে বাদ দিলে। আমি গুপ্ত-কবির কথা ব'লছি। কবির দলের অনেক গান বেঁধে দিতেন তিনি; ব্যংগ-রচনায় ছিল তাঁর সহজ পটুত্ব। বাল্যে ও কৈশোরে স্নেহহীন পিতা ও বিমাতার অযত্ন-অনাদরে বর্ধিত হ'য়ে তিনি সংসারকে দেখতে শিখেছিলেন ঈর্ষ্যা ও সংশয়ের দৃষ্টিতে, তাই তাঁর প্রত্যেক রচনার মধ্যে এই বিরাগের সুরটি বড় বেসুরা বাজে। ফলকথা, যে উদার সুরে বীণা বাঁধলে তা'র তারে তারে আশা ও আশ্বাসের অমৃত-সংগীত বেজে ওঠে, তার সন্ধান তাঁর রচনায় কচিৎ পাওয়া যায়। যে উদার আলোর পরশ লাগলে মর্মক্ষতের্ সকল জ্বালা যায় জুড়িয়ে, সে বিকচ-সুন্দর হাস্যরুচি তাঁর কাব্যে কোথায় আছে? অনেক সময়েই ব্যক্তিগত আক্রোশের নিরাবরণ প্রকাশে তাঁর রচনা হ'য়ে উঠেছে জ্বালাময়; তাঁর বিদ্রূপ-শরের সূচি-মুখে আছে যে গরল-প্রলেপ তার প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত অন্তর ওঠে বিষিয়ে। অথচ স্বাভাবিক কবিত্ব-প্রতিভায় তিনি ছিলেন না কারও চেয়ে ছোট, জীবনের অসংগতিকে উপলব্ধি করবার এবং তাকে তির্য্যগ্-ভংগিতে প্রকাশ করবার নৈপুণ্য ছিল তাঁর জন্ম-সিদ্ধ। বংকিমের ভাষায়, "তোমরা পৌষ-পার্বণে পিঠাপুলি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও, তিনি তার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন। অন্যে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদাফুল সাজাইয়া কষ্ট পায় ঈশ্বর গুপ্ত মক্ষিকাবৎ তাহার সারাদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অন্যকেও উপহার দেন।" ১২৫৩ সালে কবি 'পাষণ্ড-পীড়ন' নাম দিয়ে একখানি সংবাদ-পত্র প্রকাশ করেন; এই পত্রের সহিত গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'রসরাজে'র নিয়তই তুমুল বাগ্-যুদ্ধ চ'লত। যা হোক, এ সকল সাময়িক ও একান্ত ব্যক্তিগত প্রসংগের সাহি-

ত্যিক মূল্য যৎসামান্য এবং তা চিরদিন মনে ক'রে রাখ্‌বার যোগ্যও নয়। এই প্রকার সাময়িক অসার ও লঘু সাহিত্য ব্যাঙের ছাতার মত সব দেশেই গজিয়ে ওঠে অজস্র; একমাত্র তথ্যলোলুপ ঐতিহাসিক ছাড়া পথি-পার্শ্বের এই অনাদৃত ও বিস্মৃতপ্রায় বিষবল্লীর সন্ধান কেউ করে না।

তাই ব'লে একথা মনে করলে ভুল হবে যে গুপ্তকবি ভাষা-সাহিত্যের ভাণ্ডারে চিরস্থায়ী সম্পদ্‌ কিছুই দিয়ে যান নি। তাঁর রচনায় চিত্তপ্রকর্ষ ও মার্জিত-রুচির অভাব আছে সত্য, কিন্তু তা সমাজ ও জাতির জীবনে স্থায়ী কল্যাণের কোন ইংগিত করে নি একথা সত্য নয়। এই কারণেই আমরা সুধীরঞ্জনের —"তোমার ঈশ্বরচন্দ্র কবিতা-রচক। লোকের হিতের হেতু লেখে না পুস্তক।"— এই আক্ষেপোক্তির সমর্থন ক'রতে অসমর্থ। নিম্নে গুপ্তকবির রংগ-রচনার একটু নমুনা উদ্ধৃত হ'লো; আশা করি পাঠকগণ এর রস-সুষমায় মুগ্ধ হবেন:—

"লোভ নাহি থেমে থাকে, খাই তাই চোটে। পিটেপুলি পেটে যেন ছিটেগুলি ফোটে॥ ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম, ধন্য সব লোক। কাহনের হিসাবেতে আহারের ঝোঁক॥ কর্তাদের গালগল্প গুড়ুক টানিয়া। কাঁটালের গুঁড়ি প্রায় ভুঁড়ি এলাইয়া॥ দুই পার্শ্বে পরিজন মধ্যে বুড়া ব'সে। চিটে গুড় ছিটে দিয়ে পিটে খান ক'সে॥"

তবুও দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় জাতি ও সমাজের প্রতি যে মমত্ব-বুদ্ধি, তার দৈন্য-দুর্বলতায় যে ঐকান্তিক ব্যথা-বোধ রূপায়িত হ'য়েছে, ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যংগ-চিত্রে কদাচিৎ তার সন্ধান মিলে। যে অসংগতি আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরটিকে আলগোছে ছুঁয়ে যায়, বেদনায় গভীরতম স্তরে গিয়ে আঘাত করে না, জীবনের সেই হাল্‌কা হাসির দিকটাই বিশেষ ক'রে স্থান পেয়েছে তাঁর কাব্যে। অন্যথা বিদ্বেষের বিষ-দংশনে তাঁর রচনা হ'য়েছে রূঢ় ও নির্মম। তার মধ্যে দাহ আছে, দীপ্তি নেই; হুলের জ্বালা আছে, মধু-রসের মাধুরী নেই। "ছোঁড়া হ'য়ে তুড়ি মারে টপ্পা গীত গেয়ে। গোচে-গাচে বাবু হন পচা শাল চেয়ে॥ কোনরূপে পিত্তি-রক্ষা এঁটোকাঁটা খেয়ে। শুদ্ধ হন

খেনো গাঙে বেনো জলে নেয়ে॥" প্রভৃতি সত্যই উপভোগ্য। তিনি ছিলেন মেকির আজন্ম শত্রু। মেকি সাহেব, মেকি পণ্ডিত, মেকি বাবু, ছদ্ম মিশনারি কেউই তাঁর হাতে নিস্তার পান নি। মেকি বাবুর প্রতি তাঁর নিদারুণ উষ্মা উপরের কবিতাংশে প্রচণ্ডভাবে ব্যক্ত হ'য়েছে। তা ছাড়া, ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্য স্থানে স্থানে বাস্তবিকই অশ্লীল; অবশ্য বংকিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-গুরুর এই গুরু অপরাধেরও সাফাই গেয়েছেন, কিন্তু একথা কখনই অস্বীকার করা যায় না যে সূক্ষ্ম রুচিবোধের অভাব তাঁর কাব্যে প্রায়শই লক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর 'বিধবা-বিবাহ' শীর্ষক কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এ হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য অনেক উচ্চস্তরের—যদিও রসিকতা সব সময়ে সেরূপ সূক্ষ্ম ও চিত্তহারী নয়। ঈশ্বরচন্দ্রের 'ছদ্ম মিশনারি' কবিতাটি আদ্যন্ত শুভ্র হাস্যচ্ছটায় উদ্‌ভাসিত। 'হেদো বনে রাঙা-মুখো কেঁদো বাঘের' বর্ণনায় অথবা 'শাদা কালো কটা রূপ বলিহারি গুণে। সাত পাত ভাত মারি ভ্যাভ্যা রব শুনে।' ইত্যাদি পাঁঠা-প্রশস্তি পাঠ ক'রে হাসির হিল্লোলে দুলে ওঠে না এমন পাথরের মন সংসারে দুর্লভ; প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে 'পাঞ্জাব মেলের কলিশন্‌', 'পিঠের উপর র‍্যাদা-চালান', এমনকি 'পিসিমা'কে স্মরণ ক'রেও হাসির বেগ সংবরণ করা দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে। অথচ আগেই ব'লেছি এগুলি নিছক মজা—ঈর্ষ্যা-স্পর্শ-শূন্য, উদ্দেশ্যবিহীন; নৃত্যপরা, নূপুর-মুখরা তটিনীর মত ব'য়ে চ'লেছে লীলায়িত, ললিত ছন্দে। ঠিক এই ধরণের স্বচ্ছ, সলীল রংগরস অল্পই পাওয়া যায় দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে, যদিও 'সন্দেশ' প্রভৃতি কবিতার ভিতরে এই হাল্কা সুরের আমেজ কতকটা ধরা পড়ে। কিন্তু গুপ্তকবির ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি আক্রমণগুলি বড় তীক্ষ্ণ—বড় নিষ্ঠুর; আঘাত দিয়ে কাঁদাবার আগ্রহ তাঁর নিরতিশয় উগ্র—করুণার কম্র স্পর্শে হয় নি সেগুলি স্নিগ্ধ-সুন্দর। সমষ্টি থেকে নিজেকে পৃথক্ করে সমাজকে ক'রেছেন তিনি অজস্র কটু-বর্ষণ, বিরাগ ও বিদ্বেষের পূতি-গন্ধে তাঁর রচনা হ'য়েছে ক্লিন্ন ও দুঃসহ। এগুলি খাঁটি invective; satire নাম দিলে এদের সম্মান করা হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টিভংগি কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি গালি দিয়েছেন এবং সে গালি নিজে খেয়েছেন; নিরপেক্ষ দ্রষ্টার মত নিরাপদ্ দূরত্ব থেকে তিনি দেখেন নি জীবনকে—সুখদুঃখ-বিচিত্র সংসার-লীলায় তাঁর প্রাপ্য ভূমিকাকে নিয়েছেন মাথা পেতে। তাঁর 'Reformed Hindoos,' 'বিলাত-ফের্তা' প্রভৃতি কবিতায় আমরা তার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাই। ইংগ-বংগ সমাজের আচার-ভ্রষ্টতাকে তিনি নির্মম শ্লেষকশাঘাতে অনাবৃত ক'রে ধ'রেছেন; '**a queer amalgam of** শশধর, Huxley and goose' নব্য হিন্দু-সমাজকে আঘাত দিয়ে লজ্জা দেবার চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু তার আগে হীনতার বেদনায় নিজে হ'য়েছেন মর্মে মর্মে অনুবিদ্ধ।

একটি বিষয়ে কিন্তু এই দুই কবির মধ্যে আশ্চর্য ঐক্য দেখা যায়। দুজনেই স্বদেশ-প্রেমিক—দেশমাতৃকার মুক্তিস্বপ্নে দুজনেরই চিত্ত বিভোর। দ্বিজেন্দ্র-লালের দেশ-হিতৈষা তাঁর নাটকগুলির মধ্যে গৈরিকস্রাবের মত উচ্ছ্বসিত। এদের সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে যেসব উদ্দীপ্ত সংগীত তিনি শুনিয়েছেন—'মানুষ হবার' যে মহনীয় আদর্শ আমাদের সামনে ধ'রেছেন, বাঙ্‌লা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্যও তাঁর অন্তরের নিজস্ব সম্পদ্,—'কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'—এ কেবল কথার কথা নয়; এর প্রত্যেকটি অক্ষর তাঁর মর্ম-শোণিতে অনুরঞ্জিত! মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগও দুই কবির সমান প্রবল। 'মাতৃসম মাতৃভাষার' বন্দনা-গান ক'রেছেন দুজনেই ভক্তি-প্লুত, আবেগকম্পিত কণ্ঠে। উভয়ের মধ্যে এই সাদৃশ্য কি নিতান্তই আকস্মিক? আমার তো মনে হয় দ্বিজেন্দ্রলালও, বংকিম-দীনবন্ধুর মত প্রত্যক্ষরূপে না হ'লেও, সম্ভবত গুপ্তকবির কাব্য-উৎস থেকে পেয়েছিলেন তাঁর কবি-জীবনের অনুপ্রেরণা। উভয়ের কাব্যালোচনা থেকে উদ্ভূত আমার এই ধারণা; ঐতিহাসিকের কষ্টিপাথরে সত্য ব'লে প্রমাণিত না হ'লেও আমার ক্ষুব্ধ হবার কারণ নেই।

কবি মোহিতলাল

রবীন্দ্রোত্তর যুগে কাব্য রচনা করিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন কবি মোহিতলাল মজুমদার তাঁহাদের অন্যতম। মোহিতলালের কবি-প্রতিভার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে; ইহা রবীন্দ্রনাথ অথবা পূর্ববর্তী অন্য কোন কবির অনুকরণমাত্র নহে। এই স্বকীয়তার জন্যই তিনি বাঙ্‌লার সারস্বত-মন্দিরে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন ও থাকিবেন।

তাঁহার কাব্যবিচার-প্রসংগে প্রথমেই যাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইল তাঁহার দৃষ্টি-ভংগির অভিনবত্ব। ইহা সম্পূর্ণ আদর্শবাদমূলক নহে। দেহ-কামনাকে স্থূল বলিয়া তিনি পরিহার করেন নাই—মানুষের সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে আদর্শ-সিদ্ধির অন্তরায় বলিয়া তিনি মুখ ফিরান নাই। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-নিচয়কে সত্য ও সুন্দর বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাই বলিয়া অতি-আধুনিক কবিদের মত মানুষের এই জৈব সত্তাকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লন নাই। এই ইন্দ্রিয়জগতের বাহিরে যে প্রাণময় অতীন্দ্রিয় জগৎ আছে—অভিব্যক্ত জগতের অন্তরালে যে সূক্ষ্ম অন্তর্লোক অহরহ মানুষকে তাহার আহ্বান জানাইতেছে, সেই অনুক্ত সংকেত তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে এবং তিনি তাহাতে সাড়াও দিয়াছেন। জৈব ও অতিজৈব উভয়বিধ সত্তাকেই তিনি সমান সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার কাব্যের তীর্থসংগমে আমরা এই দুইটি ধারারই একটি শোভন মিলন দেখিতে পাই। প্রেম তাঁহার নিকট কামগন্ধশূন্য একটি দিব্যভাবমাত্র নহে, তাহার মধ্যেও তিনি ভোগবতীর অন্তঃসলিলা ফল্গুধারাটি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়সম্ভোগের সোপান বাহিয়াই দিব্যপ্রেমের অমরাবতীতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতাই যেখানে ভালবাসার শেষ কথা—পথ ও লক্ষ্য দুইই—প্রেমের পরিপূর্ণ রূপটি সেখানে প্রতিফলিত হয় না। একদিকে ইন্দ্রিয়বৃত্তির কৃত্রিম

নিরোধকে তিনি কিছুতেই মানিয়া লইতে পারেন নাই, অন্যদিকে তাহাকেই চরম বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। মানব-প্রকৃতির এই দুইটি ধারাকে আপাত-দৃষ্টিতে ভিন্নমুখী বলিয়া মনে হইলেও স্বরূপত উহারা এক, তাই একটিকে বাদ দিয়া অন্যটির উপর জোর দিলে জীবনকে খণ্ডিত করিয়া দেখা হয়—তাহার অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন রূপ-সুষমাটী ধরা পড়ে না। (মোহিতলালের কবিকল্পনা অনুভূতির সূক্ষ্ম সূত্র দিয়া বস্তু-বিশ্বের স্থূল রূপচিত্রগুলিকে অস্পর্শ্য অতীন্দ্রিয়ের সহিত গাঁথিয়া তুলিয়াছে; যদিও সম্ভোগের দিক্‌টাই প্রবল ও প্রধান হইয়া উঠায় ভাবাদর্শের দিক্‌টা কতকটা গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।) ভোগপ্রবৃত্তি মনুষ্যচরিত্রের সহজাত প্রবৃত্তি; কামনার পরিস্রুত রূপই প্রেম। দেহ-সম্বন্ধের বাহিরে স্বতন্ত্র কোন প্রেম-লোক নাই—'কামেরই সে ভিন্নরূপ'—ইহাই প্রতি-পন্ন করিতে গিয়া ত্যাগ অপেক্ষা ভোগের দিক্‌টার উপরই জোর পড়িয়াছে বেশী। কবি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, 'নারী সে যে চির-উদাসিনী, তবু তার হৃদয়-পরাগে কামনার মধুগন্ধ'। উপর-উপর তাঁহার কাব্য আলোচনা করিতে গিয়া হঠাৎ মনে হইতে পারে গ্রীক্ ব্যাকাস্-উপাসকদের মতই বুঝি তিনি ভোগ-দেবতার পূজারী। আসলে কিন্তু তিনি রূপ ও অপরূপকে একাকার করিয়া দেখিয়াছেন। 'স্মরগরলে'র অনেক স্থলেই তাই কল্প-সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ রূপসৌন্দর্যের উপরে আসন দেওয়া হইয়াছে,) কিন্তু দেহ হইতে দেহাতীতে গতায়াতের পথটি বেশ সুচিহ্নিত নয়। তাই সময় সময় সঞ্চরণ-ক্রমটি অনুসরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। তাই বলিয়া অমিশ্র প্রেয়োবাদ ছাড়া যাঁহারা মোহিত-লালের কাব্যে আর কিছুই দেখিতে পান না তাঁহাদের অভিমতকে সমর্থন করা যায় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ 'নারী-স্তোত্র' কবিতাটাই ধরা যাক। যদিও ভাবকল্পনায় বিভোর হইয়া যাহারা নারীকে তাহার দেহ-দেহলী হইতে বাহির করিয়া কল্পিত দেব-দেউলে মানসীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় এই কবিতায় তাহাদের প্রতি সুস্পষ্ট কটাক্ষ আছে—এই অলীক ছায়া বা মায়াবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ

আছে, তবুও স্থূল দেহ-কামনার মধ্যেই নারীর সীমা এই সত্য-স্বীকৃতির মধ্যে কোথায় যেন একটি দ্বিধার ভাব মিশিয়া আছে। তাই কেবল দেহ-সাধনার গান গাহিয়াই তিনি তৃপ্ত হইতে পারেন নাই—তাই নারীকে দেবী-পদবী দিয়া যাহারা পূজা করিয়াছে তাহাদের প্রতি উদ্দিষ্ট নিন্দাও যেন কতকটা ব্যাজস্তুতির মতই শুনায়। প্রিয়তমা বিয়াত্রিচের প্রতি অমর কবি দান্তের প্রেমের যে দিব্য সংগীত এই কবিতায় একটি স্তবকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে রূপসাধক কবির সৌন্দর্য-প্রতিমা নারীর প্রতি বন্দনা বলিয়াই সন্দেহ হয়।

যদি নিছক প্রেয়োবাদই কবির অভিপ্রেত হইত— তাঁহার জীবনদর্শন যদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সম্ভোগ-সন্ধানেই নিঃশেষিত হইত তবে তাহা কখনই 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' কাব্যরসের দিব্যভূমিতে উত্তীর্ণ হইতে পারিত না। বাস্তব ও কল্পনাকে মিলাইয়া, ভোগ ও ত্যাগ উভয়কেই অংগীকার করিয়া একটি পূর্ণাংগ রসসৃষ্টিই এই কবি-দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। কল্পনার স্বপ্নতন্তু দিয়া ইন্দ্রজাল রচনা ইহার লক্ষ্য নহে ;—লৌকিক নীতিবুদ্ধির নিকষে ইহার মূল্য-নিরূপণও সম্ভব নহে। নারী 'সতী কি অসতী' সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর ; কামনা ও কল্পনায় মিশান জীবন্ত নারীত্বই কবির উদ্দিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে দেহ বলিতে কবি যাহা বুঝিয়াছেন তাহা পাঞ্চভৌতিক দেহমাত্রই নহে—দেহ-আত্মায় একীভূত একটি যৌগিক সত্তা। আত্মাকে কবি দেহনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া স্বীকার করেন নাই—দেহের অস্তিত্বেই তাহার অস্তিত্ব; কিন্তু তাই বলিয়া এই দেহ-বাদ অবিমিশ্র বস্তুবাদও নহে। দেহ নশ্বর এবং আত্মা অবিনশ্বর এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া বাস্তবকে তুচ্ছ করিয়া শূন্যময় স্বপ্নলোকে যাহারা আত্মার মৃগয়া করিয়া বেড়ায় কবি তাহাদের সহিত একমত নহেন। তাই মারজয়ী বুদ্ধের নিবৃত্তি-মূলক শূন্য-সাধনা কবির দৃষ্টিতে অলীক ও অসত্য বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে। এমন কি, ইন্দ্রিয়বৃত্তির এই নিরোধ-সাধনাকে, এই প্রাণ-হত্যাকে কবি তৈমুরের 'লক্ষজীবনাশ' অপেক্ষাও ভয়াবহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই দেহ শুধু 'মৃদ্‌ভাণ্ড' নহে—'অমৃত-ঘট,' অক্ষয় অমৃত-রসের আধার। দেহ-

সৌন্দর্য কেবল অবয়বসমূহের সুব্যবস্থিত বিন্যাসমাত্র নহে, ইহা তাহাকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। 'রমণীর দেহমণিপদ্মের সেই আলোক'ই কবির কাম্য যাহা দেহগত হইয়াও দেহাতিরিক্ত—যে তনুশ্রীর ছন্দে ছন্দে স্পর্শাতীত অতনুর ব্যঞ্জনা!

কবি চান রতি—প্রাণের যে বিচিত্র তরংগ নারী-দেহ-সরোবরে হিল্লোলিত সেই লীলাতরংগে অংগ মিলাইয়া কবি স্নিগ্ধ হইতে চান। প্রেয়সীর সাধনা কবির নহে—প্রেয়সীকেই তিনি দেহ-মনে একাকার করিয়া পাইবার প্রয়াসী! রূপ-প্রতিমার সম্মুখে বিমুগ্ধ ভক্তের পূজারতি ইহা নহে; এই ভোগরসের সাধনায় সাধ্য ও সাধক পরস্পরের একান্ত সমীপবর্তী। নারীকে তিনি রমণী-রূপেই দেখিয়াছেন—যে নারী শুধু মানবী, দেবীও নহে অপ্সরাও নহে, সেই মর্ত্যমায়াবিনীর উদ্দেশ্যে কবি তাঁহার প্রণতি নিবেদন করিয়াছেন। অপিচ, এই পীরিতি নিছক 'দেহ-রীতি'ও নহে—মিলনের মিথুন-বিলাস ইহা নহে, তাই বধূকে কোলে পাইয়াও আসন্ন বিরহের সম্ভাবনায় প্রাণ কাঁদিয়া উঠে—দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দনের ধ্বনি শুনা যায়। অতএব কবিবর্ণিত এই কামকলার সহিত প্রেমলীলার সুস্পষ্ট ভেদরেখা খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নহে। রতি ও আরতি, পূজা ও প্রাপ্তি, কামনা ও বাসনার মধ্যে প্রভেদ-কল্পনার সমস্ত প্রয়াসই তাই ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কারণ বস্তুত কবির বিবেক ইহাদের পৃথক্ করিতে পারে নাই। তাঁহার এই ভোগবাদের ধারণার মূলে প্রত্যয়গত দুর্বলতা আছে বলিয়াই ইহার সচেতন প্রচার-প্রচেষ্টা অসতর্ক মুহূর্তে কল্পনার কুহেলীজালে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এই কারণেই মোহিতলালের কাব্যকে ঠিক রুতি-কাব্যের পর্যায়ে ফেলা চলে না। প্রত্যেকটী কবিতাই বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল—প্রত্যেকটির উপরই মনস্বিতার মুদ্রাচিহ্ন অংকিত। কবিতাগুলির সৌন্দর্যোপলব্ধি তাই সম্যক্ সমীক্ষার অপেক্ষা রাখে, আবৃত্তির সংগে সংগেই ভাবরূপটী আমাদের নিভৃত অন্তর্লোকে রসের তরংগ তুলে না। অবশ্য ভাবটি ঠিকমত আয়ত্ত করিতে

পারিলে আনন্দ যথেষ্টই পাওয়া যায়, কিন্তু সেই নিগূঢ় রসপ্রস্রবণের সন্ধান করিতে উপরি-সংস্থিত বালুস্তর বহুদূর পর্য্যন্ত খনন করিতে হয়।

মোহিতলালের কাব্য-বিচার-প্রসংগে ইহার তত্ত্বাংশকেই অগ্রাসন দিতে হয়; কারণ এই কাব্যরসের চর্বণা বিশেষভাবে তত্ত্ববিচারণার অপেক্ষা রাখে। অধিকাংশ কবির ক্ষেত্রেই কিন্তু জীবনবাদের আলোচনা রসৈষণার পরে আসে; কারণ কবি তো মুখ্যত তাত্ত্বিক অথবা দার্শনিক নহেন। বিশ্লেষণ বা বিমূর্তন কাব্যকলার অংগ নহে; অমূর্ত অন্তরাবেগকে অপরূপ রসরূপ দান করাই কবি-ধর্ম। দুঃখের বিষয়, মোহিতলালের কাব্যের রসসুধা যুক্তিবুদ্ধি ও তত্ত্ববিদ্যার সূক্ষ্ম পথে পরিস্রুত হইতে হইতে স্তোকধারায় ক্ষরিত হয়; এইভাবে যেটুকু পাই তাহার আস্বাদ অপূর্ব, কিন্তু তাহাতে তৃষ্ণাই শুধু বাড়িয়া যায়। তবুও ইহার অনন্যতন্ত্রতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; ভাববৈভব ও বাগ্‌ভংগির বিশিষ্টতায় ইহা বাঙ্‌লা সাহিত্যে অতুলনীয়।

(কোন কোন সমালোচক মোহিতলালের কাব্যরূপায়ণে তান্ত্রিকের দেহ-সাধনার ইংগিত পাইয়াছেন। হয়তো স্থানে স্থানে দু'চারিটি এমন প্রয়োগ আছে যাহা বীরাচারী তান্ত্রিকের অভিচার-প্রক্রিয়া স্মরণ করাইয়া দেয়; যেমন 'বিভাবরী' কবিতায় 'হেরি পুন পৃথিবীর শবাসনে বসি' অথবা 'রুদ্রবোধনে' 'শুষ্ক শবের মূর্ধজে ধূপদীপ করি' হবে পূজার্চনা'। কিন্তু তাই বলিয়া মোহিতলালের জীবন-সাধনা তন্ত্রসাধনারই নামান্তর এরূপ উক্তি কথনই যুক্তিসংগত নহে। কবি নানা শাস্ত্রে নিষ্ণাত; প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে বিশদ করিবার জন্য বিবিধ শাস্ত্র হইতে উপমাদি সযত্নে সংকলন করিয়া তাঁহার কাব্য-প্রতিমার শৃংগার সাধন করিয়াছেন।) কিন্তু কেবল সেই কারণেই তিনি বিশেষ বিশেষ মতবাদের পরিপোষক এরূপ অভিমত অশ্রদ্ধেয়। অবশ্য একই বিষয়ের অচ্ছন্ন ইংগিত যদি পুনঃপুন পাওয়া যায় তবে ঐ বিষয়ে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হয় সন্দেহ নাই। তন্ত্রের মত ক্ষণিক-বিজ্ঞানীদের লোকায়ত মতের প্রতিবিম্বনও তাঁহার কাব্যের একাধিক স্থানে পাওয়া যায়। 'বুদ্ধ' কবিতায় 'জানি জন্ম আর হেথা নাই', 'ভুলেছি

আত্মার কথা, মানি শুধু দেহের সীমানা' ইত্যাদি উক্তি চার্বাক মতেরই প্রতিধ্বনির মত শুনায় না কি? অপিচ, 'স্মরগরল' কবিতার 'আমি যে বধূরে কোলে ক'রে কাঁদি যত হেরি তার মুখ' সুস্পষ্টরূপে চণ্ডীদাসের 'দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' পংক্তিটি স্মরণ করাইয়া দেয়। বৈষ্ণবরস-দর্শনে ইহারই নাম প্রেমবৈচিত্ত্য।

এই বিভিন্ন মতবাদের গহন অরণ্যে কোন্ মতটিকে কবির নিজস্ব মত বলিয়া মানিয়া লইব? বৈষ্ণব বা শাক্ত কবিদের মত মোহিতলাল কোন বিশেষ একটি ধর্মধারার ধারক অথবা বাহক নহেন। কবি তিনি, বিশ্ববৈচিত্রী ও সৌন্দর্যের সাধক তিনি, তাই তাঁহার মানস-গংগার পুণ্যধারার সংগে যমুনা-সরস্বতীর সংগম সম্ভব হইয়াছে—তাই তাঁহার কাব্য বৈচিত্র্যহীন একতারার গীতিমাত্র নহে, সপ্তস্বরা বীণার উদ্দীপ্ত সংগীত।

'স্মরগরল' প্রসংগে যে কথা বলা হইল, 'বিস্মরণী' সম্পর্কেও সে কথা, সম্পূর্ণ না হইলেও, অনেকটা খাটে; (অর্থাৎ এখানেও বাস্তব ও কল্পনার দো-আলোতেই কবি তাঁহার বাসা বাঁধিয়াছেন। ইহাও প্রাকৃত জগৎ নহে—কল্পনার বর্ণানুরঞ্জিত অলৌকিক স্বপ্ন-লোক। কবি চোখ দিয়া যাহা দেখিয়াছেন, 'মনের মাধুরী মিশাইয়া' তাহাকেই নূতন করিয়া সৃজন করিয়াছেন;) দেখিতে দেখিতে দৃষ্টি বস্তুলোকের পরিলেখ পার হইয়া কোন্ অস্পর্শ্য ও অনবগাহ রহস্যময় নেপথ্যে চলিয়া গিয়াছে, যেখানে নিগূঢ় ও নির্লিপ্ত শিল্প-চেতনা ব্যতীত আর কিছুরই প্রবেশাধিকার নাই। সেখানে দিন নাই, রাত্রি নাই; সুখ নাই, দুঃখও নাই; আছে কেবল নিভৃত মনোলোকে বিরহ-মিলনের যুক্ত-বেণীর তীরে দাঁড়াইয়া কোন্ এক 'উদাসিনী নারী-অপ্সরী'। এই স্বপ্ন-সঞ্চারিণী কি শুধুই মায়া—এই ভুবনেই কোন দিন সে কি তাঁহার জীবন-সংগিনী ছিল না? সুরের ইন্দ্রজালে যে ধরা দিয়াছে, বাহির-ভুবনে এই বাহুপাশে সে কি ধরা দিবে না? এই স্বপ্ন-সম্ভোগে কিন্তু কবির চিত্ত তৃপ্ত হইতে পারে নাই; তিনি চাহিয়াছেন মানসীকে মানুষীরূপে পাইতে—পুরূরবার মত মনোলোকের অ-ধরা অপ্‌সরাকে জীবলোকে

প্রিয়ারূপে ভুজ-বন্ধনে বাঁধিতে। 'মাধবী' কবিতাটির মধ্যে এই আকৃতি —দো-আলোর এই দোলাটি অতিশয় স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এ এক অভিনব ভাব-বিলাস,—মানসীকে মানবীরূপে পাইতে এবং 'অন্তর-আঁখি' দিয়া মানবীকে মানসীরূপে দেখিতে তাঁহার সমান আগ্রহ। 'আধখানি দেখে বাকী আধখানি গানের সুরে' ভরিয়া, কবি তাঁহার কল্প-লোকের এই প্রীতি-প্রতিমাটী নির্মাণ করিয়াছেন।

'মোহমুদ্‌গর' কবিতাটির মধ্যেই মোহিতলালের জীবন-দর্শনটি সর্বাপেক্ষা মনোজ্ঞরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কবি ধরিত্রীর কবোষ্ণ দুগ্ধধারা ত্যাগ করিয়া, কল্‌পনার দ্রাক্ষাবনে মধু চুষিয়া মানবের জন্য ইন্দ্রজাল রচনা করাকে ব্যংগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বাস্তবলোকের যে আলেখ্য তিনি অংকন করিয়াছেন তাহাও নিছক বাস্তব নহে, তাহার মধ্যেও কল্‌পনার স্বপ্ন-তন্তু অলক্ষ্য সূত্রের মত অনুস্যূত রহিয়াছে। যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়সীমার বাহিরে—বুদ্ধি দিয়া যাহাকে ধরা যায় না, মন দিয়া যাহাকে স্পর্শ করা যায় না—কবির চোখে তাহা শূন্যের মতই অসার, তাহার জন্য কবি প্রত্যক্ষকে উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নহেন। যাহা আছে কি নাই তাহারই ঠিকানা নাই, সেই অনন্তবিস্তার মহাশূন্যতার মধ্যে স্বপ্ন-সঞ্চরণ করিয়া লাভ কি? তাহার চেয়ে সুখদুঃখমিশ্র এই যে জাগতিক জীবন অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপেই যাহাকে পাইয়াছি, তাহাকেই স্বীকার করিয়া লই না কেন? দলিত সোমলতা হইতে সুরা-সারের মত এই পৃথুল পৃথ্বীর বক্ষ হইতে তাহার সৌন্দর্য-নির্যাসটুকু নিঃশেষে নিংড়াইয়া লই না কেন? পরিচিত পরিবেশ ছাড়িয়া শূন্যময় মহাপরিণামে মিলাইবার জন্য মানুষের 'প্রাণান্ত প্রয়াস' লক্ষ্য করিয়া কবি অবাক্ হইয়া গিয়াছেন। অন্তহীন আয়ুষ্কালের মধ্যে ক্ষণজীবনরূপ যে পরমায়ু লাভ করিয়াছি তাহাকে অলীক কল্‌পনা করিয়া অসম্ভবের মৃগয়ায় লুব্ধ হইয়া লাভ কি? আমার মনে হয় ভাব-কল্পনা ও দৃষ্টি-ভংগির দিক্ দিয়া উভয়কাব্যের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য।

(কেহ কেহ মোহিতলালের কবি-প্রেরণার অভিনবত্ব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে রোম্যান্টিক্ আখ্যা দিয়াছেন; বর্ণনাগুলির বর্ণাঢ্যতাও তাঁহাকে রোম্যান্টিক্ কবিদের পর্যায়েই উন্নীত করিয়াছে। কিন্তু যে পদবন্ধে তাঁহার ভাব-কল্পনা অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে এমন একটি নিয়মানুগতা আছে—এমন একটি সমতার সুষমা ও ধ্বনি-গাম্ভীর্য আছে যে এই প্রকাশ-শৈলীকে রোম্যান্-টিক্ কিছুতেই বলা চলে না। এই সুর-সুরধুনীর ধারা অনুচ্ছ্বসিত অনাহত গতিতে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কোথাও তট-সীমা লংঘন করে নাই। এই সংযত ও সংহত প্রকাশ-ভংগিকে ক্লাসিক্ আখ্যাই দিতে হয়: ধ্রুবপদ সংগীতের ব্যাপ্তি ও উদ্দীপ্তি ইহাতে আছে, মৃদংগ-ধ্বনির মেঘমন্দ্র ইহার ছন্দে ছন্দে; খেয়াল-গানের সূক্ষ্ম ও সুকুমার তানবিতান অথবা মীড়-মূর্ছনা ইহাতে কচিৎ মিলে। ক্লাসিক্ ঠাটে রোম্যান্টিক্ কল্পনার এই প্রকাশ সত্যই অভিনব—উপচীয়মান আবেগকে সংযত করিয়া সংহত রূপধেয়ের মধ্যে ধরিয়া রাখা অল্প শক্তির পরিচায়ক নহে। ইহারই ফলে গীতিকাব্যের সুকুমার শিল্প-কল্পনা মহাকাব্যের মহত্ত্ব ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে।)

পুরাণ-প্রসঙ্গ

পুরাণগুলি সত্যই নিতান্ত পুরানো—একেবারে জরাজীর্ণ। আধুনিক প্রগতি-যুগের উর্দ্ধশ্বাস অভিযানের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলা কি তাহাদের কর্ম? কোন্ মান্ধাতার আমলের স্থবির ঋষিদের রচিত এসব কাহিনী কি আর এই মনোবিকলনের যুগে 'কলিকা' পায়? তাই আধুনিকদের কাছে ইহাদের কোনই মূল্য নাই। তাঁহাদের মতে এগুলি নিছক গাল-গল্প—সোমরসের মৌতাতে নিষ্কর্মা ঋষিদের প্রলাপের উচ্ছ্বাস!—এই যে মনোভাব, ইহার কারণ কি? ২৫।৩০ বৎসর পূর্বেও যে পুরাণ-কথা শুনিবার পিপাসা আমাদের দুর্নিবার ছিল, পুনঃপুন শুনিয়াও মন তৃপ্তিলাভ করিত না, তাহার প্রতি সহসা এই তীব্র বিতৃষ্ণার উদ্ভব হইল কেমন করিয়া? আমরা স্বরাজ চাই—স্বাধীনতা চাই, ভারতে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিতে চাই; অথচ অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কৌতূহল আমাদের নাই। বিদেশের ধারকরা 'কাল্‌চার' লইয়া আমরা গড়িয়া তুলিব জাতীয়তার সৌধ—পরম্পরাগত ধ্যান-ধারাকে ভুলিয়া প্রতীচ্যের স্বপ্নাদর্শ দিয়া রচিব ভারতের স্বাধীন ভবিষ্যৎ! ইহা অপেক্ষা ব্যর্থ ও হাস্যকর প্রয়াস আর কি হইতে পারে? রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণগুলিকে অলীক কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না; ইহারা ইতিহাস—শুধু রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে, সৃষ্টি-প্রকরণ অথবা রাজবংশাবলীর বিবরণমাত্র নহে, ভারতের সাধনা ও ধ্যানের ইতিহাস! ইহাদের সুবিশাল কলেবরের মধ্যে কত সহস্র বৎসরের কামনা ও বেদনা, সিদ্ধি ও সাধনা, রূপকথার রাজকন্যার মতই, সুপ্তিঘোরে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। সোনার-কাঠির পরশ পাইলেই তাহারা জাগিয়া উঠে—সুদূর অতীতের রহস্যলোক হইতে স্বপ্নসঙ্গীতে

প্রাণ ভরিয়া দেয়! সেই বিশাল মহিহর্ম্যে কত প্রকোষ্ঠ, কক্ষে কক্ষে কত চিত্র, কণ্ঠে কণ্ঠে কত কাকলী! শৌর্য ও সৌন্দর্য, প্রেম ও ভক্তি, ত্যাগ ও তিতিক্ষা, সংযম ও সরলতার কি অপূর্ব সমন্বয়! ছায়াপটে সচল, সবাক্ ছবির মত একটির পর একটি ফুটিয়া উঠে, নড়ে চড়ে, কথা বলে, আমাদের সহিত তাহাদের বিন।-ভাষায় বাণী-বিনিময় হইয়া যায়।

'পুরাণ' শব্দের মূল-গত অর্থ পূর্বতন, সেই জন্য আদি যুগে পুরাণ বলিলে বিশেষ করিয়া প্রাচীন আখ্যায়িকাদি-সংবলিত গ্রন্থবিশেষ বুঝাইত। কিন্তু ইহা যে কত প্রাচীন, তাহা এখন নিঃসংশয়রূপে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে আমরা দেখিতে পাই, আর্য জাতির প্রাচীনতম শাস্ত্রসমূহেও পুরাণ-প্রসঙ্গ আছে। আর্য-সমাজে পুরাণ-কথা বেদের ন্যায় আদৃত হইত। শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে —"পুরাণ বেদ; 'এই সেই বেদ' এই কথা বলিয়া অধ্বর্যু পুরাণ-কীর্তন করিতে থাকেন।" বেদাদির উৎস হইতেই উদ্‌ভূত হইয়াছে এই পুরাণগুলি। 'আর্দ্র কাষ্ঠে অগ্নি-সংযোগ করিলে যেমন একই কালে তাহা হইতে নানা বর্ণের ও আকারের ধূম নির্গত হইতে থাকে, সেইরূপ সেই মহান্ ভূতের নিঃশ্বাস হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বেদসমূহ ও পুরাণ-গ্রন্থগুলি'—'মহতো ভূতস্য নিঃশ্ব-সিতমেতৎ'। বৃহদারণ্যক মতে, বেদ যেমন আর্য ঋষিগণের হৃদয়াকাশে উদ ভা-সিত হইয়াছিল, পুরাণও সেইরূপ বিনা-আয়াসে তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (৭।১।২)বলেন, 'ইতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্'—ইতিহাস ও পুরাণ বেদসমূহের পঞ্চম বেদ।† ফল কথা, বৈদিক, এমন কি, প্রাগ-বৈদিকযুগেও যে পুরাণের প্রচলন ছিল, তাহার যুক্তিসম্মত প্রমাণ আছে।* তবে একথাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অষ্টাদশ মূল পুরাণ ও অন্যান্য উপপুরাণ সবই এক সময়ের রচনা নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার মহা-

---

† 'ইতিহাসপুরাণং পুষ্পম্' অর্থাৎ ইতিহাস-পুরাণ সম্বন্ধী কর্মই পুষ্প। (ছান্দোগ্য, ৩।১।৪)

* প্রথমং সর্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ ॥ (বায়ু ১।৬১)

ভারতের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন, "সকল পুরাণ অপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণের রচনা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।* যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাস-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে; কিন্তু পুরাণ-সকলের রচনা পরস্পর এত বিভিন্ন যে, উহারা এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয় না। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের এক এক অংশ পাঠ করিলে এই তিন গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া প্রতীতি হওয়া দুষ্কর।"

আমি পণ্ডিত নহি; সুতরাং সাহস করিয়া কোন মন্তব্য করা আমার শোভা পায় না—বিশেষত যখন শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া প্রমাণরত্ন উদ্ধার করা আমার সাধ্যাতীত। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, প্রচলিত পুরাণ গ্রন্থগুলির কোনটিই কোন একজন লেখক কর্তৃক একটি বিশেষ সময়ে বিরচিত হয় নাই। আর্য সভ্যতার প্রাচীনতম কাল লইতে আরম্ভ করিয়া যুগে যুগে যে সকল আখ্যান ও উপাখ্যান সূতমুখে শ্রুত ও লোকায়ত হইয়াছিল, পরম্পরাগত সেই কাহিনী-গুলি বিশেষ বিশেষ যুগে বিভিন্ন লেখক কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল মাত্র। বেদ-বিভাগকর্তা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন সর্বপ্রথম এইরূপ একখানি মাত্র সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন;—অবশ্য ইহার মধ্যে তাঁহার নিজের রচিত কোন কাহিনীই ছিল না, একথা বলা আমার অভিপ্রেত নহে। এই মূল গ্রন্থ হইতে লোমহর্ষণ শিষ্যত্রয় তিনখানি সংহিতা ক্রমশ প্রকাশ করেন। প্রথমে এই চারিখানি, এবং তাহা হইতে একে একে ১৮খানি মূল পুরাণ এবং বহু পরে বহুতর অর্বাচীন পুরাণ সঙ্কলিত হয়।

এইরূপ মনে করিবার একটি সঙ্গত কারণও আছে। অনেক সময় দেখা যায় মহাভারতের এই আখ্যানগুলির সহিত ভারতীয়, এমন কি বিদেশীয়, অন্যান্য গ্রন্থ-নিবদ্ধ অনেক কাহিনীর আশ্চর্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। ভগবান্ তথাগতের পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত নানা গল্পের আকারে লিপিবদ্ধ আছে 'জাতক' গ্রন্থে। এই গল্প-সংগ্রহের সকলগুলি তাঁহার নিজের রচিত বলিয়া মনে হয় না; কারণ, মহা-

* আধুনিক পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণের মতে ব্রহ্ম-পুরাণই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

ভারতাদি গ্রন্থের কাহিনীর সহিত ইহাদের কোন কোনটীর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বুদ্ধজন্মের কতকাল পূর্ব হইতে এ-জাতীয় গল্পের উদ্ভাবনা হইতেছিল এবং তাঁহার আবির্ভাব-কালে (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠশতক) * ইহাদের মধ্যে কতগুলি লোক-সমাজে সুপ্রচলিত ছিল, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। সে যাহা হউক, এই সকল আখ্যায়িকার লোক-প্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধদেব যে ইহাদের ধর্ম্ম-দেশনার বাহনরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সম্মিলিত দুই পক্ষীর জাল-হরণের কাহিনী মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে, পঞ্চতন্ত্রে, হিতোপদেশে এবং বত্তক-জাতকে প্রায় একই আকারে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, পালিভাষার বচনগুলিই মৌলিক, এবং মূল শ্লোকগুলি ক্রমশ সংস্কৃতে অনুকৃত ও রূপান্তরিত হইয়াছে। 'কে আগে, কে পাছে' বহু শতাব্দী পরে সে প্রশ্নের মীমাংসা আজ সহজ নহে; তবে একথা নিশ্চয় যে, ভারতের বাতাসে এই কাহিনীগুলি বহুদিন হইতেই ভাসিয়া বেড়াইতেছিল; তাই বৌদ্ধ এবং হিন্দু উভয় গ্রন্থেই উহারা তুল্যসমাদরে আসন লাভ করিয়াছে। 'দশরথ'-জাতকে রাম-সীতার কথাই বর্ণিত আছে; কিন্তু সেখানে উঁহারা সহোদর-সহোদরা, অথচ শেষ পর্যন্ত উঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল। প্রচলিত বিশ্বাস, বাল্মীকি আদিকবি এবং রামায়ণ আদি কাব্য, তথাপি তাহাতে রাম-সীতার একনিষ্ঠ প্রেমের যে অনুপম আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় এই জাতক-কথা কি বর্বর-যুগের রচনা বলিয়া মনে হয় না?‡ 'ঘট'-জাতকের সহিত ভাগবতের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট; কিন্তু এক্ষেত্রে ভাগবতের নিকট জাতকের ঋণ সহজে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না; কারণ, ইহা এক প্রকার নিঃসংশয়রূপেই নির্ণীত

---

* Vide Manmatha Shastri's Buddha,—Introduction, page xxiii last paragragh.

‡ T. W. Rhys Davids—Ramayana could not have existed as an epic at the time of the origin of these Buddha ballads.

হইয়াছে যে, ভাগবতের রচনাকাল খৃষ্ট-জন্মের পূর্বে নয়। রামানুজাচার্যের অভ্যুদয় হয় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে। প্রামাণিক ভক্তি-শাস্ত্র-হিসাবে তিনি বিষ্ণু-পুরাণেরই উল্লেখ করিয়াছেন, ভাগবতের প্রভুত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার জীবিতকালে ভাগবতের পর্যাপ্ত প্রচার ও প্রভাব থাকিলে এরূপ ঘটনা আদৌ সম্ভব হইত না। Winternitz এই গ্রন্থ দশম শতকে সঙ্কলিত বলিয়া মনে করেন; যদিও তিনি বিশ্বাস করেন, ইহার মধ্যে এরূপ বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যাহা আরও পুরাতন।

অপরপক্ষে, জাতক-কথার সবগুলিই যে বুদ্ধের সমসাময়িক, একথাও দৃঢ়তার সহিত বলা চলে না; তবে ইহাদের গাথা বা পদ্যাংশগুলি যে অতিশয় প্রাচীন সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। মোট কথা, আমার বক্তব্য—বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ, উপপুরাণাদি সকল গ্রন্থের রচয়িতাই পরম্পরা-প্রাপ্ত লৌকিক কাহিনীর নিকট ঋণী।

ইহার পরেই বিচার্য, এই পুরাণগুলি কেবলই মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে কল্পিত গল্প, না ইহাদের মধ্যে ইতিহাসের অংশও কিছু আছে? 'ইতিহ' এই অব্যয় শব্দটি হইতে 'ইতিহাসের' উৎপত্তি—ইহার অর্থ পরম্পরা-প্রাপ্ত কাহিনী; এইরূপ কাহিনীর আসন বা অবস্থান যাহা তাহাই ইতিহাস। তাহা হইলে প্রাচীন নির্বচন-অনুসারে পরম্পরাগত যে কোন কাহিনীর নামই ইতিহাস। অমরকোষ এই অর্থ অঙ্গীকার করিয়াও স্থানান্তরে বলিয়াছেন, 'ইতিহাসঃ পুরাবৃত্তম্' অর্থাৎ পুরাবৃত্ত অথবা পরম্পরাক্রমে আগত পুরাতন ঘটনার বিবরণ-কেও ইতিহাস নামে চিহ্নিত করা যায়। সায়ণাচার্য বেদভাষ্যে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণোপক্রমে) এবং শঙ্করাচার্য বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে বলিয়াছেন, "বেদের অন্তর্গত যুদ্ধ-বর্ণনা অথবা উর্বশী-পুরূরবার কথোপকথনাদি-বিষয়ক ব্রাহ্মণ-ভাগের নাম ইতিহাস, এবং 'সর্ব প্রথমে একমাত্র অসৎ ছিল' ইত্যাদি সৃষ্টি-প্রক্রিয়া-ঘটিত বিবরণের নাম পুরাণ।" বিষ্ণু, মৎস্য ও বায়ু-পুরাণমতে পুরাণের লক্ষণ পাঁচটি—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।

সৃষ্টি ও প্রলয়ের (destruction and renovation) বিবরণ, মন্বন্তরের বিবরণ, বিভিন্ন রাজবংশ ও সেই সকল বংশজাত ব্যক্তিগণের বিবরণ পুরাণে থাকিবেই, ইহা ছাড়া অন্যান্য অবান্তর প্রসঙ্গও প্রয়োজনমত পুরাণমধ্যে আলোচিত হইবে।

সংস্কৃতজ্ঞ বিদেশীয়গণের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি যে, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের অন্যান্য শাখা যথোচিত সমৃদ্ধ হইলেও আর্য ঋষিগণ পুরাবৃত্তরচনা-বিষয়ে আদৌ মনোযোগী ছিলেন না, এবং সেই কারণেই অতীত ভারতের তথ্যমূলক ধারাবাহিক ইতিহাস নাই বলিলেও চলে। সামান্য যাহা কিছু ঐতিহাসিক তথ্য বিক্ষিপ্তভাবে পুরাণাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহাও আবার প্রক্ষিপ্ত ও অতিরঞ্জিত কাহিনীর সহিত এমন অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত যে, তাহাকে অসন্দিগ্ধরূপে আবিষ্কার করা সুকঠিন। কাজটি কঠিন সন্দেহ নাই, তবে একথা ঠিক নয় যে পুরাবৃত্তের উপাদান পুরাণে নিতান্তই যৎসামান্য। শাস্ত্রে 'ইতিহাস' এবং 'পুরাণ' শব্দদুইটি সর্বত্র একই সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং পরম্পরা-শ্রুত কাহিনী অথবা উপাখ্যান যেমন তাহার একটি উপাদান, তেমনি আখ্যান অর্থাৎ স্বয়ং দেখিয়া যে সকল বৃত্তান্ত বিবৃত করা হইয়াছে, এবং পুরাবৃত্ত অর্থাৎ মাগধ-(Court historian) গণ-প্রদত্ত ও সূত-বর্ণিত প্রাচীন ঘটনার বিবরণও তাহার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং পুরাণগুলি আখ্যান ও উপাখ্যানের, ঘটনা ও কাহিনীর অপূর্ব্ব সমন্বয়। "যে হেতু পুরাকালে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই হেতু ইহার নাম পুরাণ।"—'যস্মাৎ পুরাহ্যনিতীদং পুরাণং তেন তৎ স্মৃতম্।' কিন্তু ইহাদের মধ্যে যেগুলি বাস্তবিকই অতিলৌকিক, তাহাদের স্বরূপ নির্ণয় করা কি এতই কঠিন? হনূমানের গন্ধমাদন-আনয়ন এবং বাহুমূলে ভানু-ধারণ যে নিতান্তই বাড়াবাড়ি, একথা বুঝিতে কি এতই বিলম্ব হয়? এই প্রকার অত্যুক্তির

উদাহরণ পুরাণের ভিতর ভূরি ভূরি পাওয়া যাইবে, এবং সেগুলিকে চিনিয়া লইতে আমাদের বিশেষ বুদ্ধিব্যয়ও করিতে হইবে না। এখন জিজ্ঞাস্য এই—পুরাণ বা ইতিহাস-গ্রন্থে ইহারা আসন লাভ করিল কিরূপে? ইহার উত্তর অতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত; বক্তব্য বিষয়কে নগ্নরূপে প্রকাশ করা এদেশের চিরাচরিত রীতির বিরুদ্ধ। ইতিহাস হইলেও তাহা সাহিত্য। কাজেই একটু রস দিয়া, রঙ্ চড়াইয়া বিবৃত করিতে হইয়াছে এই আখ্যানগুলি। অনেক স্থলে ধর্মদেশনার উদ্দেশ্যে রূপকচ্ছলে কাহিনীগুলি বলা হইয়াছে। কাটাছাঁটা নীরস নীতিকথা মনের বহিঃস্তর হইতেই পিছলাইয়া যায়, গভীরতর স্তরে কোন দাগ কাটে না। তাই আর্যঋষিগণ নিরাবরণ নীতি-নিবন্ধ অপেক্ষা শ্রুতি-রসায়ন গল্পের মধ্য দিয়াই চেষ্টা করিয়াছেন ধর্ম-প্রচারের। তথাগত বুদ্ধও সম্ভবত এই কারণেই জাতকের রূপকগল্পগুলির মাধ্যমে তাঁহার সদ্ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার পর, কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক ও পণ্ডিতজনের জন্যই এগুলি কল্পিত হয় নাই—আবালবৃদ্ধ সকলকেই তুল্যরূপে তৃপ্ত করা ছিল ইহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই বাল-চিত্তরঞ্জনের জন্য স্থানে স্থানে অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। কেহ কেহ কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের সশ্মশ্রু ভূমিষ্ঠ হওয়ার বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণান্তর্গত প্রত্যেকটি অত্যুক্তির সমর্থনের প্রয়াসী, তাঁহারা কিছুতেই স্বীকার করিতে চান না যে, ইহাদের মধ্যে অসম্ভাব্য বা অবিশ্বাস্য কিছু আছে; সুতরাং তর্কস্থলে প্রতিপক্ষের সম্মুখে অলৌকিকতম কাহিনীটিরও রূপক ব্যাখ্যা করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যান। আমাদের দোষই এই যে, আমরা অবিশ্বাস ও অতিবিশ্বাসের মধ্যবর্তী একটি যুক্তিসম্মত শ্রদ্ধার পথ ধরিতে পারি না; আজকাল আমাদের জাতীয় চরিত্রে এই নিরপেক্ষ সত্যদৃষ্টির বড়ই অভাব; আমরা হয় অতি-আধুনিকের চোখে অবাস্তব ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, নতুবা অতীতের জীর্ণ খুঁটি আঁকড়াইয়া তাহারই চারিদিকে অকারণে ঘুরিয়া মরি! পুরাণের এই অতিপ্রাকৃত অংশগুলি বাদ দিলে যেটুকু বাকী থাকে, তাহা খাঁটি ইতিহাস—অভ্রান্ত

ও অবদান—ইংরাজীতে যাহাকে বলে History। একথা সম্ভবত অনেকেই জানেন যে, ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ্ প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্বকালের যে প্রামাণিক ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহার তথ্যাংশের জন্য শিলা-লিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি ব্যতীতও বহুলাংশে তাঁহাকে মহাবংশ ও অশোকাবদানের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য পুরাবৃত্তকারগণের মধ্যে জর্জ্ টার্ণার্ সর্ব্ব-প্রথম দ্বীপবংশ, মহাবংশ * প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং অশোক-যুগের রহস্যময় অস্পষ্টতার উপর নূতন আলোক-পাত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু এইগুলি প্রাচীন কাহিনী-গ্রন্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং সেই হিসাবে ইহারা পুরাণেরই সগোত্র; পুরাণের মতই ইহাদের মধ্যেও অতিরঞ্জিত, অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ আছে; অথচ সিংহলীয় ও ভারতীয় এই দুইটি কাহিনীই অশোক-চরিত্র-চিত্রণে ঐতিহাসিকগণের সর্বপ্রধান অবলম্বন। অতএব পুরাণে ঐতিহাসিক উপাদান কিছুই নাই, একথা কেমন করিয়া বলি?

পুরাণের আর একটা বড় দিক—ইহার লোক-শিক্ষা; মানুষের চরিত্রে যতগুলি রমণীয় চিত্তবৃত্তির কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহাদের অপরূপ চিত্র দেখিতে পাই ইহার মধ্যে। পাতিব্রত্য, সৌভ্রাত্র, মাতাপিতৃভক্তি, বিশ্বস্ততা, সরলতা, সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি যে গুণগুলি মর্ত্তের মানুষকে দেবতার আসনে উন্নীত করে—যে প্রীতির পরিমণ্ডল রচিত হইলে দুঃখ-বেদনার নির্মম অভিঘাতও মানুষের মনকে আলোড়িত করিতে পারে না, পুরাণ-শিল্পী সুকৌশলে আমাদের জন্য সেই চিরানন্দময় সৌন্দর্য-লোক রচনা করিয়াছেন! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেবল বিদগ্ধ-মণ্ডলীর জন্যই এগুলি সঙ্কলিত হয় নাই, আপামর-সাধারণের ছিল ইহাতে অবাধ অধিকার। বহুশ্রুত ব্রাহ্মণের জন্য ছিল বেদ-উপনিষদাদি, বেদ-বঞ্চিত শূদ্র ও নারীগণের জন্য ছিল এই মধুময় পুরাণ-কথা। ইহাদের ভিতরে গভীর তত্ত্বকথাও অনেক সময়ে গল্পচ্ছলে এমন মনোজ্ঞরূপে বর্ণিত

* খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে মহানাম কর্ত্তৃক পালি-ভাষায় রচিত সিংহলীয় কাহিনী।

হইয়াছে যে, তাহার প্রভাব গূঢ়রূপে সমাজ-জীবনের নিম্নতম স্তরেও সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। কেনেডি সাহেব বলিয়াছেন, "আমি তো ইহাদের মধ্যে উপদেশ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যই খুঁজিয়া পাই না। সৃষ্টি-প্রকরণ এবং রাজ-বংশাবলীর বিবরণ ইহাদের মধ্যে আছে সত্য, কিন্তু সেগুলি ইহাদের অন্তরঙ্গ বস্তু নহে, যেন কতকটা বাহিরের জিনিস; সকল পুরাণে ইহাদের উল্লেখও নাই, এবং কোন কোনটিতে এই সম্পর্কে বিবরণ খুবই সংক্ষিপ্ত; অপরপক্ষে, প্রত্যেক পুরাণেই হিন্দু-ধর্মের মুখ্য সূত্র, আচার ও অনুষ্ঠানগুলি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—কখন গল্পচ্ছলে, কখন বা বিবিধ দেবতার অর্চনায় যে সকল মন্ত্রাদির প্রয়োজন, সেই সম্বন্ধে বিধান দিয়া।" এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য, অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে অধ্যাত্ম পিপাসার উদ্রেক করাই ছিল ইহাদের প্রধান লক্ষ্য। বেদে যে সকল দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব সূক্ষ্ম সূত্রের আকারে গ্রথিত আছে, সেগুলির মর্মগ্রহণ সাধারণ বুদ্ধির বহির্ভূত, তাই পুরাণকার গল্পচ্ছলে সেগুলিকে পল্লবিত করিয়া সাধারণের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। বেদের মধ্যে কেবল প্রকৃতি-পূজা ও গ্রহনক্ষত্রাদির অর্চনার কথাই পাওয়া যায়, এবং তাহার চরম লক্ষ্য হইল সকল দেবতার মধ্য দিয়া জগৎ-সবিতা 'বিশ্বদেবতার' অনুধ্যান—সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে পরম ঐক্যের উপলব্ধি। ইন্দ্র (আকাশ), অগ্নি, বায়ু, বরুণ, সূর্য, সোম, ইত্যাদি প্রকৃতি-মূর্তি ও গ্রহগণ নররূপেই কল্পিত হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের তর্পণের জন্য মন্ত্র-পাঠ, সাম-গান ও আহুতি-প্রদানের বিধান আছে। কিন্তু কোন নর-নায়ক এ পর্যন্ত দেব-রূপে পরিকল্পিত ও পূজিত হন নাই; ফলত, অবতার-বাদের স্বীকৃতি সমগ্র বেদ-সংহিতার মধ্যে খুব অল্পই পাওয়া যায়। পুরাণের মধ্য দিয়াই আমাদের দেশে এই বীর-পূজা প্রথম প্রচলিত হয়। বেদ দেবতাকে মানুষ করিয়া স্তবে, স্তোমে তাঁহার বন্দনা করিয়াছেন; পুরাণ স্বর্গের দেবতাকে ধূলায় না টানিয়া মাটির মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ইন্দ্রাদি দেবতার উল্লেখ থাকিলেও তাঁহাদের ভূমিকা সেখানে নিতান্ত গৌণ ও

অপ্রধান, মানুষই সেখানে নায়ক-নায়িকা—তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বীর্যৈশ্বর্যের চিত্রই উহার একমাত্র উপজীব্য। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "ভাষা ও ছন্দ" কবিতায় আদিকবি বাল্মীকির মুখে বলিয়াছেন,—

"হে দেবর্ষি, দেবদূত, নিবেদিও পিতামহ-পায়ে
স্বর্গ হ'তে যাহা এল স্বর্গে তাহা নিও না ফিরায়ে।
দেবতার স্তব-গীতে দেবেরে মানব করি' আনে,
তুলিব দেবতা করি' মানুষেরে মোর ছন্দ-গানে।"

যাহা হউক, আমার বক্তব্য—নানা মহচ্চরিত্র নর-দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া, তাঁহাদের কর্ম-ও-ধর্ম-জীবনের উদার আদর্শ লোক-চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া পুরাণকৃৎ কবিগণ গণ-মনকে আত্ম-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাই সংস্কৃত হইলেও ইহাদের ভাষা এত সরল ও প্রাঞ্জল। তখনকার কালে—যখন দেব-ভাষার বহুল প্রচলন ছিল—ইতর-সাধারণও সম্ভবত এই সহজ সংস্কৃত শুনিয়া মোটামুটি তাহার মর্মগ্রহণ করিতে পারিত। লোক-শিক্ষার জন্য উদ্দিষ্ট ছিল বলিয়া ইহাদের ভাষা সুধীজনোচিত কঠিন নহে। তবে, যে যে অংশে ধর্মতত্ত্বাদি বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, সেগুলি অপেক্ষাকৃত দুরূহ সন্দেহ নাই; সূতগণ (বর্তমান কালের কথক) সেই সেই অংশ ব্যাখ্যা করিয়া সরল প্রাকৃতে বুঝাইয়া দিতেন। পাছে সাধারণের বুঝিবার অসুবিধা হয়, এইজন্য বুদ্ধদেব তাঁহার উপদেশ ও নির্বচনগুলি সহজ-বোধ্য পালি ভাষায় বিবৃত করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাই পুরাণকল্প বৌদ্ধ জাতককথা পালি অথবা মাগধী প্রাকৃতে নিবদ্ধ। সহজ প্রাকৃতে প্রচারের ফলে ইহা অত্যল্প কালের মধ্যেই দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং সমগ্র ভারত নির্বাণ-'ভাবনা'য় *উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।

এ পর্যন্ত আমরা কেবল সংস্কৃত-নিবদ্ধ প্রাচীন পুরাণ সম্পর্কেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। এখন ভাষা-পুরাণ—বিশেষ করিয়া কৃত্তিবাস-বিরচিত

* মৈত্রী, করুণা, মুদিতা (সন্তোষ) ও উপেক্ষার অনুশীলন।

রামায়ণ ও কাশীদাস-কৃত মহাভারত—সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলিয়া আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ভাষা-পুরাণগুলি মূলের অবিকল অনুবাদ নহে। কৃত্তিবাস-কৃত রামায়ণের মধ্যে এমন অনেক কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহা আর্ষ রামায়ণে নাই; কোথায় সেখানে 'অঙ্গদ-রায়বার,' তরণী সেনের যুদ্ধ, অষ্টোত্তরশত-নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া রামচন্দ্রকর্তৃক দেবীর অকাল বোধন, অশ্বমেধযজ্ঞে লবকুশের সহিত রামচন্দ্রের যুদ্ধ! মূল কবি-কথার সহিত প্রচলিত কিংবদন্তী মিশ্রিত হইয়া ভাষা-রামায়ণকে এক সম্পূর্ণ নূতন রূপ দিয়াছে। পরম্পরাক্রমে রামায়ণী কথার যে ধারা আমাদের দেশে বহমান ছিল, তাহাকেও কবি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, করিলে তাহা জনাদর হইতে বঞ্চিত হইত। আবার বাঙলা রামায়ণের সহিত তুলসীকৃত হিন্দি রামায়ণের তুলনা করিলে দেখিতে পাই, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য অতি সামান্য। এইরূপ প্রত্যেক প্রদেশের ভাষা-রামায়ণের সহিত অন্য যে কোন প্রাদেশিক রামায়ণের তুলনা করিলে দেখিতে পাইব, কোন প্রদেশই আপনার পরিমণ্ডলের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। কৃত্তিবাসের রাম-সীতা তুলসীর রাম-সীতা হইতে স্বতন্ত্র; আখ্যায়িকার দিক দিয়াও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বড় কম নয়। মোট কথা, প্রত্যেক প্রদেশের ভাষাকবিই চাহিয়াছেন, জাতীয়তার অনুকূল একটি বাতাবরণ সৃজন করিতে, যাহার ভিতর দিয়া তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তাহাদের নিজস্ব সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারে। ভাষা-মহাভারত সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা চলে। বঙ্গভাষায় কত কবিই তো রামায়ণ, মহাভারত রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম কে জানে? এই চারণদলের রচনাসমূহের মধ্যে এই দুইখানি গ্রন্থই কালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিয়া আজিও বাঁচিয়া আছে। বাঁচিয়া আছে তাহার কারণ ইহারা প্রাণবন্ত,—নিত্যকালের ভাব-সৌরভে ভরপুর! যাত্রায়, কথকতায়, পাঁচালি ও ব্রতকথায় এই লোকসঙ্গীতের ধারা একদা সহস্র শাখা প্রসারিত করিয়া সমগ্র বঙ্গভূমিকে পরিপ্লাবিত করিয়াছিল। নিরাবিল আনন্দের মধ্য দিয়া যে লোক-শিক্ষা ইহারা প্রচার

করিয়াছিল, বাঙ্‌লার নিভৃততম পল্লীতেও তাহার বৈদ্যুত-স্পন্দন জনসমাজকে নবজীবনে জাগ্রত করিয়াছিল। যদিও হয়তো আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন তখন ছিল না, তথাপি সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহারা এইরূপে লাভ করিয়াছিল, খতাইয়া দেখিলে, প্রাথমিক শিক্ষার অভাবজনিত ক্ষতি তাহাতে বহুগুণে পূরণ হইয়া গিয়াছে। এই অফুরান কাব্য-উৎস হইতে ভাবি-কালের কত কবি অঞ্জলি-অঞ্জলি তীর্থবারি লইয়া পূর্ণ করিয়াছেন তাঁহাদের কাব্য-কুম্ভ। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি অমর কবিকুল এই শাশ্বত রস-উৎস হইতে বিন্দু বিন্দু অমৃত লইয়া রচিয়াছেন তাঁহাদের অক্ষয় মধুচক্র—
"গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

মুদীর দোকান হইতে ধনীর প্রাসাদ অবধি এই পুরাণের অবাধ গতি; আবালবৃদ্ধ চিরদিন মুগ্ধ এই সুধাসঙ্গীতে! কালের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া এই সুধা তৃষিত নর-নারীর জন্য যাঁহারা আহরণ করিয়াছেন, লোকশিক্ষক সেই ভক্ত কবিকুল আমাদের চিরনমস্য।

কত কালের কত কাব্য-কাকলী ইহাদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে; বৈষ্ণব কবি দিয়াছে তাহার অকৈতব ভক্তির বাঙ্‌ময় অঞ্জলি, শাক্ত ভক্ত তাহার বীর্য ও পৌরুষ—সাহসে অটল, বিক্রমে দুর্বার, আত্ম-চেতনায় প্রদীপ্ত ও প্রাণবন্ত! অতীতের পট-ভূমিকায় একটি বিশেষ যুগের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ইহাদের দেখা চলে না; ইহারা সেকালের, ইহারা একালের, ইহারা চিরকালের! বিশ্বজনীন আবেদন বহন করিয়াও ইহারা বিশেষ করিয়া বাঙ্‌লার এই স্নিগ্ধ মাটির। ইহাদের মধ্যে আছে বাঙ্‌লার পল্লীবধূর সেই সলজ্জ কোমলতা, জননীর সেই আত্ম-বিস্মৃত ভালবাসা, পুরুষের সেই ত্যাগসর্বস্ব জীবনাদর্শ!

লোকশিক্ষা প্রচার করিয়া জাতিকে আবার জাগাইতে হইলে, পশ্চিমের অন্ধ অনুসরণের লুব্ধ লালসা হইতে তাহার গতি-মুখ ফিরাইতে হইলে, আবার আবশ্যক পুরাণ-কথার বহুল প্রচার। সেকালের এক জন অশিক্ষিত পল্লী-নারীও রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতির সহিত যে পরিচয় দাবী করিতে

পারিত, বর্তমানে শিক্ষাভিমানী কলেজের ছাত্রবৃন্দ তাহারও একাংশও দাবী করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। চলচ্চিত্রের ছায়াপটে বিকৃত প্রতীচ্য প্রেমের রোমন্থনের দৃশ্য না দেখিয়া যদি আমাদের পুত্রকন্যারা পুনরায় পুরাণ-কথার আস্বাদ লইতে উৎসাহিত হন—প্রগতি-সাহিত্যের নিপুণ চিত্ত-ব্যবচ্ছেদের বিক্ষেপকর কাহিনী ফেলিয়া রাখিয়া সীতা-সাবিত্রী, অরুন্ধতী-লোপামুদ্রা, ভীষ্ম-একলব্যের ত্যাগ-পবিত্র জীবন-গীতায় মনোনিবেশ করেন, তবেই দেশের বাতাস আবার ফিরিবে। ছবির পর্দায়, বেতার-বার্তায় এই পুরাণ-কথা-প্রচারের একটি মহান্ সুযোগ আমরা লাভ করিয়াছি—এই বৈজ্ঞানিক যুগে; যাহাতে তাহাদের অপব্যবহার না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা দেশহিতৈষী মনীষি-মাত্রেরই কর্তব্য। কিন্তু বেতার অথবা ছায়া-ছবি তো আজিও পল্লী-অঞ্চলে প্রবেশলাভ করে নাই; তাই সম্ভব হইলে এই অতি-আধুনিক, বৈজ্ঞানিক প্রচারোপায়গুলি সেখানেও আমদানি করিতে হইবে; অন্যথা পুরাণ-কথার পাবনী ধারা পূর্বের মত কথকতা, কবি ও পাঁচালি-গানের মধ্য দিয়া বাঙলার দূরতম পল্লীতেও ছড়াইয়া দিতে হইবে। জাতির উন্নয়নের জন্য এই মহৎ ব্রত-গ্রহণ কর্তব্য বলিয়া মনে করি। পুরাণ-কাহিনীর পুণ্যধারায় বাঙালীর ঊষর চিত্ত-ভূমি নূতন পলি-মৃত্তিকা সঞ্চয় করিয়া আবার উর্ব্বর ও শ্যামল হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।